শেষনাগ

শক্তিপদ রাজগুরু

প্রভা প্রকাশনী

পরিবেশক : প্রোগ্রেসিভ বুক কোয়ান
৩৩, কলেজ রো, কলি-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৭০

প্রচ্ছদ : সুবল সরকার

মুদ্রণ :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

সুসাহিত্যিক

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের :

তৃষ্ণা

স্বপ্নময়ী

মায়া দিগন্ত

গঙ্গাহৃদি

মেঘে ঢাকা তারা

কুমারী মন

মনিবেগম

শালপিয়ালের বন

অগ্নিস্বাক্ষর

অবাক পৃথিবী

পথ বয়ে যায়

কালজ গাঁয়ের কাহিনী

মনের মানুষ

বনমাধবী

আপন ঘরে

মা

কিছু জানা কিছু অজানা

সাজানো বাগান

মধুমাস

ঝিমিয়ে পড়া স্টেশন জেগে উঠছে ঘুমের জড়তা কাটিয়ে; নিস্তব্ধ প্রান্তরে —শালবনসীমায় খাড়া পাহাড়ের বুকে শব্দটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে— টং টং টং, টন্ ন্ ন···

জনহীন লালডাঙ্গার শেষে বিস্তৃত দিগন্তজোড়া সাদা আঁচল পেতে রেখেছে দামোদর। স্টেশন পার হয়েই লালডাঙ্গার পাশে একফালি সবুজের ছোঁয়া মাখানো মাঠ—দুচারটে আমগাছের প্রহরার পরই ধু ধু নদীর সীমানা। শেষ দেখা যায় না,—লি লি করছে বালি। বর্ষাকালে জল আর জল, ওপারের আবছা সবুজ সীমানা কালো বৃষ্টিধারায় ঢেকে যায়।

দু'চারজন প্যাসেঞ্জার আলপথে ছুটতে ছুটতে আসছে ট্রেনের ঘণ্টা শুনে। স্টেশনে কয়েকজন যাত্রী আসা-যাওয়া করে এই সময়েই, মানুষেব কথাবার্তাও শোনা যায়। তারপরই আবার সেই অন্তহীন স্তব্ধতার রাজত্ব নামে এখানে; রোদের তাপে প্রকম্প লাল কাঁকুরে উত্তরী রঙের ডাঙ্গার সীমানাশেষেই মামড়ার শালবনের শুরু। গভীর গহিন সাঙ্গীন বন। শাহীসড়ক চলে গেছে এর বুক চিরে। বহু অঞ্চল আছে যেখানের অরণ্য আজও 'কুমারী' রয়ে গেছে, মানুষের স্পর্শ লাগেনি।

কালীপুর স্টেশন দু'খানা আপ আর দু'খানা ডাউন গাড়ীর প্যাসেঞ্জার নিয়ে দিন কাটায়। বাকী এক্সপ্রেস মেল ট্রেনগুলো এর বুক কাঁপিয়ে ছুটে যায়। পরিত্যক্তের মত পথের ধারে পড়ে থাকে কালীপুর স্টেশন টুকু ওদের গতিবেগে ছিটকে ওঠা লাল ধুলোর মধ্যে। কালীপুর ওদের কাছে নেহাৎ ফালতু।

—অ্যাই রামভজু!

প্যায়েণ্টসম্যান-পোর্টার-কাম-বেয়ারা রামভজু বিশাল ভুঁড়ির উপর নীল কোটটা টেনেটুনে চাপিয়ে ডেসপ্যাচব্যাগ নিয়ে গার্ডের কামরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রবীনবাবু চশমা আর টুপি সামলাতে সামলাতে হুঁশিয়ারী হাঁক পাড়েন।

—খবরদার, লাইনের ধার থেকে সরে এসো সব।

তিন বারোর গাড়ী 'ইন' করছে কালীপুর স্টেশনে; অবশ্য ঘড়ির কাঁটা তখন চায়ের কোঠায় পৌঁছে গেছে।

সামান্য সময়ের জন্য ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছিল জায়গাটা, আবার ঘুমের গভীরে ডুবে আসছে। দু'চারজন প্যাসেঞ্জার—কেউ স্টেশনের বাইরে কালীপুর গাঁয়ের ধুলোঢাকা রাস্তায় হারিয়ে গেছে, কেউ বা আলপথ ধরে দামোদরের দিকে এগিয়ে গেলো। সূর্য পাটে যাবার আগেই দুস্তর ওই তিনমাইল লম্বা বালিয়াড়ি পার হতে না পারলে সমূহ বিপদ—জনমানবহীন এই স্টেশন প্লাটফরমেই পড়ে থাকতে হবে। জান মাল যে-কোন মুহূর্তেই শেষ হয়ে যেতে পারে; ওদিকে নদীর মধ্যে সন্ধ্যার আঁধার নামলেও সেই বিপদ। জোর পায়ে হাঁটছে তারা।

যত তাড়াতাড়ি এই ডাকাতে মানসুরের এলাকা পার হতে পারে যেন ততই মঙ্গল।

মাধুরী একাই বের হয়েছে। চৈত্রের প্রারম্ভ। বনে বনে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। শালবনে এসেছে কচি আকাশী রং সবুজের ফিকে আভাস—মহুয়া গাছের চারপাশে সৌরভমদির হয়ে উঠেছে। ঘন সবুজের মাঝে পলাশ গাছের সারিতে যেন আগুন লেগেছে—গন্‌গনে আগুন। চারদিকে তারই ছোঁয়াচ। বৈকালের পড়ন্ত বেলায় মাধুরী আনমনে চলেছে: হঠাৎ কি দেখে থমকে দাঁড়াল।

কালীপুর স্টেশনে নামতে এমন বিশেষ কাউকে সে দেখেনি, বিশেষ করে এমনি অসময়ে। বেশ ভদ্র কেতাদুরস্ত চেহারা। এক হাতে একটা বড় চামড়ার সুটকেশ—অন্যহাতে একটা হোল্ডঅল। কুলি-টুলি পাওয়া যায় না; ভদ্রলোক দুহাতে কখনও বা একটাকে কাঁকালে অন্যটাকে হাতবদলি করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে সরু আলের মাথায় নামিয়ে দম নিচ্ছে। ওদিকে দামোদরের দুস্তর বালিয়াড়ি. আর গ্রাম বলতে একমাত্র ওই ভুবনপুর। কুখ্যাত গাঁ, এই পড়ন্ত বেলায় ওই অঞ্চলে নেহাৎ পরিচিত লোক ছাড়া কেউ যেতে সাহস করে না—নির্জন ছায়ানামা বাগানেই ঘটে অনেক খুনখারাপি দিনে দুপুরে—সন্ধ্যার পর তো যমপুরী ও এলাকা। গেলেই ব্যাস! ভদ্রলোক বোধহয় এখানে নোতুন।

—শুনুন। মাধুরী বাধা দেবার চেষ্টা করল।

দাঁড়াল ভদ্রলোক ওর ডাক শুনে; মাধুরীকে এগিয়ে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

মাধুরীও দেখেছে ওকে। সদ্য গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারা, পরিশ্রমে ঘাম দেখা দিয়েছে বিন্দুবিন্দু।

—কোথায় যাবেন?

—ওই যে, ভুবনপুরে। কিন্তু স্টেশনে একটা কুলিও নেই। দেখুন না এগুলো এইটুকু পথ আনতেই হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে।

কি যেন একটু ভেবে মাধুরী বলে উঠল—দাঁড়ান, দেখছি যদি পাওয়া যায়।

ভুজুর ছেলেটা একটা আধছেঁড়া প্যাণ্ট পরে আদুড় গায়ে ছাগল চরাচ্ছিল মাঠে, দিদিমণির ডাক শুনে এগিয়ে এল।

—একটু বিছানাটা বয়ে দিয়ে আয় ভুবনপুরে।

—উরে বাব্বাঃ, উ যে ডাকাতের গাঁ গো, যদি দু'আধখান করে ফেলায়?

হাসছে ভদ্রলোক—না, না। সে ভয় নেই তুই চল্।

মাধুরীও ভাবগতিক দেখে হেসে ফেলল—তোর ছেঁড়া প্যাণ্টটা কেড়ে নেবার জন্য কেউ বসে নেই। আর তোকে এ মুলুকে সবাই চেনে। যা। বাবু বকশিশ দেবেন।

বকশিশের কথা শুনে ভয় কেটে গেল তার—দাঁড়ান আজ্ঞে, ছাগলটাকে ঘরে পুরে দিয়ে আসি, নাহলে দেবে শালার শিয়ালে এখনি শ্যাষ করে, পাঁচ আনার কেত্তন গাইতে গিয়ে পাঁচটাকার খোল ভাঙ্গবেক আজ্ঞে।

এদিকে খুব হিসেবী। কাজ সেরে ফিরে এসেই রওনা হয়ে গেল চড়াই-এর নীচে গাঁয়ের দিকে। মাধুরী একা দাঁড়িয়ে রইল।

ভুবনপুরের আচাইদের নাম চাকলাদের লোকের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। আড়ালে লোকে ওদের সম্বন্ধে নানানতর মন্তব্য প্রকাশ করে; অথচ সামনে তারাই প্রথমে নমস্কার করে, দেঁতো হাসি হেসে কুশল সংবাদ নেয়—ভালো আছেন তো বড়বাবু? প্রাতঃপেন্নাম হই।

ভুবন আচাই আজ বুড়ো হয়েছেন। বেশীর ভাগ সময় মন্দিরেই কাটান না হয় বাল্যের একমাত্র সহচর বিষ্ণু সাঁতরাকে নিয়ে গিয়ে গ্রামপ্রান্তে নির্জন দামোদরের উঁচু পাড়ের ধারে বসে থাকেন। বালিতে হাঁটবার সামর্থ্য নেই. স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে দামোদরের প্রশস্ত বুকের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন। সাদা বালির স্তূপের মাঝে মাঝে ক্ষীণ কাঁচধার জলরেখা; দূরে দূরে দুটো-তিনটে ধারায় বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে চরভূমি; মানা-বিন্না ঘাসে ভরে উঠেছে। বৃদ্ধ বয়সে মনে হয় তার জীবনের মতোই ও ঊষর বন্ধুর। কোথাও কোথাও মরাখাতে বয়ে চলেছে অতীতের স্মৃতির ফল্গুধারা; অতি ক্ষীণ সেই পরিক্রমা—সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টাও যে-কোন মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে নির্জন বনভূমি ছাপিয়ে গেরুয়া প্রান্তরে প্রান্তরে—প্রশস্ত নদীর বুকে। ওপারের আকাশ-সীমায় বিহারীনাথ পাহাড়ের নীল ছায়ারেখা মিলিয়ে গেছে। বালিচরে ডাকছে রাতের পাখী। ফিরছেন ভুবন আচাই গ্রামের দিকে।

মুখ-আঁধারিতে বাগানের মধ্যে কাদের পায়ের সন্তর্পণী শব্দ শুনে চমকে উঠলেন।

—কে যায়?

হঠাৎ থেমে গেল তাদের পায়ের শব্দ। এগিয়ে এল আঁধার ফুঁড়ে অভয় ডোমের দীর্ঘ কালো চেহারা।

—তুই! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ। অভয়ের কপালে খানিকটা লাল দগদগে মেটে সিঁদুরের দাগ। একরাশ ঝাঁকড়া বাবরী চুল, ঘাড়ের কাছে ছোট্ট গিট বাঁধা। এই বেশের অর্থ তিনি ভালোই বোঝেন।

—কোথায় চলেছিস?

মাথা নীচু করে দাঁড়াল অভয়—আজ্ঞে বড়বাবুর হুকুম।

অর্থাৎ ভুবনবাবুর কথাও যেন সেখানে টিকবে না। অভয় চলে গেল। আঁধার-ঢাকা বাগানের গাছগাছালির ফাঁকে দেখা গেল দু'একটা তারার দীপ্তি। বুড়ো বলে ওঠেন,

—দেখবি বিষ্টু, সব ছারখার করে দেবে ওই কন্দর্প। আমার সাজানো বাগান ছারখার করে দেবে।

কথা কইল না বিষ্টু, আঁধারের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়; সাপ-খোপ থাকতে পারে,—বন থেকে চিতাবাঘও নদীতে জল খেতে নামে এই মুখ-আঁধারী বেলায়।

—চলুন আজ্ঞে।

বুড়োকর্তাকে তাগাদা দিল সে।

যেন দুটো বিভিন্ন দেশ, বিশেষ সম্পর্ক নেই! মধ্যে ওই দুস্তর নদী চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিয়েছে দুটো জেলাকে। এপারে বর্ধমান—ওপারে বাঁকুড়ার প্রান্তসীমা। এদিকে বিস্তৃত শালবন-ঘেরা এলাকা—ওদিকে অজয়তীর পর্যন্ত বিস্তৃত; মধ্যে ইছাই ঘোষের গড় এলাকা, আজ সেখানে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। ন্যাতাড় লাগানো বন—মাঝে মাঝে একটু-আধটু ফাঁকা ডাঙ্গা—বাকী সবই বন-ঢাকা ঊষর পার্বত্য মৃত্তিকা।

...সমস্তটাই কন্দর্প আচাই-এর তাঁবে। রাতের আঁধারে ওর দলবল বের হয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, নিরীহ রাহী কিংবা শান্তিপূর্ণ গৃহস্থের

ঘরে হানা দেয়, জখম-খুনখারাপি করতেও তাদের বাধে না। রাতের অন্ধকারেই তারা আবার ফিরে আসে রণপায়ে চেপে। হাতে, ওদের সড়কিতে, গামছায় বেঁধে আনা টাকা গহনাতেও লেগে থাকে সেই হিংস্র রক্তের ছাপ। ওদের নাম শুনলে শিউরে ওঠে পুলিস। এযাবৎ ধরা কেউ পড়েনি। পুলিসও তাদের জানে চেনে—কন্দর্প আচাই-এর বাইরের বাড়ীতে হোমরা-চোমরা অনেকেই রীতিমত আসা-যাওয়া করেন। সেই কন্দর্প আচাই-এর আশ্রিত তাঁরা।

দীর্ঘ দেহ—চওড়া বুক—মুখের মধ্যে একটা ঋজু কাঠিন্য। টকটকে ফর্সা রং, চওড়া কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপণ্ড। পরনে লাল চেলী, সারা শরীরে কঠিন বিভীৎসতা ফুটে ওঠে।

প্রতি অমাবস্যায় চক্র বসে।

দামোদরের তীরে মহাশ্মশান থেকে তান্ত্রিক উচাটনানন্দ আসে শিষ্যকে শক্তি অর্জনের পথে এগিয়ে দিতে। গৌড়ীয়, পোষ্টেয় এবং মাধ্বী—তিন রকমের পানীয়ের একরকম হলেই চলবে। গৌড়ীয় অর্থাৎ গুড় থেকে তৈরী মদ, পৌষ্টেয় অর্থাৎ চালের পিঠে থেকে এবং মধু থেকে, তার মধ্যে প্রথম দুটোরই চল বেশী। শক্তি সাধনার প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ।

গুরুদেবের একমাথা জটা, সারা গায়ে ছাই মেখে তদ্‌গত হয়ে উপদেশ দেয়—শক্তি অর্জন করতে হবে বাবা। সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হবে পৃথিবীকে—মাটিকে -ভগবতীকে।

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতীরিতঃ।

বাংলার মৃত্তিকার এই ঐশ্বর্য ধন ভোগ করার স্বপ্ন শক্তিসাধকরা দেখেছেন, সংক্রমিত করেছেন ওই দৌর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখতে।

গুরুদেব একটা পাত্রে মদ প্রথম তুলে দেয়।

—মাধ্বীদং।

হাতের আঙুলগুলো বিশিষ্ট মুদ্রার ভঙ্গীতে সেই পানীয় গ্রহণ করে, গলায় ঢেলে দেয় কন্দর্প। শিরায় শিরায় তাজা পানীয় দুর্মদ শক্তি সঞ্চার করছে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক আছেই। জোর করে কালীপুর বনের ধারে বাগানবাড়ীতে ধরে-আনা কোন বউঝি, না হয় স্বৈরিণী আসে পঞ্চ 'ম'কারের সাধন সঙ্গিনী হতে।

সারারাত্রি চলে সেই নারকীয় বীভৎসতা। মদের অভাব নেই—তার

আশ্রিত অনেকেই চোরাভাঁটিতে মদ মহুয়ার মদ তোলে—কিছুটা কন্দর্পের ভোগে লাগে, বাকীটা চালান হয়ে যায় কলিয়ারীর দিকে।

বাসন্তী কিছু কিছু দেখেছে রাত্রির পর রাত্রি এই অনাচার। হোম পূজার সঙ্গে এটি ভোগাচারকে বীরাচারের অংশ বলে ওরা মেনে নিয়েছে—ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে অমানুষিক অধর্মকে।

ভুবন আচাই কানে শোনেন ওসব কথা। ছেলেকে সাবধান করা দরকার। তিনিও এক জীবনে বহুকিছু রোজগার করেছেন—কিন্তু বহুকষ্টে; জীবনে কোনদিন অন্যায় অত্যাচার করেননি। তাঁরই একমাত্র সন্তানের এই অনাচারকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

কন্দর্প আচার অসময়ে বাবাকে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হল; বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল মুখে-চোখে। বৈঠকখানায় দু'চারজন মোসাহেবও এসে জুটেছে, বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ এ সময়ে বাবাকে আসতে দেখে বাইরে উঠে এল কন্দর্প।

—একটু কথা ছিল। ভুবনবাবু ছেলেকে ডাকলেন।

অর্থাৎ ওদের কানে যাক কথাটা এ তিনি চান না। নিজের ঘরেই ডেকে আনলেন তাকে।

—আজও অভয়কে ওপারে যেতে দেখলাম।

—নিজের কাজে গেছে ওরা। স্রেফ জবাব দেয় কন্দর্প।

বুড়ো ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—লোকের মুখে শুনি প্রায়ই নাকি ওয়াগন লুট হচ্ছে আমাদের এলাকায়।

—মালিয়াড়ার মুখুয্যেদের যোগসাজসেই হচ্ছে এসব। জবাব দিল কন্দর্প।

বুড়ো কি যেন একটা কঠিন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন—যেইই করুক, এ সব ভালো নয় কন্দর্প। এত বাড় ভালো নয়—উত্থানের পর পতন হবেই।

—আর কিছু বলবেন আমাকে? ওসব কথা এড়িয়ে যেতে চায় কন্দর্প।

ভুবনবাবুর বলবার অনেক কথাই ছিল। কিন্তু কাকে বলবেন? কন্দর্প এড়িয়ে যাবে সব কথা—নাহয় প্রতিবাদ করবে। হতাশ হয়েছেন তিনি। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—সৎপথে চলো কন্দর্প। জীবনে সৎভাবে চলেই যা কিছু অর্জন করেছি।

মালিয়াড়ার মুখুয্যেদের সঙ্গে ফৌজদারী চলছে তিনটে। চর দখল নিয়ে ঝুলছে একটা ফ্যালসানি কেন ; বাবা বোধহয় তারই ইঙ্গিত করছেন।

কন্দর্প বলে,—তাই বলে বিষয়-সম্পত্তি রাখবার জন্য ফৌজদারী, মামলা-মকদ্দমা চলবে না ?

এ কথার জবাব দিলেন না ভুবনবাবু। কন্দর্প যেন একরকম পাত্তাই দিল না তাঁকে। চলে গেল সটান নিজের ঘরে। আজ বৃদ্ধ স্থবিরকে সংসার থেকে বাতিল করে দেবার চেষ্টায় সে আগাগোড়া মিথ্যাই বলে গেল তাঁর সামনে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভুবনবাবু।

এমন সময় কার পায়ের শব্দ এল। মুখ তুলে চাইলেন বৃদ্ধ—কে ?

অস্পষ্ট আলোয় দূরের মানুষ ভালো ঠাওর হয় না। এগিয়ে এল মানব।

—দাদুভাই ?

—হ্যাঁ ! মানব প্রণাম করে দাঁড়াল।

—ভালো ছিলি তো ? কলেজের ছুটি হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ, বৈকালের গাড়ীতে এলাম।

ভুবনবাবু তরুণের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। বাবার মত কঠোর কাঠিন্য কোথাও এর মুখে নেই, দুচোখের দৃষ্টিতে আছে প্রতিভার ছাপ. সরল কমনীয়তা সারা মুখেচোখে ফুটে উঠেছে। কন্দর্প আর তার ছেলে ! আসমান জমিন তফাৎ।

বাবার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল দাদু ? আবার ফৌজদারী বাধাবে নাকি ?

—কেন ? হাসলেন বৃদ্ধ।

ওসব লাঠালাঠি আমার ভালো লাগে না বাপু। বাবা কি বলে জানো ? মাটি বাপেরও নয়—দাপের। দরকার নেই ও মাটির।

বৃদ্ধ ম্লান আলোয় মানবের মুখের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে বললেন, —ভয় পেলে নাকি দাদুভাই ?

—ভয় কেন ? তবে অত্যাচারকে আমি ঘৃণা করি দাদু।

বাসন্তী আজ দীর্ঘ তিরিশ বছর আগে ভুবনপুরের আচাইবাড়ীর বধূ হয়ে এসেছিল। কন্দর্প তখন সবেমাত্র কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছে। আজ সেই বাসন্তী প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেচে, সারা দেহ ঘিরে একটা শান্ত মধুর শ্রী ফুটে উঠেছে।

সন্ধ্যারতির পর শ্বশুরমশায় মন্দির থেকে ফিরে নিজের ঘরেই ঢোকেন—বিষ্ণু সাঁতরা কোন কোন দিন রামায়ণ পড়ে—নাহয় ভাগবত শোনায় ; নইলে একাই জপের মালা হাতে বসে থাকেন তিনি। রাতের খাবার

সামান্য দুধ সন্দেশ আর ঘরের ঘিয়ে ভাজা খানকয়েক লুচি নিয়ে গিয়ে নিজেই খাইয়ে আসে বাসন্তী। এ কাজটা আর কাউকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না সে। বৌমা নিজে না এসে ভুবনবাবুরও যেন খাওয়া হয় না। রোজকার মত আজও ঘরে ঢুকে বাসন্তী একটু বিস্মিত হয়।

—এখনও দাদুকে বকাচ্ছিস মানব ?

হাত বুলিয়ে বামুন মেয়ে মেজেতেই জায়গা করে দিয়ে, থালা-বাটিগুলো নামিয়ে রাখলো। ভুবনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন,—না, মা, বকাবে কেন ? বেশ কথাবার্তা বলছিলাম ওর সঙ্গে। তোমার কিন্তু সমূহ বিপদ বৌমা।

—কেন বাবা ? বাসন্তীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল।

—ও বলে কি জানো বৌমা, মালি-মকদ্দমা, ফৌজদারী এসব নাকি ওর ভালো লাগে না। সম্পত্তি টিকবে কি করে বলো ?

জবাব দিল মানব—নিজেই যদি পারি তবে রোজকার করে নোব মা ; এসব অত্যাচার করা অন্যায়।

ছেলের দিকে চেয়ে রইল বাসন্তী, ওর কথাগুলো ঠিক যেন যেন বুঝতে পারে না।—কে জানে বাবা, কলেজে কি এইসব আজকাল শেখানো হয় ?

হাসছেন ভুবনবাবু। বাসন্তীর মনে সত্যিই ভয়। স্বামীর সামনে এসব আলোচনা করবার সাহস তার নেই।

রাত্রি নেমে আসে নির্জন প্রান্তরে ; শালবনের অতলে বয়ে চলেছে ঘন তমসার স্রোত ; অন্ধকার বনতলে জ্বলছে শ্বাপদ লালসায় দুটো চোখ—সারা গায়ে তার জোনাকী পোকার ভিড়। শূন্য আকাশের বুকে মিটি মিটি জ্বলা পোকাগুলো ছেঁকে ধরেছে হিংস্র দানবকে। বনে আলোড়ন পড়ে গেছে। নিষ্ঠুর আক্রমণে লুটিয়ে পড়ল একটা শশাড। শেষ আর্তনাদ পল্লবমর্মরে নিঃশেষ হয়ে গেল।

অভয় ডোমের দল ফিরছে নদীর ওপার থেকে। বালিতে কুয়াশার স্বল্প জমাট আস্তরণ, বাতাসে বাতাসে ক্ষীণ অস্বচ্ছ যবনিকা।

—দাঁড়া।

পাতটাঙ্গি দিয়ে নদীর পাড়ে শক্ত মাটি খুঁড়তে লাগল তারা।

—বেশী করে খোঁড়্, নইলে শিয়াল-শকুনিতে তুলে ফেলাবেক।

হাত তিনেক গর্ত করে তার ভিতর রক্তাক্ত কি একটা বস্তু পুঁতে মাটি চাপা দিতে লাগল।

—সর্দার! কে যেন ফিস্ কিস্ করে উঠল। শিউরে উঠল সর্দার ; আকাশে বাতাসে যেন কোন্ অশরীরীর আনাগোনা।

সর্দার তখন নীলে হাড়ীর মাথাটা পুঁতে চলেছে।

কুক্ষণেই আজ যাত্রা করেছিল তারা; বাধা পড়েছিল পথে। নেহাৎ ভুবন আচাই ডেকেছিল, অন্য কেউ হলে শেষ করে দিয়ে যেতো তাকে। গ্রামের লোক চারদিকে ঘিরে ফেলেছিল তাদের। ঘেরাও বন্দী ডাকাতদল বামাল নিয়ে পালাবার যোগাড় করে ফেলে। নীলে হাড়ী গোল বাধাল। গুলির চোটে ছিটকে পড়তেই পাশেই ছিল অভয়—হাতের হেসোর এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডুটা কেটে চট জড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। মুণ্ডুহীন ধড় কেউ সনাক্ত করতে পারবে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নীলে হাড়ীর শেষ অনুনয়—মারিস না, মারিস না অভা।

কিন্তু এ ছাড়া পথ ছিল না, দলের সকলকে বাঁচাতে হবে। জ্যান্ত লোকটাকে দুখণ্ড করে দিয়ে এসেছে। নিজেরই জাত-জ্ঞেয়াতকে শেষ করে এসেছে।

সড সড করে কি যেন একটা মানাবনের দিকে পালাল।...চমকে ওঠে তারা।

—বনশূয়োর! পরমা ডোম বলে ওঠে।

নদীর জলে হাত-পা ধুয়ে রাতের আঁধারেই ফিরে এল তারা। কন্দর্প আচাইকে খবরটা দেওয়া দরকার, কে জানে যদি কোন হাঙ্গামা হয়।

অভা ডোমই এগিয়ে গেল।

বাসন্তী স্বামীকে নেমে যেতে দেখেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে; হঠাৎ ভর্তি রাতে কি যেন বিপদ নেমে এসেছে তাদের বাড়ীতে। ধমকে উঠল কন্দর্প—তোমরা শোওগে যাও।

মানবও উঠে এসেছে। নীচের দেউড়িতে কি একটা অস্পষ্ট কোলাহল। ছায়ামূর্তিগুলো ঢুকছে।

স্বামীর এই কঠিন ধমকানির অর্থ বুঝতে পারে বাসন্তী। এমনতর ঘটনা আজ নতুন নয়। মানবের সামনে সে যেন আজ কি লুকোতে চায়—যা, বাবা। শোগে। এখন অনেক রাত আছে।

কন্দর্প নেমে গেল বাইরের মহলে। ওরা ফিরেছে। কেমন একটা রহস্যাবৃত সব কিছু। রাত্রির জীব রাতেই ওদের আনাগোনা। জেগে আছেন ভুবনবাবু। বৃদ্ধ বয়সে এমনিই ঘুম পাতলা হয়ে গেছে, তার উপর কি এক মানসিক অশান্তি গুরুভারের মত চেপে বসেছে তাঁর সারা মনে, শান্তির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করেছে তাঁকে।

জানালা দিয়ে চোখ মেলে রয়েছেন—বিস্তৃত দামোদরের বালি-ঢাকা

বুকে রাত্রির ক্ষীণ জ্যোৎস্না মৃতের স্তব্ধতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। নীচে থেকে ওদের উত্তেজিত কণ্ঠের কথাবার্তা ভেসে আসে, কন্দর্প ধমকাচ্ছে কাকে, —হারামজাদা কোথাকার। মরবি কোন্‌দিন।

—ক্ষ্যামা করেন বাবু, ক্ষ্যামা করেন। অভয়ের ভীতত্রস্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

রাত তখনও শেষ হয়নি। ভোরের পাখীর ডাকে মুখর হয়ে উঠেছে বনভূমি—নদীর চর। বালিয়াড়িতে হালকা সন্তর্পণী পায়ের দাগ ফেলে ফেলে বনের গভীরে অন্তর্হিত হয়ে গেল চিতাবাঘ তার পরিক্রমা সেরে।

ভোরের নিস্তব্ধ আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল নীলে হাড়ীর ডবকা যোয়ান বৌটা,

—ওগো! কুন খানে গেলা গো!

ওদের ঘরে এসব আখচার ঘটে। নীলের মা বুক বেঁধে সান্ত্বনা দেয়—চুপ দে বাছা—এখুনি এক কাল্লা সাত তেঁতো করে দিবেক।

জানাজানি হলেই বিপদ; পাড়ার আরও পাঁচজনকে শুনিয়ে বলে উঠল বুড়ী—বাপটো বিজায় পড়ে রইছে, তাই মনের খেদে কাঁদাকাটা করছেক।

গলা নামিয়ে শাসায়—চুপ দে লো। ও ভাতারখাগী। বড়ো সতী হইছিস আজ!

নীলের বৌটা ঘ্যান ঘ্যান করে নাকে কাঁদে। নীলের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা ভেঙ্গে তাকে কেউ না বল্লেও সে জানে তার অনুমান সত্য। অপঘাতেই মারা পড়েছে সে।

পরমা ডোম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল—জানলা খুড়ী, আচাই মশাই নগদ দুশো টাকা দিবেক বলেছে। যেও কিন্তুক আজ সাঁঝ বেলাতেই।

হাজার হোক মায়ের প্রাণ, হোক না ডাকাতের মা। বুড়ী খ্যাঁক করে ওঠে,—রাখ তুর টাকা, লাখ টাকার ছেলে গেলো—দুশো টাকায় আমার কি দুখ্‌ ঘুচবেক?

পরমা চুপ করে চেয়ে রইল বৌটার দিকে। সারা মনে ওর অতৃপ্ত কামনার জ্বালা। নীলের উপর এতদিন একটা হিংসা তার ছিল—আজ সেটার কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারে।

—ঘরকে যা তু। বুড়ী যেন পরমার মনের ইচ্ছা টের পেয়েছে। পরমা আমতা-আমতা করে উঠলো অগত্যা। যাবার মুখে দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে বলল,

—বলছিলাম খুড়ী—নীলে-দা শেষ সময়ে বলে গেছে—

বুড়ী ধমক দিল—যাবি মুখপোড়া !

আঁৎকে উঠল পরমা—এই যেছি গো। ইজী শূয়োরখ্যাদা করছ !

বুড়ী গজ গজ করতে লাগল আপন মনে।

—দাঁড়াও। দাঁড়াল পরমা। এগিয়ে এল টগরবৌ।

—কি বলেছিল তুমাকে ?

—বলেছিল তুই মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর লিবি, উদিকে তো দামোদরের দহে ভাসিয়ে গেলাম।

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল পরমা, হঠাৎ বুড়ীকে এদিকে আসতে দেখে সরে গেল আড়ালে। টগর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বুড়ী চিৎকার করতে লাগল,

—ভাতারের মাথা তো খেয়েছিস, বলি নোয়া সিঁথির সিন্দুরও কি বাড়াতে হবেক নাই ! ছেরোক্কালই এয়োতি হয়ে থাকবি নাকি লা ? বলি ও সব্বোনাশী, কথা কানে গেল ?

কথা কইল না টগর। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই।

ঘটনাটা খানিকটা অনুমান করেছিল মানব। রাতের আঁধারে ওদের রহস্যজনক আনাগোনা, নীলে হাড়ীর সম্বন্ধে কি সব কথাবার্তাও শুনেছিল, সেই ভোরেই ওর বৌ-এর মড়াকান্নাও শুনেছে মানব। বাবা সকালেই বের হয়ে গেছে ঘোড়ায় চেপে—দুপুরেও ফেরেনি। সারা বাড়িতে যেন একটা থমথমে ভাব। ঠিক বুঝতে পারে না - হেঁয়ালির মত ঠেকে।

—কি ব্যাপার বলতো দাদু ?

বৃদ্ধ ভুবন আচাই কথা বললেন না, একবার স্থিরদৃষ্টিতে নাতির মুখে কি যেন সন্ধান করলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন,—কি জানি ভাই, এসবের কিছু বুঝি না।

—আমারও কেমন ভালো লাগছে না দাদু।

মানবের মন একদিনেই যেন বিষিয়ে উঠেছে। মা নীরবে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। বাসন্তীর মুখেচোখে থমথমে ভাব—একটা চাপা উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে। স্বামীকে কোনমতেই নিরস্ত করতে পারেনি সে এই নিষ্ঠুর নেশার প্রলোভন থেকে।

—একটু বেড়িয়ে আয় গে মানব। সারাদিন বাড়ীতেই রয়েছিস কিনা।

কেউ মানবের মনে এই জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দিতে চাইল না, হয়তো ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল ওরা সবাই। একাই সে বের হয়ে এল পথে। বৈকালের

আলো নেমেছে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে ধুলো-কাঁকর-ঢাকা পথে; পথ ঠিক নয়—উঁচু বন প্রান্তর, গড়ানি জল যাবার রাস্তা শুকনো হয়ে পথেই পরিণত হয়েছে। অল্প দূরে ডাকছে দু'একটা পাখী।

চড়াই-এর মাথাতেই স্টেশন সিগন্যালগুলো পড়ন্ত রোদে বনের বাইরে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম কোলে পলাশের রং মাটির গৈরিকের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গতদিন বৈকালের কথা। একজনের কৌতূহলী ডাগর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল মানব। সেও ছিল এমনি পড়ন্ত স্বর্ণগোধূলি বেলা।

স্টেশনের কাছে গিয়ে হঠাৎ সেই ছেলেটার দেখা পেয়ে গেল মানব। কি যেন ভাবছে মানব। কি মনে করবে ছেলেটা—নাঃ। কৌতূহল চেপেই কালীপুর হাটতলার ছোট দোকানগুলোর দিকে এগোতে লাগল সে। স্টেশন ঘুরে আবার বাড়ী ফিরবে। কিন্তু কি ভেবে ডাকলো ছেলেটাকে।

কালই একটা আধুলি বকশিশ দিয়েছিল ওকে ভুবনপুরের আচাইদের বাড়ীর বাবু। তার ডাকে হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়াল ছেলেটা।

মানব প্রশ্ন করল একটু ইতস্তত করে, ওই দিদিমণি কোথায় থাকে রে?

—ওমা জানেন না বুঝি। কেন, ওইতো ওই লাল বাড়ীটায়; সোজা চলে যান। মাস্টরবাবুর বাড়ী।

কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় মানব। এর চেয়ে রাতদুপুরে মামড়ার জঙ্গলে একা সেঁধোনো সহজ।

—তুই গিয়ে বলগে কালকের বাবু একবার ডাকছেন।

ছেলেটা হাত পাতে—একটা বিড়ি দ্যান তবে। আর ছাগলটা রইল, উটা যেন পাশের ক্ষ্যাতে মুখ না দেয় কিন্তুক।

—আচ্ছা তুই যা।

তাকে পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানব মাঠের ধারে।

ছাগলও যেন বাগ পেয়েছে। বার কতক এদিক ওদিক করেই সোজা গিয়ে পাশের জমির লকলকে কুমড়োর ডাঁটা চিবুতে লাগল।

—হেই।

ঢিল মারতে থাকে মানব। ছাগল তবুও নড়ে না। অগত্যা নিজেই সে ছুটলো ছাগলের পিছনে,—হেট—হ্যাট!

উঁচু-নীচু আলপথ।। কোঁচা গুটিয়েই ওঠা-নামা করতে থাকে মাঠময়। ছাগল এঁকে-বেঁকে দৌড়াচ্ছে। দূরে কুমড়ো ক্ষেতের মালিকও শাসাচ্ছে—

ছাগলে গাছ খেলে ভালো হবেক নাই কিন্তুক। বনেদ তেড়ে তুব ছাগলের।

গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে মানব এই চাকরিতে। হঠাৎ পিছনে কার হাসির শব্দ শুনে ফিরে চাইল। ক্লান্তিতে তখনও হাঁসফাঁস করছে সে।

—ওমা! ছাগল চরাচ্ছেন বুঝি?

—মানে! এই। কি জবাব দেবে খুঁজে পায় না।

ইতিমধ্যে ছাগলটা ছেলেটাকে দেখে আবার সুড় সুড় করে এসে ঘাস খেতে শুরু করেছে।

—এলাম কালীপুরে, ভাবলাম দেখা করে যাই। তাছাড়া কাল একখানা রুমাল ফেলে গেছি, তাই খুঁজছিলাম।

কথাটা বলেই মাথা নামাল মানব। মাধুরী হেসে উঠল,—শেষকালে আমাকেই চোর ঠাওরালেন নাকি? লোকজন ডেকে দিলাম কিনা—

—না-না। বরং কাল লোক না পেতে খুব বিপদে পড়তাম।

রূপোলী আভায় ভয়ে উঠেছে নির্জন প্রান্তর। বিকেলের ট্রেন চলে গেল। দু'একজন যাত্রীও হারিয়ে গেছে কালীপুরের অবাধ দিগন্ত-কোলে। আবার সেই স্তব্ধতা নেমে আসে, বাতাসে ভ্রমরের গুঞ্জন তুলেছে প্রকল্প টেলিগ্রাফের তারগুলো।

মাধুরী আমন্ত্রণ জানায়,—বাড়ীর দিকে চলুন। গরীবের ঘরে এক কাপ চা-ই না হয় খেয়ে যাবেন।

—না, থাক, অন্যদিন হবে। আজ দেরি হয়ে গেছে।

মানব ডাঙ্গার উঠে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। এতক্ষণ যেন সব ভুলে গিয়েছিল সে, অন্য কোন মধুময় জগতের স্বাদে বিভোর হয়ে উঠেছিল। আবার ভুবনপুরের সেই স্তব্ধ বাড়ী—নীলে হাড়ীর মায়ের গ্যাঙ্গানী কান্না—বাবার গম্ভীর মুখ তার মনের সব কমনীয়তাকে নিঃশেষ করে দিতে উদ্যত হয়।

—নমস্কার ছোটবাবু। ইস্টিশানের দিকে গিইছিলেন বুঝি? মুকুন্দ সাঁপুই সিটাকে বাঁকানো শিরদাড়া নুইয়ে নমস্কার করে। পিছনে দাড়িয়ে অভা ডোম। চলতি কথায় ওকে কালাপাহাড় বলে ডাকে সবাই। ডাঙ্গার পাশ দিয়ে বনের দিকে চলেছিল তারা এই সন্ধ্যার মুখোমুখি।

—হ্যাঁ। ছোট্ট জবাব দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে মানব।

—গরীবের দোকানে একবার পায়ের ধুলো দেবেন। মুকুন্দ হাসছে।

কুতকুতে ছোট দুটো চোখের দৃষ্টিতে কি যেন শয়তানি ফুটে উঠেছে। অভাকে ওর তুলনায় শিশু মনে হয়।

—আচ্ছা। পাশ কাটিয়ে চলে আসে মানব।

ওরা দুজনে নুইয়ে পড়া বন-খেজুরের ঝোপের পাশ দিয়ে সুঁড়ি রাস্তা ধরে বনে ঢুকলো। অসময়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে অভা ডোমের গতায়ান থাকতে পারে কিন্তু মুকুন্দ সাঁপুই কোন সুবাদে ওর সঙ্গে চলেছে ঠিক বুঝতে পারল না মানব। সবই যেন কেমন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। একটু পরেই বনের আড়ালে মিলিয়ে গেল ওরা। স্তব্ধ নির্জনতা জমাট হয়ে নেমে আসে, গৈরিক প্রান্তরের বুকে রাত্রির আঁধার নেমে আসে সবকিছু গ্রাস করতে।

খুদে—নুনে—বরাকর
তিন নিয়ে দামোদর।

শুধু তিন কেন বহু তিনের সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই দামোদর নদ। ছোটনাগপুর, হাজারীবাগ, মানভূমের সমস্ত জলধারা এর বিশাল বিস্তীর্ণ বুক দিয়ে নেমে আসে বর্ষার প্রারম্ভ হতেই। জলের সঙ্গে ঠেলে নেমে আসছে উর্বর বালি আর মাটি। জমির মৃত্তিকাটুকু ক্ষয়ে ক্ষয়ে রক্তরাঙ্গা মৃত্তিকার শেষ জীবনীশক্তি শুষে এর জল আরক্তিম হয়ে ওঠে। বালিতে নদীর খাত বুজে গেছে, তাই এর বিস্তার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। কোথাও বা দু'মাইল তিনমাইল অবধি চওড়া। মাঝে মাঝে সেই পলি জমে চর গড়ে উঠেছে। উর্বর সরস দোবরা মাটি। সোনা ফসলের ভারে নুইয়ে পড়ে গাছগুলো, আর জমে বিন্না, কাশ ঘাস, মানা বন। লকলকে উর্বরা মাটিতে পাঁচহাত ছহাত অবধি উঁচু হয়ে ওঠে। শিকড়গুলো মাটির বুকে যেন জাল বোনা করে ঘিরে রেখেছে।

দুপাশে তার নদীর বারোমেসে খাত, হাঁটু-তোর কাঁচধার জল বয়ে যায়, কোথাও বা দহ পড়েছে। কালো জল স্রোতের আবর্তে ঘুরপাক খায়। দু'একটা কাচা-মাছ একবার মাথা তুলেই আবার ডুব দেয় দহের জলে।

ভুবনপুরের জঙ্গলের নীচেই দামোদরের বুকে বিস্তীর্ণ চরের ইজারা নিয়েছে নিতাই গোয়ালা। মানগাঁয়ের বিখ্যাত লোক—এ এলাকার মধ্যে দুধ, দই, ঘি, মাখনের বড় কারবারী। কয়েক শো গরু-মোষ নিয়ে তার ব্যবসা। রোজ ভোরের ট্রেনে পঁচিশ ত্রিশজন বাঁকী বাঁকে করে দুধ. দই, ঘি, মাখন নিয়ে আসে। বর্ধমান, আসানসোল, কলকাতায় মাল চালান যায়।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই নিতাই চরে ঘুরতে বের হয়; মানা বনের মাঝে বেশ খানিকটা জায়গা সাফ-সুতরো করে ঘর বানিয়েছে। নদীর জল ছাড়াও নিজেই কয়েকটা কুয়ো তৈরি করেছে। খড় কাটছে কয়েকজন লোক, একজন লোক বালতিতে করে খোল তিজোচ্ছে, অন্যজন জাবনা দিয়ে

চলেছে গরুগুলোকে। চরানের অভাব নেই। চরের সবুজ বিন্না ঘাস বাবলা গাছের গুটি তো আছেই। মোষগুলো নদীর ধারানি পার হয়ে শালবনে গিয়ে ঢোকে। কচিপাতা খেয়ে নধর হয়ে উঠেছে তারা।

—ভাসানী। ও ভাসানী।

মাখন তোলা হচ্ছে বড় বড় হাঁড়িতে মাঠা ফেলে তাতে মাখন টেনে। ভাসানী বড় গামলার ভিন্ন ভিন্ন হাঁড়ি থেকে মাঠা এনে ঢালছে। গালিয়ে গাওয়া ঘি হবে। বাবার ডাকে ফিরে চাইল।

—ডাকছো বাবা?

—ঝিঙে পাতা কতকগুলো নিয়ে আসবে।

নিতাই ঘোষ গরুর রোগের চিকিৎসাও জানে। এত গরু-বাছুরের মধ্যে থেকে থেকে জাতবিদ্যাটা ভোলেনি। পাতাগুলো নিংড়ে রস করে আনল ভাসানী।

—দে! একটা বাছুরের চোখে ছানি জমেছে। রসটা ঢেলে দিল তার চোখে।

নির্জন নদীচর হাম্বা রবে ভরে উঠেছে। বাছুরগুলো ডাকছে, সারা জায়গাটাতে একটা প্রাণ-চাঞ্চল্য। ভাসানীও এই জীবনের সঙ্গে যেন নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে।

—কি বাচ্চা হল?

ব্রজ বাছুরটাকে ধরে গরুর সামনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। টলছে সদ্যজাত বাছুরটা। মা ওর গায়ে জিব বোলাচ্ছে। ভাসানীকে দেখে চোখ তুলে চাইল ব্রজ।

—দেখ কেনে কাছে এসে।

কাছে আসতেই ওর লাল শাড়ীটা দেখে—শিং নেড়ে ফোঁস্ করে উঠল গরুটা। আৎকে উঠল ভাসানী—ওমা, মারবি নাকি লা?

হাসল ব্রজ—তুকে বলি রাঙ্গা শাড়ী পরিস না বাথানে। দিকে কুন দিন মেরে শ্যাষ করে।

ভাসানীও ছাড়াবার পাত্রী নয়, কাছে এসে গরুটার গলায় হাত বোলাতে বোলাতে বললে,—এত গিদের কিসের লা তুর? দু দুটো বিয়োলি, দুটোই ত এঁড়ে বাছুর। তাও যদি বক্না হোত?

হঠাৎ ব্রজের দিকে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগল ভাসানী। ব্রজ কথা কইল না। নীরবে নদীর দিকে হাত ধুতে চলে গেল। কথা কইল না ভাসানী।

আনমনে ঘরের দিকে এগিয়ে চলল সে। সকালের লাল আভা লাগানো রোদ হলদে হয়ে উঠেছে। বালিচরে—দূরদিগন্তে পাহাড়-বনসীমায় লেগেছে তার মাতাল ছোঁয়াচ। ব্রজের ওই হাসির অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না ভাসানী।

সারাদিন সে কাজের ভিড়ে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। মানুষ দু'দণ্ড চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু কয়েকশো গোরুবাছুর দুধেল মোষ ও-নিয়ম মানতে রাজী নয়। তারা খেয়াল-খুশিমত হাঁকডাক করবেই। মালিকের মেয়ে ভাসানী, তার কাজকর্ম বিশেষ করবার নেই। নিতাই তবু বলে,

—বাপবিটীর ভাতটা রাঁধিস আর উদের সঙ্গে সাথে ঘুরবি নইলে উরা কি ভাববেক।

অবাধ ঘোরাফেরার স্বাধীনতা বাবাই তাকে দিয়েছে।

ব্রজকে আপনজনের মতই মানুষ করেছে নিতাই। কেমন ভালো লেগে গেছে তাকে। গোয়ালাদের মধ্যে লিখতে পড়তে হিসাব নিকাশ করতে পারে সেই-ই, তাছাড়া গরু-বাছুর সম্বন্ধে জ্ঞানও আছে।

—এমন ছেলে আর হয় না আমাদের বেজোর মতন। মুখে রাটি নাই।

গোয়ালাদের ওই চরভূমিতেই গড়ে উঠেছে ছোট্ট বসতি। ব্রজ তাদের মধ্যে পরিচিত—প্রিয়, অনেকের আবার চক্ষুশূল।

—আজ যে পনের সের দুধের হিসেব গোলমাল? ব্রজের নজর সবদিকে।

পাতু গোয়ালা মহাজনদের কাছে গিয়েছিল স্টেশনে, সেখানেই কিছু করেছে। পাতু আমতা আমতা করে। ঠাস করে ব্রজ বসিয়ে দেয় ওর গালে এক চড়—শালা, পেয়েচো কি? নিতাই ঘোষের দুধের বদনাম।

—যাক যাক, যেতে দাও। কে যেন চাপা দেবার চেষ্টা করে ব্যাপারটা। নিতাই ঘোষ সমস্ত বিষয়ই দেখাশোনার ভার ব্রজের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

পাতু গজরায়—চল্‌কে পড়ে গেইচে যিগো।

—এতদিন পড়েনি!

কৈফিয়ৎ ব্রজের মতঃপূত নয়।

আড়ালে গজগজ করে পাতু—শালা বাপের সম্পত্তি পেয়েছে, ওই বেজা শালা।

পাতুর সমর্থকও দু'একজন জোটে, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস কারো নেই। ব্রজর দৈহিক ক্ষমতাটাও জানে তারা। অম্বুবাচীর লড়াই-এ সেই ক্ষমতার পরখও হয়ে গেছে।

সে দিনগুলো ভাসানীও ভোলেনি। উষর মরু-প্রান্তরের মত স্তব্ধতা-ঢাকা তপ্ত চরভূমিতে গ্রীষ্মের তীব্রতার পরই নামে প্রথম বর্ষার পড়ন। তামাটে আকাশকোলে

দেখা দেয় ছিটেফোঁটা মেঘ—দু'এক পসলা বৃষ্টি নামে অমৃতধারায়। স্নিগ্ধ গৈরিক মাটির বুক থেকে আসে মিঠে লোভনীয় সৌরভ। গ্রীষ্মের নিস্ফলা বন্ধ্যা ধরণী ঋতুমতী হয়ে উঠেছে।

—নাই মাস নাই তিথি।

আষাঢ়ের সাতদিনে অম্বুবাচী।

আগামী বর্ষায় ফসলের সঞ্চয়ের আভাস আনে।

—ঢুঢুম ঢুঢুম ট্যাং। নদীর বিস্তীর্ণ চরের বুকে ঢোল কাঁসির শব্দ উঠেছে বৈকালের পড়ন্ত রোদের বেলায়। দুদিন ধরে চলে ওদের উৎসব মৃত্তিকা ও নদী বন্দনা। উদ্দাম নদীর বুকে বাস করে—কখন হড়পা বান আসবে জানা নেই। নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই তারা দামোদরকে পুজো দেয়। অন্তর থেকে হাঁক পাড়ে—বাবা দামোদর কি জয়! হেঁই বাবা!

ঢোলের শব্দ বালিচর, শালবনসীমা পার হয়ে দূরদূরান্ত অবধি ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে।

মানবও নিমন্ত্রিত হয়ে গেছে এই পরিবেশে। চারিদিকে দামোদরের বালির সীমানা আর জল। সবে পশ্চিমের বনে ঢল নেমেছে। নদীর কালো শাড়ীর রঙে সবে যৌবনের ঘোর লেগে উঠেছে। একটা শিশু ছাতিমের নীচে মানাঘাসের ছাউনি করে ঠাঁই হয়েছে।

—আসুন, আসুন!

মানবকে অভ্যর্থনা জানাল নিতাই, নিতে নিয়ে এসে বসাল ওকে একটা মোড়ায়, দই-এর শরবত নিয়ে আসে ভাসানী। একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে মানব। নিটোল বর্ষার ভরা দামোদরের মতই উদ্দাম ওর রূপ। এই অর্ধবন্য, আদিম পরিবেশে ভাসানীর মত মেয়েকে দেখবে আশা করেনি।

—লিন গো। এগিয়ে দিল গেলাসটা।

বলে ওঠে নিতাই—বড্ড খরানি, ছোটবাবুকে হাওয়া কর দিকিন এট্টু।

বাধা দেয় মানব। ওর হাত থেকে পাখাটা নিয়ে বলে,—আমাকে দাও।

মানবের দিকে চেয়ে আছে ভাসানী—মনে হয় কত কালের আপন ওই ছেলেটি; মুখের আদল তার চেনা—মনে হয় একছাঁচে ঢেলে কেউ গড়েছে।

আসরে কুস্তি শুরু হয়েছে। গোবরা চরের মধ্যে একজন নামকরা লড়ুয়ে পালোয়ান—ব্রজ নিজেই তার সঙ্গে আজ কুস্তি লড়ছে। সুন্দর সুঠাম সুগঠিত স্বাস্থ্য। দুজনেই সমান। ব্রজই সাবধানী—ক্ষিপ্র। নিপুণভাবে প্যাঁচ কষতেই ছিটকে পড়লো দূরে গোবরা। ঢোল বেজে ওঠে—চিৎকার করে জনতা সমস্বরে।

মানব হঠাৎ ভাসানীর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়। এতক্ষণ তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে ছিল যুধ্যমান দুজনের দিকে, ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেছে, জিতেছে ব্রজই। খুশির আভায় ভরে ওঠে ওর মুখ-চোখ।

হঠাৎ মানবের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে মাথা নামাল ভাসানী, ওর মনের গোপনতম দুর্বলতা যেন অন্য জনের কাছে ধরা পড়ে গেছে। সরে গেল সেখান থেকে ভাসানী। ব্রজের দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিল ভাসানী। ছি! নিজেরই লজ্জা করে।

সেই স্মৃতি আজও ভোলেনি ভাসানী। সেই ব্রজ যেন অন্য মানুষ। সবসময় তাকে ধরা যায় না। ভাসানী সেই কঠীন পৌরুষময় মানুষটিকেই অজান্তে ভালবেসে ফেলেছে।

—একটু মাছ দিই? ভাসানী বলে ওঠে।

ব্রজ সকলের সঙ্গে অন্যত্র খায় না, নিতাই-এর জেদেই এইখানে তার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভাসানীই বলেছিল,

—আবার বাইরের লোককে কেন ডেকে আনছ বাবা?

এটা তার মনের কথা কিনা ঠিক বুঝতে পারেনি ভাসানী। বাইরে থেকে প্রতিবাদ দেখিয়েছিল মাত্র। ওর কথায় হাসে নিতাই—না, মা। ও কোথায় আর খাবেক? দিবি চাট্টি দুবেলা।

—আমার বাপু এসব ঝামেলা ভালো লাগে না। ভাসানী সায় দেয়নি সহজে।

তবু মনের মাঝে এইটুকুই তার তৃপ্তির আভাস আনে। ব্রজের খাওয়ার সময় হাজির না হয়ে পারে না। ব্রজ প্রতিবাদ করে ওঠে।

—আবার তুমি বসে থাকবা কেন?

হাসে ভাসানী—মরণ। বসে খাওয়াবার জন্যে আমার কি মাথা ধরেছে? উনুনে মাখন চাপিয়েছি—যাব কুনখানে? গতিকে আটক পড়েছি।

অবশ্য রোজই প্রায় এই সময়েই উনুনে ঘি গলাতে বসে ভাসানী। ব্রজ খেয়ে উঠতেই বলে ওঠে ভাসানী,

—ঘি-এর কড়াইটা এট্টু দেখো কেনে, আমি দু'গাল খেয়ে লিই। দু'দণ্ড কি খাবার সময় আছে?

ব্রজই রয়ে গেল কড়াই-এর কাছে।

নির্জন ঘর। হু হু বাতাস দমকা আসে যায়। দাওয়াতে বসে ভাসানী বাসন মাজছে, তার হাতের ওঠা-নামার ফাঁকে ফাঁকে নিটোল অনাবৃত বাহুমূল দেখা যায়। চমকে ওঠে ব্রজ। ভাসানী ওর দিকে চেয়ে মাথা নামাল, ওর

সুন্দর মুখের হাসির ম্লান আভা। ব্রজই দিকে চেয়ে থাকে সে।

গিনিগলা রোদে স্তব্ধ চরভূমি কাঁপছে কি দুঃসহ জ্বালায়। ব্রজ চুপ করে বের হয়ে এল ঘর থেকে। হেঁকে ওঠে ভাসানী—কড়াইটা নামিয়ে যাও, বাহারের লোক তুমি যাহোক।

বড় কড়াইটা নামিয়ে দিয়ে বের হয়ে এল ব্রজ। কথা কইল না। উঠে পড়ছে ভাসানী বাসনেব গোছ নিয়ে, ব্রজের দিকে চেয়ে থাকে—নির্বাক নিস্পন্দ কি যেন আকুতিভরা চাউনিতে।

ভাসানী মাঝে মাঝে যেন কেমন গোলমাল করে দেয ব্রজের সমস্ত চিন্তাধারা। ঝড উঠেছে বালুচরে নদীর বুকে। বিকালের গুমোট আবহাওয়া থমথম করছে।

দুপাশের উঁচু খাডা চুনাপাথরের স্তরকে ফাটিয়ে রেললাইন চলেছে, পাহাডের মাথায় ঘন জঙ্গল। রাতের অন্ধকার থমথম করছে। উঁচু বনভূমি থেকে পাথর কেটে কেটে সিঁডিব মত নেমে গেছে। কালীপুব স্টেশন ছাডিযে গভীর বনভূমির ভিতর দিয়ে রাতের আঁধাবে চলেছে মালগাডীটা। কয়েকটি মিনিট!

আগে থেকেই হিসেব খবর নেওয়া থাকে, কোন্ গাডীতে কি আছে। বাজে পরিশ্রম কবতে বাজী নয় ওবা। মালগাডীর দরজাগুলো সাবলের ঘায়ে খুলে যায—বানবেব মত ক্ষিপ্র নিপুণ বেগে ওরা ঠেলে ফেলেছে গাঁট গাঁট কাপড, লোহা, চায়ের পেটি, সাবান, চিনি ইত্যাদি। চালানি মাল লাইনের দুধারে ছিটকে পডে ট্রেনের গতিবেগে। গার্ড সাহেব নিজের কামরায় হ্যারিকেন জ্বেলে ঢুলছে, নাহয দেখেও দেখে না এসব। কিছু বলাও বিপদ। সডকির ঘায়ে শেষ করে দুর্ভেদ্য মামডার জঙ্গলে গায়েব করে দেবে। ইতিপূর্বে এ অভিজ্ঞতা দু'চারজন গার্ড-ড্রাইভারের হয়েছে। চুপচাপ করে গেছে রেল কোম্পানী। ডিভিশনাল আপিসে অদৃশ্য হাতে মোটা ঘুষ গেছে। বখরাও দিযে আসছে অদৃশ্য দেবতাদিকে, তাই গার্ডরাও চেপে গেছে।

কযেকটি মিনিট। কয়েকখানা মালগাড়ী থেকে ছিটকে পড়া জিনিসপত্রও দেখতে দেখতে উধাও হয়ে যায়। বনের সীমানা ছাডিয়ে ট্রেন সমভূমিতে বের হবার আগেই তারাও মিলিয়ে যায়। আবার স্তব্ধতা নেমে আসে বনভূমিতে।

শাল মহুয়া বটগাছের ঘন প্রহরা ভেদ করে একটু ওরা এগিয়ে চলে।

—অ্যাই ভালো, নির্ঝঞ্ঝাট কাজ।

অভা ভোম সেই রাত্রের কথা ভুলতে পারে না। নীলে হাড়ীর কাতর আর্তনাদ আজও কানে ভাসে। বহু হত্যা করেছে সে, বহু রক্তপাত ঘটিয়েছে। গলায় বাঁশ

চেপে ডলে পিষে মেরেছে সাপগাঁয়ের মণি কামারকে, তেতলার ছাদ থেকে বীরপুরে একটা বৌকে ছিটকে ফেলে মেরেছিল—কিন্তু তারা তার মনে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। নীলের রক্তাক্ত মুণ্ডুটাকে চটের বস্তায় পুরে এনেছিল অভা ছয় মাইল পথ। মনে হয়েছে ফিস ফিস করে কি যেন বলেছে সে। আজও গা ছম ছম করে অভয়ের।

পরমা বলে ওঠে—মালগুলো কিছু সরিয়ে নি খুড়ো, সব কেন কন্দর্প আচাই-এর গব্বে হায়!

কথা বলে না অভা, অর্থাৎ মৌনং সম্মতিলক্ষণং। পরমা এদিক দিয়ে খুব হুঁশিয়ার। লুটের মাল সামাল দিতে—বিধি-ব্যবস্থা করতে তার জুড়ি নেই। কিসের শব্দ।

ট্রেন আসছে, এক্সপ্রেস ট্রেন এক ঝলক জোরালো আলো ফেলে।

কে জানে যদি পুলিস-টুলিস থাকে, নাহয় দেখেও ফেলতে পারে কেউ। চিৎকার করে ওঠে,

—ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়্।

সন্ধ্যানী আলো ফেলে কে যেন দেখছে চারিদিক। চাকাগুলো আর্তনাদ করে ওঠে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত; গর্জের মধ্যে বিকট শব্দ করছে ইঞ্জিন্‌টা—হঠাৎ থেমে গিয়ে যেন ক্ষেপে উঠেছে।

ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে ওরা এদিক-ওদিক ছিটিয়ে; কে জানে রেল পুলিস হয়তো টের পেয়েই আসছে এই গাড়ীতে। অভা ডোম কাঁপছে—ধরা পড়তে রাজী নয় সে।

ট্রেনটা হুইসিল দিয়ে আবার চলতে থাকে ধীরে ধীরে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। পরমা বলে ওঠে,

—বুড়ো ইস্টিশান মাস্টার ঘুমিয়ে গিইছিল খুড়ো, সিঙ্গেল দেয়নি।

—হবেও বা! ভাবছে অভা ডোম।

বুড়ো হলে মানুষ বোধ হয় সবদিক দিয়েই দুর্বল-অসহায় হয়ে ওঠে। একটা পাথর থেকে লাফ দিয়ে চারহাত দূরে নালার ওপারে পড়লো সহজেই। সে তো আজও ভর যোয়ান, বুড়ো হয়নি। বুড়ো হয়েছে একথাটা মানতে রাজী নয়।

সারা এলাকা জুড়ে একটা বিভীষিকার কালো ছায়া নেমেছে। টাকাকড়ি-অর্থসম্পদ থাকলেই বিপদ। রাতের অন্ধকারে ভেলকালিমাখা দানবের দল আঁধার ফাটিয়ে নেমে লুটপাট করে নিয়ে আবার উধাও হয়ে যাবে। কেউ বাধা

দিতে পারে না।

রূপা যাদের নেই তাদের ঘরে রূপবতী বৌ-ঝি থাকলে সন্তর্পণে আগলে রাখে তাকে। ছোঁ ছোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে চর-অনুচর। টুক করে গিয়ে সংবাদ দেবে। ভুলিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পাড়ায় ঘরে টাকালোভী কস্‌বি আছে। নতুন শাড়ী, এটা-সেটার লোভ দেখিয়ে বাগিয়ে বের করে নিয়ে যাবে।

—আনী হই থাকবি টে। যা কেন্নে।

কালীপুরের বনের ধাবে কাছারী বাগানে যে একবার গেছে সে আর ঘরে ফেরেনি। হয় বর্ধমান-বাঁকুড়ো—নাহয় কলকাতার বাজারে গেছে দেহফিরি করতে ; যারা তা পারেনি—তাদের গতি হয়েছে মামড়ার গভীর জঙ্গল সুঁদ। কেউ আর হদিস পায়নি।

এই নাটকের নায়ক কে তা অনেকই জানে কিন্তু বলবার উপায় নেই। প্রমাণ সাক্ষ্যও নেই, তাছাড়া প্রাণের মায়া বলে বস্তু আছে তো।

উচাটনানন্দ দেখেছে তার প্রভাব।

—লতাসাধনাব পথে এগিয়ে চল বাবা। ষড়শক্তির আধার পাবে তুমি। পূর্ণাভিষেক পাবার যোগ্য হবে।

আবছা লাল আলোয় ধিকিধিকি জ্বলছে আঙ্গারজ্বলা ধূপ। বিজাতীয় পরিবেশ—নেশাগ্রস্ত মন এক ভিন্ন-জগতের কল্পনায় মত্ত। শক্তি অর্জন করেছে সে। এটা বিভূতিকে সঙ্গোপনে রাখতে হবে।

রাজোঽবস্থাং সমানীয় তদ্ যোনৌ দ্বেষ্টদেবতাম
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং পূজয়েন্মনুম।

কারণবারিতে চোখদুটো লাল। সামনে অপরিচিতা কম্পমানা কোন নারী ; লাল চেলি পরে আসনে সমাসীনা।

—বড়বাবু! ফিস্ ফিস্ করে ওরা ডাকছে।

—কেন ?

—কাজ হাসিল। অভা সংবাদ দেয়।

হাসছে কন্দর্প। অষ্টসিদ্ধির অধিকারী সে—তন্ত্রসাধনা ব্যর্থ হয়নি। ঝাঁজালে মদে গলা জ্বলছে। জ্বলুক। পুড়ে ছাই হোক সবকিছু। মেয়েটা কাঁদছে—ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে।

সেদিন ভোর বেলায় ভুবনপুরের অনেকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চাপাকণ্ঠে রাতের আঁধারে ছুটোছুটি করে অনেকেই। কন্দর্প আচাই নিজে বের হয়ে এসেছে পথে। ভুবনবাবু ছাদে পায়চারী করেন—তাঁরও কানে আসে ওদের দৌড়াদৌড়ির

শব্দ। মানব নামতে যাবে, বাধা দিল,—দাদু, যেও না।

—কেন? মানব দাদুকেই প্রশ্ন করে।

—এসব নাই বা দেখলে? ভুবনবাবু আজ যেন সমস্তই প্রকাশ করে হালকা হতে চান।

মানব খানিকটা আভাস পায়, চুপ করে গেল সে।

ঝড়ের আগে কাক-চিল টের পায়; শূন্যে তারা পাক দিতে থাকে। মুকুন্দ সাঁপুইও তৈরী ছিল। কয়েকখানা গাড়ী বোঝাই মালপত্র লোকজনের প্রহরায় জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো।

ঝড় থেমে এসেছে। মুকুন্দ সাঁপুই হাত কচলাচ্ছে—আগে সংবাদ দিলেই হতো বড়বাবু, ইতো ছোট কাজ। আপনার বাপ-ঠাকুর্দার আশীর্বাদে এর চেয়ে জবর কাজ গুটিয়ে এসেছি। কন্দর্প আচাই কথা বলে না, ফুরসি টানছে নিবিষ্ট-মনে। কে যেন দৌড়ে এসে খবর দেয়।

—আইছেন আজ্ঞে।

অর্থাৎ দারোগাকে নিয়ে নিজে এস-পি এসেছে। একবার তদন্ত সেরে যেতে।

—ওরে চেয়ার-টেবিলগুলো ঝেড়ে-মুছে দে!

অভ্যর্থনার সব আয়োজনই করে রেখেছে কন্দর্প, থানার দারোগা আগে থেকেই 'সারপ্রাইজ' ভিজিটের সংবাদ দিয়েছ।

…অবাক হয়ে যান সুপার সাহেব। বিশাল ঠাকুরবাড়ী, নাটমণ্ডপ, দোলমঞ্চ; দেবতা ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি এদের। কন্দর্পবাবুর কপালে সিঁদুর-ফোঁটা ত্রিপণ্ডু—গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা। পরম ভক্ত সজ্জন। মানবকে ডেকে এনে পরিচয় করে দেয়।

আমার বড় ছেলে, এবার বি. এস্-সি. দিয়েছে।

বাঃ! সুপার সাহেব বেশ খুশিই হয়েছেন।

একথা সেকথার পর কন্দর্পবাবু নিজেই কথাটা পাড়লেন।

—দেখুন, একদিকে বিরাট নদী, অন্যদিকে গহন বনের মাঝে বাস করে আছি প্রাণ হাতে নিয়ে। চারদিকে যে অরাজকতা চলেছে।

সুপার সাহেবও বলে ওঠেন—সত্যিই। আপনারাও ডিফেন্সপার্টি ইত্যাদি করুন।

বলে চলেছে কন্দর্পবাবু—ওরা শুনেছি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। সব স্যার ওই রাণীগঞ্জ আসানসোল দিককার কয়লাখাদের 'হটাবাহার' মজুর। দুকানকাটা গুণ্ডা ওরা, নইলে রাতারাতি মালগাড়ী লুট হয়? কবে আমাদিকে শেষ করেন এইবার সেই ভয়েই আছি।

—কালীপুরে একটা আউটপোস্ট হবার কথা হচ্ছে।

—বেশ বেশ। হলে তবু ভরসা পাই আমরা।

কন্দর্পবাবু গলে পড়েন স্যায়ের কথায়। দারোগাবাবু চুপচাপ রয়েছেন; এসবক্ষেত্রে মুখ বুজে থাকাই নিরাপদ। এতদিন কাগজে-কলমেও তাই রয়েছেন।

পুলিস সুপারের গাড়ীতে জোর করে তুলে দিয়েছে কন্দর্প কয়েকটা বড় বড় মাছ, এক হাঁড়ি গাওয়া ঘি, কিছু গোবিন্দভোগ আতপ ইত্যাদি।

—এসব আবার কেন?

হাতজোড় করে বলে ওঠে কন্দর্পবাবু—গরীবের বাড়ীতে অনুগ্রহণ তো করলেন না···দয়া করে। ওগুলো সঙ্গেই থাক।

কালীপুরের ডাঙ্গার বুকে লালধুলো উড়িয়ে গাড়ীখানা উধাও হয়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন কন্দর্পবাবু, আর সারা গ্রাম। অভা ডোম, পরমা আরও দাগী দু'চারজন আগে থেকেই সটকে পড়েছিল বনে। তারাও কেঁদ গাছের টুগ থেকে পুলিস সাহেবকে বিদায় হতে দেখে বন ছেড়ে গাঁয়ে ফিরল। নিস্তব্ধ গ্রামখানায় আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার গতি ফিরে আসে। এতক্ষণ চুপ করে থেকে দমকা বাতাসের মত আছড়ে ওঠে নীলে হাড়ীর মা—ওরে আমার নীলমণি রে!

কন্দর্পবাবু উপরে উঠেই বাসন্তীর সামনে পড়েন। স্বামীর দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে বাসন্তী, কপালে রক্তচন্দনের ছাপ—গায়ে গরদের চাদর। গলায় সোনাবাঁধানো রুদ্রাক্ষমালা,—অদ্ভুত বিচিত্র বেশ। স্বামী আজ নিজেকে বাঁচাবার জন্য হীনভাবে ওই ভড়ং-এর বেশ নিয়েছে, ওই ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে রক্তলোভী শয়তান।

—কি দেখছো? এক চালেই বাজি মাৎ।

—লজ্জা করে না তোমার? বাসন্তী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—লজ্জা? হাসছে কন্দর্প—লজ্জা নারীর ভূষণ। ওটা তোমাদের ঘোমটার নীচেই চাপা থাক।

কথা বললো না বাসন্তী, চুপ করে বসে থাকে। কন্দর্পবাবুর রাগ ক্রমশঃ যেন ফেটে পড়ে—মালিয়াড়ার মুখুয্যেদের তেজ আমি ভাঙ্গবো।

—তারা তোমার কি করতে গেল? বাসন্তীও রেগে উঠেছে বাপের বাড়ীর নিন্দায়। কন্দর্পবাবু জবাব দেয়,

—তারাই পুলিস লেলাতে শুরু করেছে। সুঁদপুর মৌজা দখল পায়নি এই তাদের গায়ের জ্বালা।

কথা বললো না বাসন্তী, স্বামীর দিকে চাইতে তার মন যেন অজানা

ঘৃণায় রিরি করে ওঠে। নীলে হাড়ীর মায়ের কান্না আজও সারা আকাশ ভরে তোলে নীরব অভিশাপে, দূর দূরান্তে অমনি আরও কতো অভিশাপ তার বংশের উপর সঞ্চিত হয়েছে কে জানে। বাসন্তী স্বামীকে বলে ওঠে,—ওই সং-এর পোশাক ছেড়ে এসো। ওর একবর্ণও যদি সত্যি হতো—এসব অপকর্ম করতে না।

হাসছে কন্দর্প—ওর একবর্ণও মিথ্যা হলে আজ তোমাকে এই তিনমহল ছেড়ে কালীপুরে ছোট একখানা বাড়ীতে থাকতে হতো বাসন্তী, ঝি-চাকরও থাকতো না।

—না থাকুক, আমার সেইই ছিল ভালো। লাখগুণে ভালো।

বাসন্তীর দুচোখে ফুটে ওঠে কি যেন কাতর মিনতি। ওদিকে নজর দেবার সময় নেই কন্দর্পের, হাসছে সে নিষ্ঠুর পৈশাচিক বিজয়ী হাসি।

—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

পোশাক ছাড়তে বের হয়ে গেল কন্দর্প।

কালীপুর বাজার বলতে একটা রাস্তার দুপাশে কিছু মনোহারী, মুদিখানার দোকান—ধান চালের আড়ত, কাপড়ের দোকান আর দু-একটা পুরোনো সিঙ্গার মেশিন নিয়ে মানিক দর্জীর আস্তানা। সপ্তাহে দুদিন এই রাস্তাতেই বসে নদীর ধার থেকে আসা চাষীদের তরিতরকারির হাট। স্টেশন থেকে ওই লাল কাঁকুরে খোয়া ঢাকা রাস্তাটা চলে গেছে মাইল দুয়েক দূরে খাটপুকুরের কাছে; ঘন শালবনের মধ্যে গিয়ে মিশেছে রাস্তাটা শাহীশড়কে। দিনের বেলায় দু'চারজন লোক মিলে ওই রাস্তায় যায়—বৈকালের পর থেকেই গতায়াত বন্ধ। বাঘের উৎপাত তো আছেই - আর আছে ঠ্যাঙ্গাড়ের ভয়। মারধোর দিয়ে সব কেড়ে নেবে। এমন কি প্রাণটুকুও।

কালীপুর বাজারের কয়েকঘর বাসিন্দা-দোকানদারও অদৃশ্য ওই দানবদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ওই সম্প্রদায়ের দু'চারজনকে তাই তোয়াজ-করবার চেষ্টা করে।

মুকুন্দ সাঁপুই-এর দোকান দিন দিন বেড়ে চলেছে। তেরাস্তার মোড় থেকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দোকান—আড়তঘর, সামনের খোলা জায়গাতে দূর দূরান্তর থেকে আমদানী হয় ধান, চাল, গুড়, আলু ইত্যাদি। ছোট্ট দোকান কোন অদৃশ্যপথে বেড়ে উঠেছে কয়েক বছরেই। নতুন দোতালা তুলছে মুকুন্দ; সামনের দালানে পদ্মের উপর দুটো উড়ন্ত পরী মালা হাতে ঝুলছে, লোকে বলে মুকুন্দকেই ও মালা পরাবার চেষ্টা করছে তারা।

কারবারী পাইকাররা দূর থেকে আসে—ধান-চালের বদলে মুদিখানার

বস্তাবন্দী মালপত্র, কাপড়, লোহার নাটবল্টু, সিক ইত্যাদি কিনে নিয়ে যায়। চাষীপ্রধান অঞ্চল—লাঙলের ফাল, গাড়ীর হাল ইত্যাদিও চলে ভালো। মুকুন্দের এখন রমরম পসার। ওপাশে মালিয়াড়ার সুখদেব মুখুয্যের ডাক্তারখানা। কন্দর্পবাবুর শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে আত্মীয়। সদ্য এম. বি. পাস করে এসে বসেছে। কালীপুরের অর্ধেক তাদের বাকী অর্ধেক আচাইদের। তাই নিয়েই এখনও গোলমাল চলেছে।

কালীপুর বাজারেও কথাটা গোপনে গোপনে সুখদেবের ওখানে আলোচনা হয়। কয়েকজন ব্যবসায়ী—বিশেষ করে মুকুন্দ, রাতারাতি বড়লোক হয় কি করে? ওদিকে রাতবিরেতে বনের মধ্যে এখনও মালগাড়ী লুট হচ্ছে—পুলিস তারও কিনারা করতে পারেনি। তদন্ত চলেছে।

সুখদেব ডাক্তার বলে ওঠে—ওসব কথা পুলিস ভাবুককে দত্তমশাই।

দত্তমশাই কাঁসাপিতলের কারবার করেন—দোকান বাড়লো না, বরং ব্যবসা গুটিয়ে আসছে। ওদিকে মুকুন্দের কারবার দেখে হিংসাই করে।

—তাই বলে ওকথা বলতে পারে না ডাক্তার? যে ডাকাতদলের হামলা শুরু হয়েছে কোন্ রাতে কালীপুর বাজারই লুট করে না বসে তারা! লোকের মনে সুপ্ত আতঙ্ক জেগে উঠেছে।

সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই। কালীপুর বাজারে নেমে আসছে স্তব্ধতার মাঝে আতঙ্কের ছায়া। রাস্তা অবধি চালা নামিয়ে একটা চায়ের দোকানদার কাঁচা কয়লার আঁচে চা করছে—দু-চারজন খদ্দের বসে আছে। কালীপুর বাজারে ওই একটু আভিজাত্যের ছোঁয়া। ছোটবাবুকে আসতে দেখে অভ্যর্থনা জানায় পুটু।

—আসুন ছোটবাবু, একটু চা সেবা করবেন না!

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছে মানব, চায়ের তেষ্টাও পেয়েছে।

—দাও তাই।

পুটু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চায়ের জল চ্যাপালো। কাপ-ডিশ গরম জলে ধুতে থাকে সে।

ওদিকে বসে দু-একজন খদ্দের পরস্পর কি আলোচনা করছিল। কান পাততেই বেশ বুঝতে পারে মানব—ওই লুটতরাজের কথাই। রাতের অন্ধকারে নদীর বালিতে করে ধানের গাড়ী লুট হয়ে গেছে। বাধা দিতে গিয়ে হাত ভেঙ্গেছে একজনের ডাকাতের লাঠির ঘায়ে। কে ব'লে চলেছে।

হবেক নাই! বড় গাছে খুঁটি বাঁধা বেটাদের! টিকিটি ধরতে পারবা নাই।

কে যেন উৎসাহী বক্তাকে ইশারা করে—থাম, থাম বাপু।

মানব অনুমান করতে পারে কাকে দেখে এই সাবধানী মনোভাব ওদের।

সবাই হঠাৎ চুপ করে যায় মানবকে দেখে। তাকে তারা বিশ্বাস করতে পারে না—ভাবে মানবও সেই ডাকাত দলের আপনজন। নিজেকে এত অপমানিত কোথাও বোধ করেনি মানব।

পুটু জবাব দেয়—সব দেশেই অমন কাণ্ড হয়ে থাকে, তোরা অসাবধানে যাবি কেন? কথায় বলে সতর্কের বিনাশ নাই।

মানব চায়ে চুমুক দিচ্ছে অন্যমনে। অনুভব করে সারা অঞ্চলের লোকের মনে নীরব ঝড় বয়ে চলেছে। ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

কোন রকমে চা-টা গিলে বের হয়ে এল।

পড়ন্ত বেলায় স্টেশন কোয়ার্টারের পাশে এসে দাঁড়াল সে। একটা ইঁদারা থেকে কুলি কামিনরা জল তুলছে। পাশেই একটা ফুলভরা করবীগাছ। দু-একজন প্যাসেঞ্জার বৈকালের ট্রেন ধরতে আসছে। দিনের মধ্যে শেষ বারের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

প্রায়ই আসে এই সময় মানব। কদিনের মধ্যেই মাধুরীকে যেন আরও নিবিড় করে চিনেছে। সমস্ত ক্ষণটুকু এই স্বপ্ন নিয়েই কাটে। সর্বদাই খেতে আসতে কানে আসে ইঙ্গিত ভরা কথা। কন্দর্প আচাই-এর পরোক্ষ গুণগান। এখানে মানব নিজের পরিচয়েই দাঁড়িয়েছে—তাই হয়তো এত ভালো লাগে এই ঠাঁই। নিজেকে মুক্ত করে তুলে ধরতে পারে।

বাড়ীতে পা দিয়েই অবাক হয়ে যায় মানব। অন্যদিন এই সময় মাধুরীর স্নান সারা হয়ে যায়—কাপড়-চোপড় বদলে সে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয়।

কালীপুরের মত জায়গায় তরুণ-তরুণীর একত্র সমাবেশ—বেড়াতে যাওয়া একটু আলোচনার বিষয়। কিন্তু ওরা দুইজনেই তা কানে তোলেনি। মাধুরী পড়াশোনা করে শহরে—মনের সেটুকু স্বাভাবিকতা আছে। এখানের সমাজে ও মেলামেশা করে না—অবশ্য সমাজজীবনের অস্তিত্ব কালীপুরে কিছু নেই। সেদিক থেকে বাধা হয়নি তাদের মেলামেশার।

—তৈরী হন নি?

মাধুরী একাই বসে আছে দাওয়ায়, ওকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল।

—আপনি! আসুন। নিস্পৃহ কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়।

—কি ব্যাপার বলুন তো? সারা বাড়ীতে একটা নিষ্প্রাণ স্তব্ধতা। মুখবুজে রয়েছে সবকিছু। মানবের মুখের দিকে চেয়ে মাধুরী বলে ওঠে,

—আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছেন? চমকে ওঠে মানব। তারই কঠিন শাস্তির বিধান কেউ যেন পড়ে চলেছে তার সামনে। মাধুরী ওর দিকে চেয়ে আছে।

—হ্যাঁ, ওয়াগন লুটের্ ব্যাপারে বাবাকেও রেলবিভাগ সন্দেহ করেছে। তাই রিভার্ট করে সরিয়ে দিচ্ছে এখান থেকে।

—ওয়াগন লুটের ব্যাপারে ওঁকেও সন্দেহ করছে? আশ্চর্য!

—সত্য হোক মিথ্যা হোক তাঁর স্টেশনের ওপারের বনেই ঘটছে ব্যাপারটা। বাইরের কাউকে ধরতে না পারলে, ভিতরেই কাউকে শাস্তি দিতে হবে।

—তাই, নির্দোষের সাজা হবে? মানবের কণ্ঠে রুদ্ধ প্রতিবাদ।

—এছাড়া পথ কি? মাধুরী শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়।

কি যেন ভাবছে মানব। আজ মনে হয় দাদুর কথাই সত্য মায়ের নিষ্ফল প্রতিবাদ বারবার ব্যর্থ হয়েছে। রাত্রি দুপুরে অভা ডোম আর তার দলবলের নৈশ অভিযানের কথা স্মরণে আসে। মুকুন্দ সাঁপুই-এর বিড়ালের মত সন্তর্পণী দৃষ্টি, শয়তানী চালচলন, তাদের রাত্রিবেলায় জঙ্গলে যাতায়াতের কথা মনে পড়ে। ওদের এসব নীরব প্রস্তুতি কিসের তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে মানব। শুধু রেল কোম্পানীর সর্বনাশ করেনি—নীলে হাড়ীর বৌএর কান্না, আরও কতশতের অশ্রু-জল নিত্যই ঝরছে - মাধুরীও সেই অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। মাধুরী বলে চলেছে।

—বাবার মাইনে কমে গেলে এইবার আমাকেও চাকরি খুঁজতে হবে। নয়তো কোন দোজবরের ঘরে গিয়ে সতীনকাঁটায় ভুগতে হবে সেই হাঁড়ি-কড়াই সম্বল করে।

মাধুরীর মানবের কাছে কোন লজ্জার জড়তা নেই। কোন গোপন মনের পরিচিতিতে আপনতর হয়ে উঠেছে সে আজ।

—পড়া ছেড়ে দেবেন?

—উপায় কি? মাধুরী আগামী নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে।

এরপর কোন কথাই জমলো না।

রাতের অন্ধকার নেমে আসছে প্রান্তরে; স্তব্ধতার বন্যা নেমেছে বনে বনে। পলাশের রং মিলিয়ে গেছে দিগন্তে—কালীপুর বাজারে দু-একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে। স্টেশনের পাট চুকে গেছে, লোকজন নেই, দু-একটা নেড়ি কুকুর ল্যাজে মাথায় এক হয়ে শুয়ে আছে। কালীপুরের জীবনমাল্য থেকে খসে গেল একটি দিন—দূর আকাশ থেকে ঝরে পড়লো একটি কক্ষচ্যুত নীহারিকা—বুকে তার তীব্রতর জ্বালাময় হাহাকার।

মানব ফিরছে বাড়ীর দিকে নিঃসঙ্গ, একাকী। রাতের আঁধারে সব ডুবে গেছে। পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল একটা শিয়াল—আঁধারে নীল চোখ ধক-ধক করে জ্বলছে শ্বাপদ লালসায়। আর মানবের মনে প্রতিবাদের জ্বালা।

ঝড় থেমেছে। মাঝে মাঝে আকাশ কালো করে ঝড় আসে—নদীতে ওঠে তুফান, সেই সময়েই হাল ধরে থাকতে পারলে আবার তীর মেলে— আবার পায় মৃত্তিকার সন্ধান।

কন্দর্প আচাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে আজ পাশার ছকে। পাশে গড়গড়া নামানো, মুকুন্দ সাঁপুইও হাজিরা দিয়েছে, আরও দু-একজন আছে। বেশ জমে উঠেছে আড্ডা। হঠাৎ মানবকে এসময়ে ঢুকতে দেখে একটু বিরক্ত হয়ে মুখ তুলে চাইল কন্দর্প। একটু শক্ত সুরেই মানব জানায়।

—একটা কথা ছিল।

—তোমার আবার কি কথা আছে?

মুকুন্দ সাঁপুই আজ বৈকালে দেখেছে ওকে কালীপুর বাজারে ঘুরতে – তারপর কোথায় গেছে তাও জানে। মুকুন্দ সাঁপুই ওসব খবর রাখে। কন্দর্প চুপ করে মানবের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ সেই বলে ওঠে—মাস্টারবাবুর কথা বলছিলেন ছোটবাবু? ও বুড়ো এক নম্বরের ঘুষখোর—ওর নানান কীর্তি।

—আপনি চুপ করুন। মানবের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে মুকুন্দ?

মানব এগিয়ে এসে বাবাকেই শোনায়,—বেচারা রিভার্ট হয়ে গেছে বিনা দোষে। কে কোথায় ওয়াগন লুট করবে আর শাস্তি হবে তার!

হাসে কন্দর্প আচাই—ওর যোগসাজস না থাকলে এসব হয় কি করে? গার্ড, স্টেশনমাস্টার, ড্রাইভার—সবাই এসব জানে।

—অথচ বলবার উপায় নেই। বললেই—যারা ওয়াগন লুট করে তারা কোন্‌দিন তার বাড়ীই লুট করে জ্বালিয়ে দেবে।

—তা হতেও পারে। নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব দেয় কন্দর্প ছেলের কথায়।

—অথচ সারা দেশের লোক জানে কারা এসব করে। আমিও জেনেছি; মানব বলে ওঠে। নিজের চোখে দেখেছে সে কালীপুরের সাধারণ লোকও তাকে অবিশ্বাস করে, ঘৃণা করে।

কন্দর্পবাবু চমকে ওঠে। বাপ ও ছেলের মাঝখানে একটা পুঞ্জীভূত ঝড় সঞ্চিত হয়ে উঠেছে—যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। কন্দর্পবাবু কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো। মুখের কুঞ্চনরেখা মিলিয়ে যায়—সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সারামুখ। হাসছে, হাসছে সে মিটিমিটি।

—বেশতো, খবরটা পুলিসকেই দাও। আমাদের গ্রামের ওপাশেই এসব ঘটছে, আমাদেরও দায়িত্ব একটা আছে।

কন্দর্প হঠাৎ কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠে।

মানব রাগে অপমানে নিষ্ফল ব্যর্থতায় গুমরে ওঠে। বাপের উপর সমস্ত শ্রদ্ধা তার লোপ পেয়ে গেছে। কি যে বলবে ঠাওর করতে পারে না সে।

তালগোল পাকিয়ে যায় সব। নীরব বের হয়ে এল ঘর থেকে। কানে আসে মুকুন্দর হাসির শব্দ। খিক্ খিক্ করে বনশিয়ালের মত হাসছে। বলে ওঠে গলার স্বর নামিয়ে।

—বুঝলেন তো ব্যাপারটা বড়বাবু, এসব বয়সের দোষ আর কি! বুড়ো মাস্টারের মেয়েকে দেখেছেন? সেই যে শহরের কলেজে পড়তে যায় নটা বারোর ট্রেনে?

—মানে? কন্দর্পবাবুর চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

—মানে ছোটবাবুর সঙ্গে একটু চেনাজানা আছে কিনা—তাই সংবাদটায় একটু চটে উঠেছেন আর কি! হাজার হোক বয়সটা যে খারাপ গো।

মুকুন্দর কথায় কন্দর্পবাবুর মনের মেঘ খানিকটা কেটে যায়, —ও তাই বল! নইলে হঠাৎ এসব কথাই বা বলবে কেন? ঠিক ধরেছো তুমি।

হাসছে মুকুন্দ—তা আপনাদের কাছাকাছি আর এটুকু বিদ্যেবুদ্ধির কি অভাব হবে? তা হুজুর—ছেলেপুলের মন কিনা, একটু বেশী জড়িয়ে গেছে। বড়লোকের ছেলের এসব স্বভাব থাকে—ধর তক্তা মার প্যারেক। তাই নিয়ে মায়াদয়া কষ্ট এইসবগুলা—আজ্ঞে ছেলেমানুষ।

মানব দালানে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনে অবধি রি রি করতে থাকে নিষ্ফল রাগে। ভিতরে চলে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ মায়ের ডাকে ফিরে দাঁড়ালো।

—হ্যাঁরে কি বলছিলি তোর বাবাকে?

খবরটা ইতিমধ্যে বাড়ীতেও এসে পৌঁচেছে। একটু বিস্মিত হয়ে জবাব দেয় মানব—এমন কিছুই না।

উপরে চলে গেল নিজের ঘরে। এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায়না সে। তার দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করেই বাবা হয়তো কড়া কিছু জবাব দেবেন। আপাততঃ মনের রাগ মনেই চেপে রইল মানব।

বার বার চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না মানব—মাধুরীর কথাগুলো: সব আশা আমার নিঃশেষ হয়ে গেলো।

একা কী মাধুরীর মনেরই সেই হাহাকার। মানবের সারা মনও গুমরে ওঠে অসহ্য বেদনায়। তার মনের প্রথম মুকুলও ঝরে গেল নিষ্ফল ক্রন্দনে। মাধুরী সেই সংবাদ কোনদিনই পাবে না। বালিচরের বুকে রাত্রির বাতাস শত নূপুর নিক্কণে বেজে চলেছে—দেবাঙ্গনার নৃত্যচঞ্চল সেই গতিবেগ। আঁধারের আসরে দেহাতীত আত্মার ব্যর্থ মিনতি।

—কি ভাবছিস বল দিকি ?

মা কখন ঘরে ঢুকে তার কাছে এগিয়ে এসেছে টের পায়নি মানব। ওর হাতের ছোঁয়ায় চমক ভাঙ্গে।

—এমনিই বসে আছি মা।

মাকে এই কৈফিয়ৎ দিয়ে এড়ান যায় না। স্বামীকে সেও চিনেছে। কোন স্বাধীন মনোভাবের লোক তাকে বরদাস্ত করতে পারবে না; ভুবন আচাই পারেননি—বাসন্তী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেনি কিন্তু মনে মনে সে জ্বলছে। মানব প্রশ্ন করে,—এতদিন কি করে এই অত্যাচার সয়েছো মা ?

কথার জবাব দিল না বাসন্তী, ছেলের মাথায় হাত বোলাতে থাকে। অসহায় সে, স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কববার সাহস তার নেই।

—কি করবো বল ? কতবার সাবধান করেছি—এপথ ছাড়ো। কিন্তু না শুনলে কি করি ?

মা ছেলে দুজনেই যেন এক ঝড়েই মুষড়ে পড়েছে। মানব বলে ওঠে,—আমি যদি কোনদিন রোজগার করি, সেদিন প্রথম কাজ হবে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া।

বাসন্তী এ কথার কোন জবাব দিল না।

মাধুরীর মনের কোণে মধুর একটু ছোঁয়া লাগছে—সেকথা নিজেও অস্বীকার করে না আজ। বিস্তীর্ণ এই দিগন্তসীমার অসীমে হারিয়ে যাওয়া মন একটু নির্ভর খুঁজেছিল মানবকে কেন্দ্র করে। কালীপুরে এসে অবধি এমন কাউকে আগে সে দেখেনি। ওই প্রথম এবং প্রধান পুরুষ হয়ে উঠেছিল তার কাছে। কিন্তু সেই স্বপ্নবিলাস তার দূর হয়ে গেছে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধবয়সে বাবার উপর এই মিথ্যা অপবাদে সেও মুষড়ে পড়েছে।

—পঁচিশ বছর চাকরি করেছি মা, রেল কোম্পানীর আমল থেকে। এত বড় অপবাদ কেউ দেয়নি।

বৃদ্ধ রোহিণীবাবু মেয়েকে যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।

এই ক'দিনেই বাবাকে আরও বুড়ো দেখাচ্ছে, হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন বাবা। সবদিক থেকে অপমানিত বঞ্চিত হয়েছেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর চাকরির হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর।

প্রতিদিনের মত আজও মানব লাইন পার হয়ে এগিয়ে আসছে। পড়ন্ত রোদে সমান্তরাল লাইনগুলো দূর দিগন্ত অবধি গিয়ে যেন ধোঁয়ার অস্বচ্ছ

আবরণে হারিয়ে গেছে। কুয়োতলার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কুয়ো হতে উদ্বৃত্ত জল পেয়ে গাছগুলো উষর মাটিতেও ফুলে পাতায় সতেজ হয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়তে থাকে মানব। এখনি মাধুরী বের হয়ে আসবে—সদ্যঘুমজড়িত দুচোখে চেয়ে থাকবে তার দিকে—কাঁধের কাছে ভেঙ্গে পড়েছে একরাশ কালো চুল।

—কে ?

দরজাটা খুলে গেছে। কিন্তু একি ! অপরিচিত কর্কশ একটি মুখ। ফাটা কাঁসরের মত খন্‌খনে আওয়াজ তুলে প্রশ্ন করে—কাকে চাই ?

অবাক হয়ে যায় মানব। সমস্ত চিন্তাধারা তার গুলিয়ে আসে। মাধুরীর বাবার নামটাও ঠিক জানেনি। হেডমাস্টার-ডাক্তার-স্টেশান মাস্টার-পোস্ট-মাস্টার—এসবের নামটার কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই, পদবী দিয়েই চলে।

—মাস্টারবাবুকে খুঁজছি।

তৎক্ষণাৎ জবাব আসে—তিনি তো ডিউটিতে।

—মানে মাধুরী। মানব কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ভাঁজপড়া কুৎসিত মুখখানায় একটা বিকৃত হাসির চিহ্ন খেলে যায়—ও ! আগেকার মাস্টারবাবুর মেয়েকে খুঁজছো—তা তেনারা তো চলে গেছেন।

—চলে গেছে ? মানব যেন বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা।

বুড়ী বলে চলেছে—হ্যাঁ। যেতে কি আর চায়, বিশেষে ওই মেয়েটা। তা গেল অনেক ছরাদের পর। একখানা মেয়ে যা হোক বাব্বা ! হ্যাস্।

পায়ে পায়ে সরে এল মানব সেখান থেকে। দরজার ফাঁক দিয়ে আরও কয়েকজোড়া কৌতুহলী চোখ চেয়ে রয়েছে তার দিকে। কি যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করেছে তারা।

প্রান্তরে সন্ধ্যা নেমেছে। নিঃস্ব কান্নাভরা সন্ধ্যা। পিছনে কালীপুরের স্টেশনে একটা বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। দামোদরের কূলে কূলে মিষ্টি সুরেলা শব্দ তুলে জলধারা এগিয়ে চলেছে। টগরবৌ কলসী নিয়ে এসে দাঁড়াল।

অমনি দুকূল ছাপানো রূপ নিয়ে শূন্য বুকেই রয়ে গেল সে কাঁখের কলসীর মত। নীলে হাড়ীকে সে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। চোর ডাকাত ঠ্যাঙ্গাড়ে স্বামীর সঙ্গে ঘর করাও মুশ্‌কিল। ওদের জেলে এক পা, অন্য পা ঘরে। ঘরবাসী হতে ওদের মানা। গেছে—তার জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ হয় নিজের জন্যই।

আড়ালে কাঁদে, শোকের কান্না এ নয়। নিজের ব্যর্থতায় গুমরে ওঠে সারা মন। আরক্ত সন্ধ্যার আঁধারে ডুব দিয়ে বনসীমা থেকে বের হয়ে

আসছে নদীর জলধারা ; কোন রূপবতী কন্যা যেন গহন বনের আড়ালে প্রসাধন সেরে নাগরের কাছে এগিয়ে চলেছে লাস্যময়ীরূপে।

জল ভরে এগিয়ে আসছে নির্জন ডাঙ্গা পার হয়ে।

মানব ফিরছে উদ্‌ভ্রান্তের মত। মাধুরী নেই, চলে গেছে। বোধ হয় আর কোনদিনই দেখা হবে না। অকস্মাৎ এই আঘাত বিচলিত করে দিয়েছে তাকে। অভিমান করেই হয়তো তাকে সংবাদটুকুও দিয়ে যায়নি। তার বাবার এই সর্বনাশের কারণ কে তা হয়তো জেনে গেছে সে, তাই ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করে গেছে, নিঃশেষ করে গেছে তার সঙ্গে সমস্ত প্রীতির সম্পর্ক—সে আজ পরিত্যক্ত।

বেদনার রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে শালপিয়ালের বন, রাঙ্গামাটিও নির্জনে কাঁদে দিনকে শেষ বিদায় দিতে। জীবনের মাল্য হতে খসে গেল একটি স্মৃতিরঙ্গীন দিন। ভুবনপুর-কালীপুরের অসীম বিস্তৃতির শূন্যতা আজ নীরব বেদনায় তার অন্তর ভরিয়ে দিয়েছে।

—উঃ!

মানব আনমনে পথ চলছিল, পাথুরে উঁচু-নীচু ডাঙ্গায় ছুরির ফলার মত দাঁত বের করে আছে পাথর ; তাতেই টক্কর খেয়ে পায়ের আঙ্গুলটা রক্তারক্তি হয়ে গেছে ; বালি লেগে অসহ্য যন্ত্রণা করছে। হাঁটতে পারে না।

—বড্ড লেগেছে ছুটবাবু?

চড়াই-এর নীচেই আমবাগানে কাকে জল নিয়ে আসতে দেখেছিল, কাদের বৌ হবে বোধ হয়। হঠাৎ তাকেই এগিয়ে আসতে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয় মানব। সামলাবার চেষ্টা করে,—না, না, এমন কিছু নয়।

—মাগো, আঙ্গুলটা যে ছেতরে গেছে, রক্তগঙ্গা বইছে।

কোন কথা বলবার আগেই সে কঠিন মাটিতে বসে ওর আঙ্গুলে হাত ঘষে, কলসী থেকে খানিকটা জল দিয়ে ঘাটা ধুয়ে দিয়ে বলে ওঠে টগরবৌ,

—পোড়া ডাঙ্গাতে ঘাসও হয় না যে একটু চিবিয়ে ঘা-মুখে দোব, তা রুমাল-টুমাল আছে গো?

মানব পকেট থেকে রুমালটা বের করে দিল। কাদের বৌ ঠিক চিনতে পারে না, কপালে—সিঁথিতে সিঁদুরও নেই। সন্ধ্যার মুখোমুখি নির্জন বাগানে এত সহজভাবে তাকে এইটুকু সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে দেখে বিস্মিত হয়েছে মানব।

—থাক, থাক। এতেই হবে।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। বলে ওঠে—একটু হুঁশ করে পথ চলতে হয়,

যে কাঁকুর ডাঙ্গা—বেসামাল হলেই বিপদ।

আর দাঁড়াল না সে, জলভরা কলসীটা তুলে নিয়ে চলে গেল; ওর ছন্দবদ্ধ গতির দিকে চেয়ে থাকে মানব। সুঠাম বলিষ্ঠ গড়ন—মাজা মাজা রং; ওর পায়ের ছন্দে মাটির কলসীতে জল সুর তুলেছে—যেন বর্ষার আনন্দ-উছল নদী, চল্‌কে উঠছে নিজের আনন্দেই। পশ্চিম আকাশে সূর্যের বিদায়পথে তারার সলজ্জ চাউনি ফুটে উঠেছে।

একটি মুহূর্ত! মানব যেন স্বপ্ন দেখছে নির্জন প্রান্তরে হঠাৎ মনে পড়ে মাধুরীর কথা।··তার হাসিমাখা মুখখানা জেগে ওঠে ব্যাকুল বেদনার রঙে রঙীন হয়ে।

নীলে হাড়ীর মায়ের এককালে কালীপুর-ভুবনপুরের মধ্যে নামডাক ছিল, এখানের ডোম-হাড়ী-বাগ্দী কুলে এ রীতির চালচলন আছে। এটা তাদের কুলকর্মেরই অন্তর্গত। জাতব্যবসা ছাড়া পুরুষরা মদ চোলাই করে গোপনে গোপনে। বাবুদের মহালে চোরা ভাটি বসে কত, মদের অন্যান্য আনুষঙ্গিক হিসাবে ডোম-বাগ্দী বৌ-ঝিরা এগিয়ে যায়।

এ তাদের কুলকর্ম। সুতরাং নীলে হাড়ির না আজ টগরকে দূর থেকে দেখে খুশিই হয়েছে। তবু মতিগতি ফিরেছে মেয়েটার, যা হোক এপথে তবু দু পয়সা জুটবে, খেতে পরতে পাবে তারা।

হঠাৎ পরমাকে আসতে দেখে বুড়ী খেঁকিয়ে ওঠে—ভর সাঁঝবেলায় তুই আবার কি করতে এলি? তুর জ্বালায় কি ঘরে বাইরেও টিকতে পারব না রে?

হাসে পরমা। টগরবৌ-এর খোঁজ করতে থাকে এদিক ওদিক। বুড়ীর চোখ এড়ায় না। মনে মনে হাসে বুড়ী।

আজ গরুপাল থেকে বাছুর নিয়ে ফেরবার পথে বাগানের মধ্যে স্বচক্ষে যে ঘটনা দেখে এসেছে তার কিছুটা যদি সত্য হয় তবে তার খাবার-পরবার ভাবনা আর থাকবে না। মনটা খুশিতে ভরে ওঠে; এতদিনে টগরবৌ-এর সুবুদ্ধি হয়েছে যা হোক; ভালো ছেলেকে ধরেছে। ধরবার মত রূপ যৌবন সবই আছে টগরের; পাঁচখানা গাঁয়ে আঁকুড়ে হাড়ীর ঘরে ওই রূপ দেখা যায় না, বৌ-গরবে বুড়ীর বুক ভরে ওঠে। আহা আগুনজ্বালা রূপ! সোমত্ত যৌবন!

—যাদিকি বাপু।

বুড়ী পরমাকে তাড়াতে চায়। পরমা দাওয়াতে কয়েকটা এঁচোড় নামিয়ে দিয়ে বলে—রইল গো খুড়ি।

—এঁচোড়! বুড়ীর মন ভরে না। ও তো খরচ বাড়াবার কল।

তেল-নুন-মসলা কতকি চাই। এর চেয়ে সের কতক চাল হলেও বা পদে ছিল।

পরমার রোজগার ক'দিন কমে গেছে। লোকজন চতুর হয়ে উঠেছে। একা-দোকা পথ হাঁটেনা অসময়ে। তাছাড়া পুলিসেরও তাড়া খেয়ে সাবধান হতে হয়েছে চাপে পড়ে।

—তাই দুব খুঁড়, দেখকেন্নে।

পরমা বের হয়ে এল উঠোন থেকে, কে জানে টগর কোথায়! মনটা কি এক অসহ্য জ্বালায় জ্বলে উঠেছে।

একটু পরেই ফিরেছে টগর।

দাওয়াতে জলের কলসীটা নামিয়ে ঘরের ভিতর এগিয়ে গেল টগর, ভিজে কাপড় গায়ে সেঁটে বসেছে—পায়ে পায়ে বাধা দেয়।

আবছা অন্ধকারে বুড়ী এগিয়ে আসে সাঁ করে। ফিস্‌ফিসে গলায় বলে,

--দেখি কত টাকা পেলি।

চমকে ওঠে টগর—টাকা! টাকা কোথায় পাবো!

দাঁতপড়া লালচে মাড়ি বের করে বলে ওঠে বুড়ী,

—আহা! ন্যাকা পেয়েছিস আমাকে, না? বাগানে কোন লাগরের বুকে মাথা রেখে এত পিরীত করছিলি? ম্যাগ না সোহাগ খেছিলি তু?

টগরের চোখের সামনে দুনিয়া যেন ঘুরপাক খাচ্ছে, বুড়ীর দিকে চেয়ে থাকে, দু'চোখে তার পুঞ্জীভূত ঘৃণা। বুড়ী জিব দিয়ে গরল ছিটিয়ে চলেছে।

—একা-একাই খাবি সব? তুই যাস ডালে ডালে তো আমি যাই পাতায় পাতায়। কদ্দিন চলছে এই লাটক—হ্যাঁলা?

মাথায় রক্ত চড়ে ওঠে টগরের। বৈকালের ঘটনাটা সবই দেখেছে বুড়ী, কিন্তু তার মনে ওসব কোন চিন্তা ছিল না, নেইও। সমস্ত ব্যাপারটাই বুড়ী তার পাপমন আর নজর দিয়েছে। এই নিয়ে এইবার শোক উথলে উঠবে, চিৎকার করে বৌএর কেলেঙ্কারী ব্যাখানা করতে বসবে কে জানে বুড়ী ছোটবাবুকে চিনতে পেরেছে কিনা? লজ্জায় মাথা নুইয়ে আসে তার। মনের সমস্ত উষ্ণতা ফুটে উঠে ওর কণ্ঠে।

—সব মিথ্যে কথা। এই নিয়ে যদি কোনদিন কোন কথা তুলেছো, নদীর জলে ডুবে আত্মঘাতী হবো। বুঝলে?

বুড়ী ওর দিকে চেয়ে থাকে; কি যেন ভাবছে সে। বৌকে ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। বুড়ো বয়সের ভরসা, আজ না হোক—পরেও দেবে কিছু।

আপাততঃ আর কচকচি বাড়াতে চায় না সে। সবে হয়তো প্রথম জালপাতা, সোরগোল করলে জাল কেটে শিকার পালাবে।

ভেবেচিন্তেই চুপ করে গেল সে। রাগে দুঃখে টগরের দু'চোখে জল নেমে আসে। এতবড় অভিযোগ এত হীনভাবে করতে পারবে ওই বুড়ী এত সহজে তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

মালিয়াড়ার মুখুয্যেদের পরিচয় এ অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। ভুবনপুরের আচাইদের পালটি ঘর। ভুবন আচাই স্থানীয় সমৃদ্ধিশালী ঘরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতেই উপযাচক হয়ে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন ওই ঘরে; কিন্তু বাসন্তীই বৌ হয়ে এসেছে মাত্র; কন্দর্প আচাই চিরকালই ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখে। প্রীতির সম্পর্ক সে রাখেনি।

কালীপুরের নীচের চড়াই-এর সমতলে মালিয়াড়া গ্রাম, নদীর ধারেই। মুখুয্যেদের বাড়ীর সকলেই প্রায় উচ্চশিক্ষিত; ডাক্তার, উকিল, বিভিন্ন বিভাগে পদস্থ কর্মচারী তাঁরা, দু'একজন অধ্যাপকও আছেন ওবাড়ীতে। এটা যে বাসন্তীরও একটা গুরুতর অপরাধ। তাই কন্দর্পবাবু বাসন্তীকে বলে,

—চাকুরের গুষ্ঠী তোমাদের। সিংহ হাজার হলেও পশু। দশ টাকার চাকর আর পাঁচশো টাকার চাকরে তফাৎ কি? আমার বংশে কেউ চাকরি করুক চাইনা আমি। যা আছে তাই দেখেশুনে থাক—সুখে থাকবে।

বাসন্তী একথারও কোন উত্তর দেয়নি।

তার বড়ভাইও মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, বসন্তবাবু বোনের কথা সবই জানেন। কিন্তু ভগ্নীপতির রূঢ় স্বভাবের ভয়েই প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস করেন নি। আজও বলেননি। কন্দর্পকে কেমন যেন এড়িয়েই চলেন।

মাঝে মাঝে দেশে আসেন তাঁরা, কয়েকজন দেশের বাড়ীতে প্রচুর জমি-জায়গা ট্রাকটর দিয়ে চাষ-আবাদ করাচ্ছেন। সবদিক থেকেই পরিবারটি গ্রামের উন্নতি করেছে এবং নিবারণ মুখুয্যে এদিক থেকে করিতকর্মা। বারএর ভালো উকিল এবং এদিকেও সুনাম আছে।

মানবকে বেশী পড়াতে কন্দর্প আচাই রাজী হয়নি। বাসন্তী আর ভুবনবাবুই জেদ করেন। এই একটি ক্ষেত্রেই বাসন্তী কঠিন হয়ে উঠেছিল। —আমার একটি মাত্র ছেলে, তোমার পড়াবার ক্ষমতা না থাকে, দাদাকে বলি। ওর পথে বাধা হয়ো না।

মালিয়াড়ার মুখুয্যেদের সাহায্য নেবে কন্দর্প আচাই! লজ্জায় যেন মাথা হেঁট হয়ে আসে।

—বাসন্তী! কন্দর্পবাবু জ্বলে উঠেছে। বাসন্তীও এর জন্য তৈরী। কন্দর্প বলে ওঠে—তোমার দাদাদের কেনবার মত সামর্থ্য আমার আছে। দরকার হয় আমার ছেলেকে আমিই পড়াবো। টাকার জন্য আটকাবে না।

ছেলেবেলায় প্রথম মামার বাড়ী এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল মানব। মামারা সকলেই কৃতী। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিলেত ফেরত ডাক্তার, কেউ অধ্যাপক। এ এক অন্য পরিবেশ। কলকাতার বুকে মস্ত বাড়ী গাড়ী সবকিছু। এলাহি ব্যাপার। সুইচ টিপলে আলো জ্বলে। ঝকঝকে ঘর—টেবিল-চেয়ারে সাজান। আলমারি ভর্তি কত বই। অবাক হয়ে গ্রাম্য ছেলেটি দু'চোখ মেলে চেয়ে থাকে। তাদের বাড়ীর কাছারি-ঘরের মত লাল খেরো বাঁধানো জাবেদা-রোকড়ের স্তূপ নেই, তক্তপোশে চাদর পেতে ফরাস ফুরাস ফুরসিও রাখা নেই। গুদোম-ঘরে লাঠি-সড়কি, ঝকঝকে দা-রামদা, মশালও খুঁজে পায় না। অভা-পরমার মত কালো কুচকুচে ঝাকড়া চুলের লোকও কেউ নেই। সেজ বাতির আলোয় ঘর আবছা হয়ে ওঠে না সন্ধ্যাবেলাতেই। জানালা খুললে দিগন্ত জোড়া নদী—ঢালু শালবন—লালডাঙ্গা—কিছুই নেই। মাকে মনে পড়ে—কান্না আসে। কে যেন তাকে সেই ছায়াঘেরা স্তব্ধ জগৎ থেকে দূর করে দিয়েছে এই ইটকাঠের গড়া নির্দয় রাজ্যে। অচেনা সব মানুষ আর চারিদিকে শুধু বাড়ী আর বাড়ী।

মামাতো ভাইবোনেরা তাকে দেখে দূর থেকে। ওদের পোসাক-আষাকও ধোপদুরস্ত—ফিটফাট। খেয়ে দেয়ে যে যার স্কুলে কলেজে চলে যায়। সেদিন সিঁড়ির কোণে ওকে বসে থাকতে দেখে প্রমথ বলে ওঠে,

—তুই কাঁদছিস নাকি রে?

কান্না! এতক্ষণ সামলে ছিল, হঠাৎ চোখ দিয়ে জল বের হয়ে আসে। কয়েকজন ছেলে হাততালি দিতে থাকে—দুয়ো। কাঁদলি কেন!

—ওমা, মানব কাঁদছে। এতবড় ছেলে!

নতুন স্কুলে গিয়েছিল, সেখানের পরিবেশ দেখে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

—সর দেখি·· কাঁদছো কেন তুমি?

মানব দু'হাতে চোখ ঢেকে ছিল। কার ডাক শুনে চোখ খুললো—জলভরা ডাগর দুটো চোখ। দেখছে তাকে। দু'চোখে একটা কাতর চাহনি, ছোট্ট ছেলেটি যেন হারিয়ে গেছে।

—চল তুমি আমার ঘরে।

হাত ধরে নিয়ে গেল তাকে মেয়েটি উপরের ঘরে।

—বস। উঁহু, মেঝেতে কেন? বিছানায় বস।

সন্তর্পণে বসল মানব। চারিদিকে চাইতে থাকে। এ ঘরখানা একটু আলাদাভাবেই সাজান। টেবিল-চেয়ারে ঠাসা নয়। বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে ধূপের সৌরভ মিশেছে। কয়েকখানা ছবি টাঙ্গান—চেনা মুখ। বিবেকানন্দ -রবীন্দ্রনাথ—দেশবন্ধু আরও কাদের ছবি। মানব মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে; দুধে আলতায় গোলা রং—গায়ের শিরাগুলো নীল হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। তেমনি স্বাস্থ্য। একখানা গরদের শাড়ীতে চমৎকার মানিয়েছে তাকে। কালো চুল একরাশি পিঠের উপর খোলা গলায় চিকচিক করছে হারটা।

এগিয়ে এসে ও মানবের কাছে বসে।

—এতবড় ছেলে কাঁদে! মায়ের জন্য মন কেমন করছে?

জবাব দিল না মানব। মাথা নামাল।

প্রথম সেই স্মৃতিটুকু আজও ভোলেনি মানব। ও বাড়ীর অপরিচিত পরিবেশের মাঝে টুনুবৌদি একটি আপনকরা সবুজ দ্বীপের সন্ধান। ও না থাকলে মানব থাকতে পারতো কিনা জানে না। আমূল পরিবর্তন এনেছিল টুনুবৌদি তার জীবনযাত্রায়—চিন্তাধারায়।

রাস্তায় গাড়ী রেখে ওকে নিয়ে বেড়াতে যায় ইডেন গার্ডেনে—কোনদিন বা জু গঙ্গার ধার দিয়ে। কলেজ থেকে ফিরলে জলখাবার ব্যবস্থা করে—টুনুবৌদি। বাড়ীর মধ্যে টুনুবৌদিই একরকম সর্বেসর্বা। প্রমথ, অনিমেষ, মায়া আরও অনেকেই যেন একটু হিংসা করে।

—তোর কপাল ভাল মানব। টুনুমাসির কাছে হাত পাতলেই হল। দে না কিছু পাইয়ে—ভাল একটা সার্কাস এসেছে।

কেউ বলে—টুনুপিসীর বডিগার্ড।

হাসে মানব। তাই নোতুন পরিবেশও সহ্য হয়ে এসেছে। এখানের জীবনে যেন খাপ খাইয়ে নিয়েছে মানব।

—এমনিভাবে কলেজে যাও?

টুনুবৌদির কথায় একটু অবাক হয় মানব—কেন? বেশ তো।

—ভালছেলে হলে কি কোনদিকে নজর দিতে হবে না—পড়া ছাড়া? চুলগুলো কাকের বাসা করেছ, এই জামা পরে? সেকেলে ছাঁট—তেমনি রং ছিটের। কাপড় পরে কোন্‌দিন পায়ে আটকে ট্রাম থেকে পড়বে।

টুনুবৌদির ফরমাশে আসে তার জন্য নতুন জামা প্যান্ট জুতো।

—এসব কেন বৌদি! টাকা আমার রয়েছে—বললেই পারতে।

—থাক। তোমার বাবার মেলা টাকা তা জানি। বাবা চিনেছেন টাকা

আর টাকা—ছেলেও তাই।

সন্ধ্যাবেলায় পড়ার ঘরে হৈ চৈ চলেছে। মাস্টারমশায়, ওঘরে দিদিমণি চলে গেছে পড়িয়ে। ছেলেমেয়েরা ভূত নামিয়েছে। মানব পড়তে যাবে—প্রমথ বই বন্ধ করে দেয়।

—ছাখ ক্যারিকেচার করছি।

হাসি হুল্লোড় কলরব চলেছে। উপর থেকে দিদিমা চিৎকার করেন, বড়মাসী হাঁক পাড়ে—ওরে ও প্রমথ, অ্যাই অনিমেষ—মায়া—হচ্ছে কি?

কে কার কথা শোনে, ছেলেরা পিটে গান গাইছে অনিমেষ, মায়া খিলখিল করে হাসছে প্রমথের ক্যারিকেচারে। হঠাৎ দরজার কাছে টুনুবৌদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সব এক মিনিটেই থেমে গেল।

—কি হচ্ছিল তোমাদের? এই মায়া—

কারোও মুখে রা' নেই। টুনুবৌদি কঠিন স্বরে বলে চলেছে।

—তোমার সামনে সপ্তাহে পরীক্ষা মানব, এই তুমি পড়ছো?

মানব মাথা নীচু করে।

ব্যক্তিত্ব একটা হয়তো কোথায় টুনুবৌদির ওই অপরূপ লাবণ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বাড়ীতে সবাই ওইটুকুর জন্যই বোধ হয় ওকে মেনে নিয়েছে। বয়স কিইবা এমন। মানবের থেকে কিছু বড়, কিন্তু পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে ওর মনের; লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু বড়মামী বলে,—অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরন্তী না পায় ঘর।

সুনুদা বিলেত যাবার আগে বিয়ে করে, বিলেতে ডাক্তারি পাস করে আসবার সময় এক মেমসাহেবকেও এনেছে। মস্ত ডাক্তার—কিন্তু তারপর থেকে স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেনি টুনুবৌদি।

কি যেন দুর্জ্ঞেয় রহস্যাবৃত ওই নারী; ওর ঝলসে দেওয়া রূপ বুদ্ধির মাঝে কেমন ব্যর্থতার করুণ ছায়া ওকে ঘিরে আছে।

—সুনুদা ভুল করেছে বৌদি। তুমি শুধরে নিতে পারতে।

মানবের কথা শুনে ফিরে চাইল বৌদি। নীরব তীব্র সে চাহনি। মানব থেমে গেল। একটি নিমিষের চাহনিতে মানবকে যেন ঝুলিয়ে দিল টুনুবৌদি—সে ভুল করেনি। এটা তার ব্যক্তিগত আদর্শ এবং এ নিয়ে কথা না বলাই ভালো।

পাস করেছে মানব—অনার্স নিয়ে। টুনুবৌদি কাছে টেনে নেয়।

—আরও বড় হবে মানব। ইঞ্জিনিয়ার হবে তুমি। মস্ত ইঞ্জিনিয়ার।

হাতে তুলে দেয় দামী শেফার্স স্টেট্‌স্‌ম্যান কলম—নাও।

—বাবা যদি রাজী না হন আর পড়াতে ?

—হবেন। এখানে ভর্তির ব্যবস্থাও করেছি। তোমার মাকে মামাবাবু চিঠি দিয়েছেন। সব ব্যবস্থাও হয়ে গেছে, তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে।

টুনুবৌদির দাদা শিবপুর কলেজের অধ্যাপক। টুনু নিজেই নিয়ে যায় তাকে দাদার কাছে এবং তার দাদাও মানবকে দেখে খুশি হয়েছেন।

গাড়ীতে ফিরছে দুজনে। গঙ্গার বুকে শেষ সূর্যের লাল আভা পড়েছে তারই স্পর্শ টুনুবৌদির গালে মুখে। [illegible] ওর দিকে চেয়ে আছে। মানব কথাটা বলবার চেষ্টা করেছিল অ[illegible] [illegible]গে থেকেই, আজ বলে।

—সেদিন রাগ করেছিলে আমার কথায়, সুনুদার সম্বন্ধে যা বলেছিলাম ?

মুখ তুলে চাইল টুনুবৌদি, কালো চোখে কি গভীর চাহনি। সিল্কের শাড়ীখানায় মৃদু শব্দ ওঠে. বাতাসে উড়ছে চুলগুলো।

—না। তোমার দিকে থেকে হয়তো ঠিকই বলেছো। আমার আদর্শের সঙ্গে মেলেনি বলেই কি রাগ করতে হবে ? বহু পথ—বহু মত—বহু লোক। তাই বলে সংঘাত হতে হবে এমন কোন মানে নেই।

—তাই কি আমাকে ডাক্তারি পড়তে দিলে না ?

টুনুবৌদি বলে ওঠে।

—ডাক্তার মানুষের প্রাণ বাঁচায়, ইঞ্জিনিয়ার জাতির সম্পদ গড়ে তোলে। একটা মানুষের প্রাণের চেয়ে সারা জাতির স্বার্থের দাম অনেক বেশী।

বৌদি চুপ করে বসে আছে। গাড়ীখানা শহরের কোলাহলে মুখর পথ ধরে দখিনের দিকে চলেছে। টুনুবৌদি কি ভাবছে গভীরভাবে। মাঝে মাঝে ওই হাসিখুশি মেয়েটি—কোথায় চিন্তার গহনে সুদূরে হারিয়ে যায়। মুখে চোখে কোন দূর আকাশের ছায়া। ওকে চেনা যায় না।

—বৌদি !

—ও। হ্যাঁ কি বলছো ?

—মাঝে মাঝে এত কি ভাবো বল দিকি ? কি যেন দুঃখ—

হাসে টুনুবৌদি, সারা মুখের মালিন্যকে সেই মধুর হাসি দিয়ে রাঙ্গিয়ে তুলে বলে ওঠে—বড্ড বাজে কথা বলতে শুরু করেছো মানব। বেশ বুঝেছি তুমি ডুবে ডুবে জল খেতে শিখেছো। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না বুঝলে ?

—যাও। মানব লজ্জায় পড়ে যায়।

হাসছে টুনুবৌদি—দু'গালে টোল পড়েছে।

মালিয়াড়ার ছ'-আনির তরফের নিবারণ মুখুয্যে বর্ধমান বারের একজন নামকরা উকিল—বাসন্তীর বড ভাই। ভগ্নীপতির সঙ্গে তার লোক-লৌকিকতা সবকিছু কোর্টের বারান্দাতেই। আপ্যায়ণ করে নিবারণ,

—শ্বশুরবাডীর দিকে হাঁটবে না কোনোকালে কন্দর্প ?

বয়সে ছোটই, কন্দর্প বলে ওঠে—দেখাশোনা, খোঁজখবব তো পাচ্ছিই এখানে। উজিয়ে আবার বাডী যাবার দরকার কি ?

দুজনে কোর্টের বটতলার ছাযাঘন পরিবেশে একটা দোকানে বসে চা খাচ্ছে। দুটি নীরব বিরুদ্ধ মত কিন্তু উপবে মিষ্টি প্রলেপটা ঠিক বজায় রেখে চলেছে।

—তা হলে কালীপুর মৌজা অমনিই থাকবে ? কন্দর্প কথাটা পাডে।

—থাকুক। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেন নিবারণবাবু।

—তাহলে জবব দখল কবতেই বলছো অর্থাৎ ফৌজদারী ? কন্দর্প সম্বন্ধীকে হুঁশিয়ার করে দিতে চায়।

নিবারণবাবুও ভাঙ্গবে তবু মচকাবেন না—দেখনা চেষ্টা করে, তিন নম্বব তো হচ্ছে শ্বশুরবাডীর সঙ্গে, পারো তবে গণ্ডা পুরিযে দাও।

চটে উঠেছে কন্দর্প—তোমরা অতি ইতর হে।

—নাও, এখনতো খেয়ে নাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ঝগডাটা আপাততঃ মুলতুবী রইল। কন্দর্পেব মনের আগুন মনেই জ্বলতে থাকে ধিকি-ধিকি, এর জবাব সে দেবেই। মুখুয্যেদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবে সে। নিবারণবাবু রসগোল্লা খেতে খেতে বলেন।

—রসগোল্লাটা ভালো করেছে, ওরে বদন আরও কয়েকটা করে দিয়ে যা। নাও হে কন্দর্প ?

এ সময় দুজনের সৌদার্দ্য দেখবার মত, পর মুমূর্তেই এজলাসে গিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে।

এ যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার দাড়িয়েছে।

বর্ষার ঢল নেমেছে দামোদরে। প্রথম বর্ষার ঘোর কেটে গেছে, তাম্রাভ শুকনো প্রান্তর শালবন বৃষ্টির জলের আর্দ্র হয়ে উঠেছে—এইবার শুরু হয়েছে ঢল নামা। এক পশলা জোর বৃষ্টির পর নামছে গৈরিক মৃত্তিকা ধোয়া জলের প্লাবন—মাটির জীবনীশক্তিকে ধুয়ে মুছে ঠেলে আনছে নদীতে। ছোট ছোট খাদ খন্দ ছাপিয়ে সশব্দে জলের স্রোত নেমেছে—স্রোতের বেগে ভেসে আসে মরা খরগোস—শিয়াল বাচ্চা—নাহয় এঁকে বেঁকে সাঁতার কাটবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে

একটা কেলে সাপ ভেসে যায়। খানিকটা গিয়ে মরে ভেসে উঠবে। এ স্রোতের সঙ্গে যুঝতে পারবে না।

দামোদর মেতে উঠেছে। দুই জেলার মধ্যে যেটুকুও হাঁটা পথে যোগাযোগ ছিল তাও প্রায় মুছে গেছে। ভুবনপুর এখন নিস্তব্ধ, সভ্যতার শেষ সীমায় নুইয়ে পড়া প্রায়ান্ধকার বাগানের কোলে ভিজে স্যাঁতসেঁতে একটি ক্ষুদ্র সুপ্তিময় জনপদ। তার পরই উঁচু বাঁধের নীচে দিগন্তপ্রসারী জলরেখা; স্রোতের আবর্তে ফেঁপে ফুলে উঠেছে সংহার মূর্তিতে।

কুটো পড়লে দুটো হয়ে যায়। মাঝে মাঝে প্রবল আলোড়ন জাগিয়ে ধেয়ে আসে ঘূর্ণায়মান জলরাশি—খলখল করে কোন রুদ্রভৈরব হাসছে। পাহাড়ের শিখর থেকে ধ্বংসবেশী শ্মশানভৈরব বের হয়ে এসেছে লোকালয়ে, মুখে তার অট্টহাসি—মাঝে মাঝে বম্ বম্ বাজে গালবাদ্য, হাতের চিমটে ত্রিশূলের ঝনৎকার ধ্বনিত হয় থেকে থেকে। রুদ্র দামোদর।

নিতাই ঘোষের চরে সন্ত্রাস জেগেছে!

মরদযোয়ান সকলেই দিনরাত সজাগ হয়ে রয়েছে। হিজলগাছের গুঁড়িতে দু'খানা নৌকা বাঁধা, দরকার হলে চর ছেড়ে ওতেই উঠবে, গরু-মোষগুলোকে জলে নামিয়ে দেবে—তারা সাঁতারে পারমুখো হবেই। বর্ষার জলে চরের বুকে জমেছে সবুজ লকলকে হাঁটুভোর ঘাস। গ্রীষ্মের তীব্র তাতে শুকিয়ে উঠেছিল গরু-মোষ, বর্ষার জলে আবার নধর চিকন হয়েছে। এ সময় দেশ গাঁয়ে খড়ের অভাব— সেই অভাব এখানে নেই।

ব্রজ চরের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় সাবধানী দৃষ্টি মেলে। চারিপাশে তার খরস্রোতা দামোদর শত জিব মেলে এগিয়ে এসেছে, ধারাল জিব দিয়ে চাটছে নরম মাটিকে, মাঝে মাঝে জিবের সাপ্‌টায় খানিকটা মাটি ধসে পড়ছে তার গহ্বরে।

—ঝপ—ঝপাং।

কোথায় চর ভাঙ্গছে।

—নদী যেন ঢুকে না পড়ে বেজ! নিতাই ঘোষও তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে নিজেই তদারক করতে বের হয়েছে।

ব্রজ জবাব দেয়—না, সেদিকে নজর রেখেছি।

—হ্যাঁ, একবার একফালি সরু জল ঢুকতে পারলেই চরকে ফাটিয়ে চৌফাল করে দেবে একরাতেই। সেবার অগুলের কাছে মানাবন গায়েব করে দিয়েছিল।

...আকাশের দিকে চেয়ে দেখে; ধূসর পাংশু আকাশসীমা। উবুড় হয়ে

পড়েছে—চরের উপরই। অঝোরে ঝরছে ওর বুক থেকে বৃষ্টিধারা।

সোঁ সোঁ ছাড়ছে হাওয়া—কলকল খলখল শব্দমুখর বাতাস। নদীর গর্জনে সব ঢেকে গেছে। মানুষের কণ্ঠস্বর এখানে অবাঞ্ছিত, নদীর রাজত্ব, তারই মত্ত প্রতাপ সবচেয়ে বেশী। সবাই যেন এই আতঙ্কময় পরিবেশে কেমন স্তব্ধ হয়েছে।

—খা! খা তোরা।

চালায় বাঁধা সারি সারি গরু-বাছুর-মোষও যেন টের পেয়েছে কি এক আগামী [illegible]য়র। [illegible]-ছানি-মাখা [illegible]না [illegible] নেই তাদের। কালো [illegible] চোখ মেলে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। বাতাসে কিসের যেন ঘ্রাণ [illegible] -হাম্বা!··

বাছুরটাকে আরও কাছে ডেকে নিয়ে শূন্যপানে চেয়ে থাকে, ডাগর চোখের চাহনিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে না-বলা আতঙ্ক।

নিতাই বলে ওঠে—লক্ষণ ভালো দেখছিনা ব্রজ।

গোবরা বলে ওঠে তুমি নিশ্চিন্দি ঘরে ঘুমোও গা দিকিন। ইশালো নদীতো লয় পাথরবাটিটি। ইকে ডরিয়ে থাকবা নাকি।

—নারে! দ্যাবতা। দামোদর সাক্ষাৎ মহাদেব—বুঝলি। হাত তুলে নমস্কার করে বুড়ো।

এ অঞ্চলের দেবতাই। নিদারুণ বিশুষ্ক গ্রীষ্মেও যোগায় ক্ষীরধারা, পানীয়। দুইতীরে ওর সোনা ফসলের সমারোহ—সবুজের স্বপ্নলাগা দেশ। বর্ষায় ওর বুক থেকে ধারানি এগিয়ে যায়, ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের চাষা বুকে যোগায় অমৃত সঞ্চয়।

বর্ধমান-বাঁকুড়ার সীমান্তের গ্রামে গ্রামে বহু গৃহস্থের নিত্যপূজার আসন পেয়েছে ওই নদী—শালগ্রাম শিলার বিষ্ণুমূর্তিরূপে। দুই হাত তুলে নিতাই প্রণাম করে।

—অপরাধ নিও না বাবা দামোদর চন্দ।

এ বৃষ্টির শেষ নেই। ভাসানী দাওয়ায় বসে আছে, উঠানে পা দেবার উপায় নেই। পিছল হলদে পলিমাটি—বালি তার অনেক নীচে। পলিমাটি কাদায় ভরে উঠেছে। দাওয়ার খুঁটি বেয়ে উঠেছে লাল ঢাঁই পিঁপড়ে। চরের কোন গর্তে বাসা বেঁধেছিল তারা—বানের জল পেয়ে বের হয়ে এসেছে মানুষের আশ্রয়ে!

—সব ডুবে যাবে নাকি? ভিজতে ভিজতে আসছে ব্রজ।

এগিয়ে যায় ভাসানী—ইস্ ভিজে যে ডাব হয়ে গেছো। ছেড়ে ফেলো—

হাসে ব্রজ—নুনের পুতুল লই বুঝলা। একটু বর্ষায় জল লাগলে গলে যাবো না। ব্যাঙের শরীর—জল সওয়া আছে।

—থাক। দু'চোখে হাসির আভা ফোটে ভাসানীর।

—একটু চা করছি, বাবা বেরুল কোথায় ?

—সবাই এখন একপায়ে খাড়া, বুঝলে। দামোদর ক্ষেপেছে। এই বানটা পার করতে না পারলে নিশ্চিন্তি নাই। বালি পড়ে পড়ে নদীর খাত বুজে উঠেছে, তিন হাত জল হলেই বিপদ। উপছে ওঠে।

…ভাসানী ওর দিকে চেয়ে থাকে, আতঙ্ক ফুটে ওঠে তার চোখে।

—জেনে-শুনেও বাবা এইখানেই থাকবে ?

—কোন ভয় নাই। আশ্বাস দেয় ব্রজ।

তবু ভাসানীর মন মানে না—যদি রাত দুপুরে বান ছাপিয়ে ওঠে ?

কথাটা ওর মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় ব্রজ—বাঁধে বাঁধে লোক আছে। সেরকম গতিক দেখলে তার ব্যবস্থাও করা যাবে।

—মানে ?

—সব কথা মেয়েদিকে বলতে নাই।

…এটা আত্মরক্ষার গোপন তত্ত্ব। নদীর দু'কূল ছাপানো জলরাশি আগে থেকেই অন্যপথে বের করে দিতে পারলে বন্যায় ভয় থাকবে না ভাটির নীচে—উপরে গিয়ে কোন সাঁধ কেটে দেওয়ার ব্যবস্থাও করে রেখেছে তারা।

ভাসানী কথা বলে না, ব্রজের মুখ-চোখের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন কঠোরতা ফুটে উঠেছে ওই বৃষ্টিভেজা সুন্দর মুখখানাতে।

—চা হয়ে গেছে।

…একটা গেলাসে করে খানিকটা গরম দুধে চাপাতা ফেলে একটু গুড় মিশিয়ে একটা পানীয় তৈরি করে দেয়। ভিজে কনকনে ঠাণ্ডায় লাগে মন্দ নয়।

লাল পিঁপড়েগুলো বাঁশের খুঁটি বেয়ে চলেছে।

ভাসানী বলে ওঠে—ডাওরি এখনও থাকবেক দু'একদিন লাগছে।

ব্রজ কথা বলে না, কি ভাবছে। বৃষ্টিভরা দিগন্তে নদীর এই বিপর্যয়ের মাঝে তার মনেও ঝড় উঠেছে। ভাসানী চেয়ে রয়েছে তার দিকে। হাতখানা এসে পড়েচে তার হাতে, গালে পড়ে ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস। বাইরের দুর্যোগ তার মনের সব আগল যেন ভেঙ্গে দিয়েছে—ব্রজ !

ভাসানীর দু'চোখে কি নেশা !

ব্রজ যেন ভয় পেয়ে গেছে ! হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে সেই বর্ষার মাঝেই নেমে গেল উঠানে—চলে যেতে যায়, পালাতে চায় সে ভাসানীর সামনে থেকে।

আকাশ বাতাসে সোঁ সোঁ ঝড়ের মাতন লেগেছে। ক্ষেপে ফুলে উঠেছে

নদী। তেমনি আকুল মাতন লেগেছে ভাসানীর মনের গহনে। এমনি ব্রজ ওর সেই আবেগভরা চাউনিকে কেমন এড়িয়ে চলতে চায়।

সামলে নিল নিজেকে ভাসানী। ছিঃ! কি এক নিদারুণ দুর্বলতা মাঝে মাঝে তাকে পেয়ে বসে! ব্রজকে চাইবার কোন অধিকার তার নেই। ভাসানী তার চেয়ে অনেক উঁচুতে। সে এক স্মৃতিকণ্টক জ্বালা।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে—ভুবনপুরের নীচেই কাঁঠালতলার ঘাটে একটা কাঁচা তাল-পাতার ছাউনির মধ্যে বসে আছে কয়েকজন যাত্রী—ছোট ছেলে-মেয়েও রয়েছে বৌঝিদের সঙ্গে। ভুবনপুরের আকাশ ঢাকা কালো মেঘে, নির্জন প্রান্তরে বৃষ্টির ধারাপাত চলেছে।

নৌকা ছইএ বসে অভা ডোম তামাক টানছে, স্রোতে খুঁটিতে বাঁধা নৌকাটা নাচছে টলছে। তামাক-পোড়া ধোঁয়ার গন্ধে ভরে উঠেছে বাতাস; পরমা, বসন, পাতু উবু হয়ে বসে হাতের তেলোয় কলকে রেখে তাই টানছে ফুক ফুক করে। মাঝে মাঝে চকচকে জলের দিকে চেয়ে থাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে।

ফেনার স্তূপ ভেসে চলেছে স্রোতের টানে, দু'একটা কাক একটা ভাসমান বিকৃত মৃতদেহের উপরে ঠোট লাগাবার চেষ্টা করে বসছে—আবার চক্কর দিচ্ছে ওটার পাশে। স্রোতের বেগে ঠিক ভারসাম্য থাকছে না।

-- খেয়া হবেক নাহ? কোন যাত্রী ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদী; হড়পা বান নেমেছে। ওর নীচে বালিচর স্রোতের টানে এদিক ওদিক হয়ে গেছে। যেখানে ছিল বুকজল সেখানে হয়তো দশবিশ হাত খাদ হয়ে ঘূর্ণিপাক শুরু হয়েছে—সেই পাকে নৌকা পড়লেই সর্বনাশ। বেসামাল করে তলিয়ে দেবে; যেখানে খাদ ছিল সেখানে জমে উঠেছে চোরা বালিয়াড়ি; স্রোতের প্রবল টানে নৌকা গিয়ে ধাক্কা মারবে সজোরে—এমন অবস্থায় তলা ফেঁসে যাবার সমূহ ভয়।

---প্রথম বানের পর পাকা মাঝি অনেক সাবধানে নৌকা ছাড়ে। ভরা তুফানে নৌকা ছাড়তে ভয় পায়।

--খেয়া হবেক নাই বাপু আজ। অভা জবাব দেয়।

—হবে না? উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সবাই—তিনদিন নদীর ধারে সবছাড়া হয়ে বসে থাকবো?

—কি করি বলেন; সবই বাবা দামোদরের ইচ্ছে।

স্রোতের টানে বাঁধা নৌকাটা দুলছে। ওপারের তীরভূমির সমস্ত সবুজ স্বপ্ন বৃষ্টিধারার অস্বচ্ছ আবরণে ঢেকে গেছে।

বর্ধমান আর বাঁকুড়ার এপ্রান্ত সভ্যজগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে নিজেদিকে। ওপবে জমাট অন্ধকার—ভিন দেশ।

—ইস্টিশানেই ফিরে চল গো।

যাত্রীবা আবার নদীর তীর থেকে আশ্রযের সন্ধানে স্টেশনের দিকে হাঁটা দেয়, বৈকালের আঁধাব নেমে আসছে মেঘভরা আকাশে আকাশে। শালবনসীমা স্তব্ধ হয়ে গেছে। এ কোন এক রূপকথার গহিন বনরাজ্য, মানুষ এর বিস্তৃত অসীমে একান্ত একাকী - অসহায। নদীব ধারা থেকে যাত্রীরা পালিয়ে এসে কালীপুর স্টেশনের ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছে – বৃষ্টিঝবা বাত, দলবেঁধে জেগে থাকবে তারা। ছেলেগুলোও কান্না ভুলেছে নিবিড আতঙ্কে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। নিবাপদে কাজ সারা হবে কল্পনাই করেনি। বাজে মাল তারা নেয়নি—কুণ্ডু স্বর্ণকারেব বাড়ীতে হানা দিযে বের করে এনেছে বন্ধকী সোনা-রূপার গহনা। যাত্রা শুভ হয়েছে তাদের।

টিপটিপ বৃষ্টির মাঝে এগিযে এসে নদীব জলে নামালো, ঠাণ্ডা হিম জলস্রোত—দু'ক্রোশ উজিযে গিযে নেমেছে—ভাসতে ভাসতে তবেই তাদের এলাকার এসে পৌঁছবে।

—ঘেঁউ – ঘেঁউ উ!

—আশেপাশেই যেন কোথাও কুকুর ডেকে ওঠে।

—কাকা! চাপাস্বরে হেঁকে ওঠে পাতু।

—শালারা পিছু লিয়েছে পালা।

আবছা অন্ধকারে কাদের পাযের শব্দ শোনা যায়। কুকুরটা ডেকে ওঠে হঠাৎ নদীর জলের কাছাকাছি এসে। শুনতে পায় ··

—ধর ব্যাটাদিকে। ওরা তাড়া করে আসে।

বিদ্যুদ্‌বেগে পরমার লাঠি আসমানে চাপা গর্জন তুলে কার মাথায় আঘাত করে উঠল। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে কে যেন একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই দু'চারজন আরও ছুটে আসে।

জলের তোড়ে লাফ দিয়ে পড়ে তারা! তীরবেগে ভেসে চলেছে স্রোতের টানে—তীরে দাঁড়িয়ে ওরা টর্চ ফেলে খোঁজবার চেষ্টা করছে—গৈরিক জল খল খল করে হাসছে অট্টহাসিতে, ভৈরবের অনুচরদল দামোদরের বিশাল গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে।

পরমা নির্ভয়ে বলে ওঠে—শালারা বড় বেড়েছিল। আয় ইবার!

বৃষ্টি নেমেছে আবার। জলের বুকে হাজারো ধারায় বাজছে কোন আকাশ-জোড়া দিগঙ্গনার নূপুরনিক্কণ।

—ছপ—ছপ! অবলীলাক্রমে ভেসে চলেছে তারা স্রোতের বেগে, মাঝে মাঝে একটু তীরমুখো ঠেলা মারে।

অন্ধকারে মারমুখী দামোদর পাড়ি দিয়ে ফিরছে তারা।

টগর সেই বৈকালের ক্ষণিক স্মৃতিটুকু মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। কি যেন স্বপ্নের মত তাকে পেয়ে বসেছে! নির্জন বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা একটি মুহূর্ত! ছোটবাবুর ডাগর চোখের চাহনিতে কি এক অব্যক্ত বেদনা ঝরে পড়ে।

কোন কথাই তার মনে জাগেনি। হঠাৎ এত নিবিড় সান্নিধ্যে এসে তার সমস্ত চিন্তাধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে ফিরে বুড়ীর কথায় চেতনা ফেরে তার। শিউরে উঠেছিল ঘৃণায়। ওই ফুলের মত সুন্দর ছোটবাবুকে এত নীচে নামাবার মত হীনতা তার কোনদিনই যেন না হয়।

বৃষ্টিঝরা রাত। একা একা কাটে রাত—জেগে থাকা রাত। শূন্যমনে কি নিবিড় ক্ষুধা তিল তিলে গুমরে উঠছে। ঘুম আসে না। মনে পড়ে—টুকরো ঘটনাগুলো।

সেদিন দুপুর বেলায় এ পাড়ায় মানবকে দেখে অবাক হয়ে যায় টগর। হাতে ছিপ, বাঁধে মাছ ধরতে চলেছে। ওকে দেখেই প্রশ্ন করে।

—বাড়ীতে মদের মেওতা আছে? মাছের টোপ করতে হবে।

—মেওতা!

ফিক্ করে হেসে ফেলে টগর। ওর দিকে চেয়ে থাকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। দুপুরের রোদ থরথর কাঁপছে শালবনে, বোদে পোড়া তেঁতুল গাছের মিশকালো পাতায়। পত্রাবরণের অন্তরালে কোথায় ঘুঘু ডাকছে, উদাস মধ্যাহ্নে। প্রকম্প আলোছায়ায় ওর দিকে চেয়ে আছে অন্যকোন লাস্যময়ী নারী।

—মদ খাবার লোক ত নাই ছুটবাবু, মেওতা পাব কুথায়?

—ও!

এগিয়ে গেল মানব।

এ যেন কি এক স্বপ্নের ঘোর, টগর নিজেকে ভুলে যেতে বসেছে। হঠাৎ চেতনা ফিরে আসে। ছিঃ ছিঃ! কি এক ভূত যেন তার ঘাড়ে ভর করেছিল।

·· বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার আশা। তবু কত বিনিদ্র রাতে তার মনে আসে ওই স্মৃতি—সেই ডাগর নিষ্পাপ চোখের চাহনি।

বৃষ্টিঝরা রাতের আধারে ঘুম নেই, কি সব আকাশ পাতাল ভাবছে সে।

—টগর! টগর!

ঝড়ে হাওয়ায় কে ডাকছে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। হ্যাঁ, বৃষ্টির

ঝিমঝিম শব্দ ছাপিয়ে কানে আসে ওই ডাক। বুড়ী কাঁথা মুড়ি দিয়ে মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

পা টিপে বের হয়ে এল টগর আগডটা টেনে। বুক কাঁপছে গুরু গুরু। সারা মনে কি একবার দুর্বার কামনা অদম্য বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ নিবিড় নিষ্পেষণে কে যেন পিষে ফেলতে চায় তাকে।...বলিষ্ঠ কঠিন বাঁধন, সারা গায়ে ওর মদের টক টক গন্ধ, নিঃশ্বাসবায়ুও বিষিয়ে ওঠে কামনার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে।

—কে?

সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে? এ যেন অন্যকোন একটা দানব।

—এ্যাই! চুপ কর। গর্জন করে ওঠে পরমা।

প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে টগর। পরমা যেন ক্ষেপে উঠেছে, প্রকৃতির ঘন দুর্যোগের মাতন ভরে উঠেছে ওর বুক।

—এই দেখ!

বিদ্যুতের ক্ষীণ আভাষ পরমা আঁচল থেকে বের করে সোনার গহনা কয়েকখানা।

—তোর জন্যে সাগর ছেঁচে এনেছি।

—পরমা! বিস্মিত হয়ে উঠেছে টগরবৌ। এত সোনার গহনা সে কখনও দেখেনি।

- কোত্থেকে আনলি? ডাকাতি করেছিস?

—দামোদদেব ওপার থেকে।

—এই ভরাবানে পাড়ি দিলি ওই মাতাল নদী? তুই কি দৈত্য না দানো?

কথা বলে না পরমা, বিজলী জ্বালা রাতের দ্বিগুণতর আঁধাকে বুকের কাছে টেনে নেয় টগরকে।

ওর মত্ত পৌরুষের আগুনে টগর পতঙ্গের মত এগিয়ে যায়—নিজেকে আজ বাধা দেবার সামর্থ্যটুকুও নেই।

ছোটবাবু! মেঘেঢাকা আকাশের তারার মত কেমন ঘষা ঘষা অস্বচ্ছ আবরণে সব চিন্তা ঢাকা পড়ে গেছে তার মনে।

...কন্দর্পবাবুর কানে আসে সব কথাগুলোই। বসন্তবাবুই পরামর্শ দিয়েছেন বাসন্তীকে; দাদার ভরসাতে বোনও সাহস পেয়ে এতদূর এগিয়েছে মানবও মত দিয়েছে। নীরবে সমর্থন করেন ভুবনবাবু। খুশী হন তিনি।

—সেই ভাল দাদুভাই, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। লেখাপড়া শেখো—

বংশের মুখ উজ্জ্বল করো।

মানব সব ব্যবস্থা করে মা-বাবা-দাদুকে কথাটা জানাতে এসেছে। বাবা চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। সব শুনেছে কন্দর্পবাবু, নিজের ছেলেও আজ কোথায় তাকে অগ্রাহ্য করে চলেছে।

মানব শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হচ্ছে, মামাও এ বিষয়ে সাহায্য করছেন। কন্দর্পবাবুর মনের জ্বালা সেইখানেই।

—পড়াশোনা করে চাকরি করবে—কেমন ?

—সবাই তো করে ? জবাব দেয় মানব।

—তাদেব কথা ছেড়ে দাও। মাথা নীচু করে গোলামী করতে বাধ্য হয় তারা। তোমার সে অবস্থা নয়।

—চুপ করে বসে থাকতে পারবো না আমি। এভাবে এখানে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। মানব বাবাকে পরিষ্কার জবাব দেয়।

টুনুবৌদির কথা মনে পড়ে। মানবের কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর। বাবার মতকে কোনদিনই মেনে নিতে পারেনি, আজ যেন প্রকাশ্যে বিদ্রোহ কবতে চায় মানব। বাবার মতকে সে ঘৃণা করে। চোখের উপর ভাসে কালীপুরের সাধারণ লোকের ধারণা—সেই কথাবার্তাগুলো। ঘৃণা করে তারা সকলেই। কন্দর্প আচাই-এর নাম ওদের মনে বিভীষিকা এনেছে। মাধুরীর কথাগুলো আজও ভোলেনি মানব, তার বৃদ্ধ অসহায় বাবার অপবাদের কথা! নীলে হাড়ীর বুড়ী মা আজও পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—আকাশের দিকে শীর্ণ দুটো হাত তুলে হাঁক পাড়ে।

—হেই ধরম! তুমি ইয়ার বিচার করো।

এমনি আরও কতশত লোক তাকে শাপশাপান্ত করে তার লেখাজোখা নেই।

তাহলে মনস্থির করেই ফেলেছো।

—হ্যাঁ! ছোট্ট একটু জবাবে মানবের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

কন্দর্প আচাই হার মানছে। তার সব দর্প অহঙ্কারে উঁচু মাথা নুইয়ে আসছে ওই মানবের সামনে। শ্বশুরের ঘরে বাসন্তী নীরবে কি কাজ করছিল কাজ শেষ করে বের হয়ে বারান্দার কোনে ওদের দেখে এগিয়ে আসে, মানবের কথাগুলো শুনেছে সে, স্বামীর কথায় জবাব দেয়।

—অন্যায় তো কিছু করেনি ও।

—থামো তুমি। আমাদেরই ঘরে বসে আমাকে অপমান করবার জন্য তুমি ভাইদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করো। কন্দর্প আচাই একটা গণ্ডমূর্খ আর যত পণ্ডিত তোমার দাদা ভাই বাপের বংশ!

কন্দর্প আচাই-এর সারা শরীর রাগে জ্বলছে। বাসন্তী কোন কথা কইল না। মানব মুখের মত জবাব দিয়েছে, সেই ঝালটা ঝাড়তে এসেছে তার উপর। মনে মনে খুশীই হয় বাসন্তী।

গোলমাল শুনে ভুবনবাবুও বের হয়ে আসেন ঘর থেকে, এই নিয়ে কথান্তর হবে তা তিনি জানতেন। বলে ওঠের বৃদ্ধ।

—এ নিয়ে তুমি কথা বাড়িয়ো না কন্দর্প। বংশের একটা ছেলে সে অন্ততঃ মানুষ হোক। তাকে বাধা দিও না।

…বাবার কথায় একটু বিস্মিত হয় কন্দর্প। তার সামনে আজ বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে ঘটনাটা। তারই বাড়ীর ভিতর তারই বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে। স্ত্রী, ছেলে এমককি তার বাবা পর্যন্ত সেই বিরুদ্ধ মতের, তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে মালিয়াডার মুখুয্যে বংশ।

বাসন্তীই আজ এই ষড়যন্ত্রের মূলকেন্দ্র।

কথা বললো না কন্দর্প। সারা মনে তার অসহ্য জ্বালা। মুখ-চোখ থমথমে, বাদলার মেঘ নেমেছে আকাশে আকাশে, কালো বর্ষণমুখর মেঘের ধারা নেমেছে মাটির বুকে।

বৈঠকখানায় পা দিয়েই একটু বিস্মিত হয় পাঁচু, অভা, পরমা আরও কারা এসেছে।

এ সময় ওদের এখানে দলবেঁধে আসা একটা বিচিত্র ব্যাপার। কন্দর্পবাবুকে দেখে বলে ওঠে পাঁচু গোমস্তা।

—একবার চলুন বাবু, নদী টই টম্বুর হয়ে উঠেছে। চর থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে। কে জানে যদি বাঁধ কাটে?

দপ্ করে জ্বলে ওঠে কন্দর্পবাবু—বাঁধ কাটবে? কেন?

যুগপৎ চারিদিক থেকে আক্রমণ আসছে। সোজা হয়ে বসে কন্দর্প।

পাঁচু গোমস্তা বলে ওঠে—আজ্ঞে চর বাঁচাবার জন্যে।

গর্জে ওঠে কন্দর্প।

—বাস করবে মুখুয্যেদের এলাকায়, বাঁধ কেটে ডুবিয়ে দিতে আসবে আমাদের? মুখুয্যেদের কাছে যাক তারা।

সারা মতে আগুন জ্বলছে। খাঁচায় বদ্ধ বাঘের মত পায়চারী করছে কন্দর্প আচাই। হুকুম দেয়, কঠিন কণ্ঠে।

—কাঁধে কোদাল নিয়ে বাঁধে উঠবে আর সড়কির ঘায়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিবি, একটা লাশও যেন না পড়ে থাকে। হজম করে দিতে হবে—বুঝলি।

অভা ডোম ঘাড় নাড়ে—হ্যাঁ হুজুর।

এসব কাজ সে অনেক করেছে ; আজ বন্যার হাত থেকে নিজেদের শেষ সম্বল ওই বাস্তুভিটেটুকু বাঁচাবার জন্যে এ সামান্য কাজটুকু করতে পারবে না ?

পরমা সায় দেয়—এ তো সোজা কথা বড়বাবু।

ওরা বের হয়ে গেল। পিছনে পিছনে ওদের ভিড়ে মিশে মুকুন্দ সাঁপুইও পালাবার ব্যবস্থা করছে। কে জানে ফৌজদারী মামলা বাধলে কি হবে, সাক্ষীটাক্ষী দেবার হুজ্জুতে সে যেতে নারাজ। তাছাড়া রাত পোহালেই কালীপুর বাজারে মুখুয্যেদের সঙ্গে দেখা হবে, নিবারণ মুখুয্যের কাছ থেকে কালীপুরে কিছু জায়গা-জমি নেবার যোগাড়ও করেছে সে। তার মত কারবারী লোককে সব জায়গাতেই মাথা গলাতে হয়। দাঙ্গা ফৌজদারীতে তার না থাকাই ভালো।

—দাঁড়াও মুকুন্দ। কন্দর্প আচাই বাধা দেয় তাকে।

ধরা পড়ে গেছে সে। কাচুমাচু করে বলে ওঠে।

—বাজারে কিছু মাল গস্ত করতে হবে বড়বাবু।

—এই বানে চারিদিকে যাতায়াত বন্ধ, কোথায় মাল গস্ত হবে ?

—আজ্ঞে !...

মুকুন্দের মনের ভাব কন্দর্পবাবুর দৃষ্টি এড়ায় না। সাপের চেয়ে হিংস্র শিয়ালের চেয়েও ফিচকেলী বুদ্ধি ওর। এতদিন মুকুন্দ বড়বাবুর গায়ে এঁটুলির মত লেপটে ছিল তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে, যেদিন মুকুন্দর কারবার জমেনি। আজ যেন সরে যেতে চায় নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে।

—আমার কিছু টাকার দরকার।

বড়বাবু হুকুম করছেন তাকে। মুকুন্দ হাতজোড় করে বলে ওঠে,

—আজ্ঞে বাড়ী বাগান করে জমান তহবিল প্রায় ফুরিয়ে ফেলেছি বড়বাবু, আপনার হুকুম তামিল করতে তাই আজ যেন ভরসা পাচ্ছি না। দু'পাঁচশো যদি লাগে বলবেন।

—হাজার খানেক আমার চাই—কালই।

মামলার খরচ যোগাড় করে কাজে নামতে চায় কন্দর্পবাবু।

—তাইতো। একটু মুশ্‌কিলে ফেললেন যে ?

—আসানের কথা তুমি ভাবো গে মুকুন্দ। কাল দুপুর নাগাদ টাকা আমার চাই।

মুকুন্দ যেন মনে মনে শিউরে ওঠে। টাকা না দিলেও রেহাই নেই।

—আচ্ছা। কি যেন ভাবতে থাকে সে।

মুখুয্যে বংশ!··কন্দর্পবাবুর চারিদিকে ওরা যেন বেড়াজাল ঘিরে রয়েছে। মাথা তোলবার উপায় নেই। কিন্তু চুপ করে সব সহ্য করবে না কন্দর্প আচাই—

পায়ে পায়ে নদীর বাঁধের দিকে এগিয়ে যায় কন্দর্প। দূরে বানে ডুবুডুবু মানাচব দেখা যায়। মুখুয্যেদের খাসমহলের চর—যাক খ্যাপা নদীর স্রোতের মুখে কুটিকুটি হয়ে।

ক্ষীণ কলরব জলের বুকে ভেসে আসছে। কি যেন বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে ওদের শান্তিপূর্ণ জীবনে।

নিতাই ঘোষ তাব জীবনে এতবড বান দেখেনি। উথল পাথাল নদী ফেঁপে ফুলে উঠেছে। জল ক্রমশঃই বাডছে, তেমনি শোঁ শোঁ ডাক।

উৎকর্ণ হযে সে বসে থাকে, থব থব করে যেন চরের মাটি প্রবল স্রোতের মুখে কাঁপছে, যে-কোন মুহূর্তে ধারাল জিব দিযে ক্ষুধিত সর্বনাশা নদী ওই চরের বুকে মাটির খোলাটুকু ফাটিযে দেবে—ধ্বসে পডবে তারা অথৈ স্রোতের বুকে।

—এ ভালো লক্ষণ নয় বেজো। গরুবাছুর পার করবার চেষ্টা দেখো।

—এই বানে পার করবো গরুপাল? চমকে ওঠে ব্রজ।

—উপায় নাই, দু-চারটে বরবাদ হবে, তবু কিছু বাঁচবে। নইলে সব যে বেঘোরে মারা পডবে।

ভাসানী ভয়ে শুকিয়ে গেছে। কানে বাজছে অহরহঃ ওই নদীর ক্রুদ্ধ গর্জন।

—সব না খেয়ে তুই থামবি না—রাক্ষস কোথাকার!

কাঁদছে সে ভয়ে, নিতাই ঘোষ মেযেকে কাছে টেনে নেয়।

—কি হবে বাবা?

—কি আর হবে? বিপদ কেটে যাবে মা। আমরা তো নৌকোয় যাবো, ভয় কি?

—কে যেন চীৎকার করে ওঠে,

—ঘোষ মশায় গো! আর রক্ষে নাই। দেখেন গে বাথানে কি হইচে।

চকিতের মধ্যে সাডা পড়ে যায় চরে। ভর যোয়ানেরা কাপড় সামলে বের হয়ে যায় বৃষ্টির মধ্যেই।

চরে জল উঠে পড়েছে। তিরতিরে গেরুয়া জল বয়ে চলেছে ক্ষীণধারায়

বাথানের মাঠের বিষকরমচা গাছের তলা দিয়ে।

—দেখতে দেখতে নদীর মুখ হয়ে যাবেক উটো।

কারা ঝপাঝপ মাটি দিয়ে বাঁধ দেবার চেষ্টা করছে।

—থাম তোরা। এগিয়ে যায় নিতাই।

—চর ছেড়ে পালাতে হবেক, এ চর আর টিকবে না। নিতাই বলে ওঠে।

—টিকবেক নাই? ভীতচকিত কণ্ঠস্বর ফুটে ওঠে।

—না। গরুবাছুর সামাল করে পাউডি দে। দেরি করসি না। এখনও পায়ের তলে মাটি পাবি, এর পর তাও থাকবে নাই।

গরুগুলো আগামী বিপদের কথা বুঝতে পেরেছে। বাচ্চাগুলো মায়ের কোল ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। মা গা চাটছে ওদের—মাঝে মাঝে কালো ডাগর চোখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, বাতাসে বাতাসে কি এক সর্বনাশা বিপদের সঙ্কেত।

—হাম্বা! ব্যাকুল আর্তনাদ করছে তারা।

সকলেই গরুবাছুর জমা করে এনেছে নদীর উত্তর গায়ে। এইদিকে নদী অপেক্ষাকৃত কম চওড়া, নীচের মাথায় একটা বাঁক নিয়েছে, এইখান থেকে ভাঁটিতে নামলে হয়তো এই বাঁকের মাথায় উঠতে পারে।

সাঁড়াশির আকারে জলধারা চেপে ধরেছে তাদের, ওই বাঁকের মাথা ছাড়িয়ে গেলেই আবার একাকার বড় নদী। সেখানে পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই। স্রোতের টানে কোথায় হারিয়ে যাবে।

হঠাৎ কার হাতের চাপে থমকে দাঁড়াল ব্রজ।

—যেও না তুমি!

ভাসানী ব্রজের হাতটা চেপে ধরেছে, দু'চোখে ওর কাতর মিনতি, আজ বিপদের দিনে ভাসানী নিজেকে চেপে রাখতে পারেনি।

—কিন্তু ওরা কি ভাববে?

—ভাবুক। জেনেশুনে এই নিশ্চিন্ত বিপদের মুখে যেতে দোব না তোমায়।

ভাসানী এগিয়ে আসে ব্রজের দিকে, ওকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। এতদিন যে পার্থক্য-সম্ভ্রম রেখেছিল, আজ বন্যার উদ্দাম গতিবেগে সব বাধা-সংযম দূর হয়ে গেছে।

ব্রজ বলে ওঠে—কোন ভয় নাই। এ নদী বহুবার পার হয়েছি।

তবু যেন ওর মন অভয় মানতে চায় না। অঝোরে কাঁদছে ভাসানী ব্রজের বুকে মাথা রেখে। আজ যাকে এতদিন পাবার স্বপ্ন দেখে এসেছে—তাকে হারাতে চায় না। সব যেতে বসেছে তার।

কলরবে ভরে উঠেছে বৃষ্টিঝরা আকাশ। গরু-মোষগুলো আর্তনাদ করছে। ওদের চীৎকারে ভরে উঠেছে বানভাসা চর।

ভাসানী তখনও কাঁদছে, ব্রজকে ধরে রাখতে পারেনি।

—চল মা।

নৌকায় উঠছে নিতাই ঘোষ, চরভূমি ছেড়ে চললো তারা।

দু'চোখ জলে ভিজে আসে, তাব এত দিনের সাজানো বাগান সর্বনাশা নদীর গর্ভে নিঃশেষ হয়ে গেল। রাক্ষুসে নদী।

দামোদবেব শূন্যবুকে আলোড়ন পড়ে গেছে। কযেকশো গরু-মোষকে লাঠিপেটা করে হিম স্রোতে নামাবার চেষ্টা করছে তারা। গৈরিক ঘূর্ণিভরা উদ্দাম স্রোত খল খল করে বয়ে চলেছে। গরুগুলো পিঠ বাঁকিয়ে মার খাচ্ছে তবু নামতে সাহস পাচ্ছে না। পশুপ্রকৃতিও বিপদের সামনে সতর্ক হয়ে উঠেছে।

সাদাবুক কালো-কালো চলিষ্ণু বিন্দুতে ভরে উঠেছে নদীর বুক। তীরবেগে বয়ে চলেছে তারা মাথাটুকু জাগিয়ে। নিপুণ সাঁতারুর মত গোয়ালারা মোষের ল্যাজ ধরে চীৎকার করে তাদের নিয়ন্ত্রিত করছে। পালকে পাল ভেসে চলেছে বাঁকের দিকে।

—হুঁশিয়ার।

একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণি নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে এইদিকে, ভাসমান গরু-মোষের পালের মধ্যে ঢুকে ওকে চুরমার করে দিতে চায়।

—হাম্বা—আ—আ!

ডুবছে আর উঠছে। একটা গরু ছিটকে গিয়ে পড়েছে ওর কেন্দ্রে; পোঁ পোঁ পাক দিয়ে তাকে তীরবেগে নীচের দিকে টেনে নেয়।

—বেজা! গোবরা চীৎকার করে ওঠে।

—যাসনে ওদিকে। হুঁশিয়ারি করে ওকে।

বহুদূরে গরুটা উঠেছে, নাকে-মুখে ঢুকেছে বালি। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বেনো জলের তোড়ে। একটা গরুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল মধ্যের দিকে। ওর অদৃষ্টে কি আছে তা অনুমান করতে পারে তারা।

—পারমুখো হাঁকা! ব্রজ চীৎকার করে ওঠে!

শোঁ শোঁ জলস্রোতের গর্জনে ওর চীৎকার ক্ষীণতর হয়ে আসে।

জল—আর স্রোত। মুখোমুখি ঢেউ উঠছে উদ্দাম বাতাসে, অসতর্ক হবেই বালিমাটি মাখা বিশ্রী জল নাকে মুখে ঢুকছে। মোষগুলো যুঝে চলেছে—গরুগুলো যেন নেতিয়ে আসছে, ওই স্রোতে উদ্দাম নদীর সঙ্গে যুঝতে আর পারছেনা।

একটার পর একটা গরুকে লেজ টিপে সতেজ করবার চেষ্টা করে

ওরা। হাতে-পায়ে খিল ধরে আসছে। গলা দিয়ে স্বরও যেন বের হয় না।

ব্রজ হাঁপাচ্ছে—চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভাসানীর কান্নাভরা দুটো চোখ—নিবিড় আলিঙ্গনের স্পর্শ।

দূরে বাঁকের মাথায় ছায়াচ্ছন্ন সবুজ গাছগুলো যেন এগিয়ে আসছে।

—হেঁই! হোই—

কলরব করে তাড়াবার চেষ্টা করছে ওরা গরুগুলোকে। জীবনপণ সংগ্রাম চলেছে দুর্বার নদীর স্রোতের সঙ্গে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে ভুবনপুরের বাঁধে। অভা হুঙ্কার ছাড়ে—বাঘের ঘরে ঘোষের বাসা! দুনিয়ার লুটেপুটে খাই আমরা, ওদের সাহস হয়—আমাদের গাঁয়ের বাঁধ কাটতে?

হঠাৎ পরমা জলের বুকে চলিষ্ণু বিন্দুগুলো দেখিয়ে বলে ওঠে—উ শালোরা যেছে কুথায় রে? রণডিহার বাঁধে ঠেক খেয়ে মরবেক নাকি!

পালাচ্ছে ওরা ঘর ছেড়ে, গরুমোষের পাল নিয়ে পাড়ি দিয়ে ডাঙ্গায় উঠছে ওরা। দুখানা নৌকায় করে লোকজন মেয়েছেলেরা এগিয়ে আসছে ভুবনপুরের ঘাটেরদিকে। স্রোতের বেগে কাত হয়ে আবার সোজা ঠেলে উঠছে ভারবোঝাই নৌকা দুটো। কন্দর্প আচাই নিজেও এগিয়ে এসেছে।

আভা ওদের দেবার জন্য তৈরী। গর্জন করে ওঠে;

—বাবু!

—লাঠি নামা অভা, বাঁধ কাটতে আসেনি ওরা। চর ডুবে গেছে—ওরা পালিয়ে আসছে।

নিতাই ঘোষ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে নৌকায় কাঁদছে ভাসানী।

কি যেন ভাবছে কন্দর্প আচাই। চর ডুবে আবার নদীর সামিল হয়ে গেছে—নিতাই ঘোষ উৎখাত ফৌত প্রজা। কিন্তু ও চর আবার জাগবে পাশাপাশি কোনখানেই। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুখুয্যেদের কথা, নিবারণ মুখুয্যের দখল ওখানে আর থাকবে না—এবার কন্দর্প জবাব দেবে ওদের একটা কাজের। নোতুন চরে প্রজাপত্তন করবে কন্দর্প আচাই।

হঠাৎ কলরব করে ওঠে নৌকার সোয়াররা, বারমেসে ধারানির কাছে এসে নৌকা ডুবো চরে আঘাত করেছে সজোরে—কাত হয়ে গেছে নৌকাটা; আর্তনাদ ওঠে—বাঁচাও!

অতর্কিত প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকার তলা ফেঁসে গেছে—একটা তক্তার জোড়

ফেটে গিয়ে জল উঠছে ফিনকি দিয়ে। নেমে দাঁড়াবার মত জায়গা নেই, হাঁটু জল কিন্তু চোরাবালির চর, দাঁড়াবামাত্রই সেঁধিয়ে যাবে সর্বনাশা নদীর অতলে।

কন্দর্পবাবু গর্জন করে ওঠে—অ্যাই ব্যাটারা, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? মানুষগুলো ডুবে মরবে?

ঝপাঝপ ওরা লাফ দিয়ে পড়ল স্রোতে দুর্মদ ডাকাত দল।

অভা—পরমা—আরও কয়েকজন তৈরীই ছিল, লাঠি ফেলে দাঁড়-বৈঠা নিয়ে গিয়ে নৌকা নামালো। সন্ সন্ এগিয়ে চলেছে দুটো নৌকা—লোকজন।

ওদের করুণ আর্তনাদে ভরে উঠেছে নিস্তব্ধ নদীতীর। ভুবনপুরের বাঁধে গ্রামের লোক জেগে গেছে। অভার নৌকা ওদের কাছাকাছি পৌঁচেছে। জীর্ণ নৌকাটা ঘুরপাক খাচ্ছে—স্রোতের বেগে আধডুবো নৌকাটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে চর ছেড়ে অথৈ জলের দিকে।

—ভয় নাই।

অভা বজ্রকণ্ঠে সাহস দেয় ওদের। নদীর বুক কাঁপিয়ে যেন দাপট দেখাচ্ছে সে।

সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। রাক্ষসী নদীর গহ্বরে নিতাই ঘোষের চর ডুবে গেছে—কয়েকটা ভালো গাইগরু ভেসে গেছে স্রোতের টানে—আর উঠতে পারেনি। বাকী পাল নিয়ে ব্রজ আর গোবরা মাইল পাঁচেক নীচে আমলাযোড়ার খাটে উঠেছে।... যারা ভেসে গেছে তারা আর বেঁচে নেই—রণডিহার বাঁধে ধাক্কা লেগে শেষ হয়ে গেছে, উদ্দাম স্রোতে হারিয়ে গেছে তাদের সবচিহ্ন।

...ভুবনবাবুর বার বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছে তারা। ভাসানীর সমস্ত হাসি আনন্দ নিঃশেষ হয়ে গেছে। নৌকা ডুবে গিয়েও সবাইকে তারা ফিরে পেয়েছে—হারিয়ে গেছে নিতাই ঘোষ নিজেই। কখন সবার অলক্ষ্যে ছিটকে পড়েছিল নদীতে কেউ জানে না।

ওরা তার মৃতদেহটা দুদিনপর ডুবন্ত চরের বুকে হিজল গাছের ডালের নিবিড় বাঁধন থেকে বের করে আনে। নিতাই ঘোষ যেন মরবার আগেই আবার ফিরে গিয়েছিল সেই বহু বৎসরের স্মৃতি বিজড়িত ওই চরভূমিতে।

ভাসানী কাঁদছে। পরবাসে পরঘরে আজ সব হারাল সে। বাবা নদীর অকূলে ভাসিয়ে গেল তাকে।

বাসন্তী ওই মেয়েটিকে কেন জানে না আপন করে নিয়েছে। নিজের মেয়ে নেই—বানে ভেসে এসেছে ওই মেয়ে। বাসন্তী সান্ত্বনা দেয়—যে গেছে তার জন্য

কেঁদে কি করবি বল্ ?

—আমার যে সব গেল মা। রাক্ষস নদী আমার সব ছিনিয়ে নিলে গো।

—নদীই তাকে সব দিয়েছিল, ধনসম্পদ—আশ্রয়, শান্তি।

—আবার সব ফিরে পাবি মা !

ভাসানী জলভরা চোখে চেয়ে থাকে ওর দিকে। যা গেছে সব আর ফিরে আসবে না—বাবাকে কোনদিনই ভুলতে পারবে না সে। স্মৃতিকণ্টক জ্বালা সে ভুলতে চায় না।

…কন্দর্পবাবু ব্রজ গোবরা আরও কয়েকজনকে নিয়ে পড়েছে। চর জেগে উঠলেই তার দখলে আনবার সব ব্যবস্থাই করেছে, নতুন প্রজাবিলি হবে।

গোবরার মনে মনে পুঞ্জীভূত ঝড় উঠেছে। এতদিন সুযোগ পায়নি, নিতাই ঘোষকে সরানো শক্ত কথা। আজ ভাসানীর সামনে থেকে ব্রজকে সরানো দরকার। তাহলেই গোবরাই হবে সর্বেসর্বা—চাই কি ভাসানীর মনের নাগালও পাবে !

তারই অখণ্ড প্রতাপ ছিল—কিন্তু কোথাথেকে এসে জুটেছে ওই ব্রজ। আড়ালে কন্দর্পবাবুকে বলে বসে গোবরা কথাটা।

—আজ্ঞে, আমাকেই বন্দোবস্ত দ্যান কেনে ? আপনার ছিচরণে পড়ে থাকি।

…কন্দর্পবাবুকে ও বোধ হয় ঠিক চেনেনি। লোক চরিয়ে চলেছে কন্দর্প গোবরা গরু চরায়। বুদ্ধিটা একটু মোটা।

কন্দর্পবাবু, প্রশ্ন করে,—নিতাই ঘোষের মেয়ে ? সে কি ভেসে যাবে ?

—তা বলছেন কেনে ? মানে উকে যদি—

বাকী কথাটা বলতে পারে না গোবরা, ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করে অর্থাৎ ভাসানীকে যদি বিয়ে করে বসে তাহলেই গোলমাল মিটে যায়।

একটু অবাক হয় কন্দর্পবাবু, ভাসানী ওই যমদূতের মত বিশাল চেহারার লোকটাকে মেনে নিতে পারবে এ বিশ্বাস তার হয় না। মনে মনে ওর স্বপ্ন দেখে হাসি আসে। আপাততঃ প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চায় কন্দর্প। বলে ওঠে,

—আচ্ছা, দেখি, চর দখল হোক। তারপর কথা।

ব্রজ কিন্তু সোজা জবাব দেয় কন্দর্পবাবুর প্রস্তাবে,—আজ্ঞে, যার চর বন্দোবস্ত ছিল, তার মেয়েকেই দিন। ওতে ওরই হক্ সবার থেকে বেশী।

কন্দর্পবাবু ওর দিকে চেয়ে থাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে,

—মেয়েছেলে ! বিষয়-সম্পত্তির তদারক করা কি সম্ভব হবে ?

—তা পারবেক ও।

ব্রজ ওসব ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না। কন্দর্পবাবু ব্রজের দিকে চেয়ে থাকে। ছোকরা বেইমান নয়।

নিতাই ঘোষের জেগেওঠা চর কন্দর্প নিজে দখল নিয়ে, ভাসানীকে ইজারা দিয়েছে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে কন্দর্প। মুখুয্যেরা এগোতে সাহস করেনি।

বিনা রক্তপাতে পাঁচশো বিঘে সোনা ফসলের চর মুখুয্যেরা ছেড়ে দেবে এটা বিশ্বাস হয়নি প্রথম। যেদিক থেকে যেমন করে হোক এর জবাব তারা দেবেই। মানবকে ওদের গোষ্ঠীতে টেনে নিয়ে ওরা যে আঘাত যে অপমান করবার চেষ্টা করেছে, কন্দর্পবাবু যেন তারই জবাব দিয়ে চলেছে একে একে। চর এখন তার।

এইবার কালীপুর মৌজা থেকে মুখুয্যেদের হঠাবার আয়োজন করে কন্দর্প। গোটা কালীপুরের জমিদারি তার চাই-ই।

কোর্টে সেদিন শালা ভগ্নীপতিতে দেখা যায়।

—কই ভায়া! চলে গেলে না যে? তোমাদের খাতির করবার জন্য শ কয়েক লাঠিয়াল রেখেছিলাম।

বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বলে কন্দর্পবাবু। নিবারণ মুখুয্যে হাসছেন,

—জানলে যেতাম নিশ্চয়ই। অনেকদিন দেখাশোনা হয়নি। কিন্তু ভেবে দেখলামও বানেডুবো চরে আর দরকার নেই। তুমি হাবুডুবু খাও আর গোয়ালার খাজনা বাবদ দুধ-ছানা খেয়ে একটু চাঙ্গা হও, লড়তে অনেক হবে কিনা।

বেশ চিমটি কেটেই নিবারণবাবু ভগ্নীপতিকে শোনালেন কথাগুলো। রাগে জ্বলছে সারা দেহ। জবাব দিল না কন্দর্প।

নিবারণবাবুর কোর্টে কেস উঠেছে—এজলাসে চলে গেলেন ঘাড়ে উপর শ্যামলাটা চাপিয়ে। সেদিন বেশ জমলো না আড্ডাটা।

সেই যে সরে গেছে মুকুন্দ—আর ভুবনপুরে আসেনি। হাজার টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, এদিক মাড়ায়নি সে। এড়িয়ে গেছে কন্দর্পবাবুকে। আজ তাকে আর দরকার নেই!

হঠাৎ মুকুন্দকে সেদিন কোর্টে বটতলার দোকানে বসে কার সঙ্গে কথা বলতে দেখে এগিয়ে যায় কন্দর্পবাবু। মুকুন্দর বগলে লাল খেরো বাঁধানো খাতা। সঙ্গের লোকটা তার দোকানের কর্মচারী হবে বোধ হয়।

সামনাসামনি পড়ে যেতেই মুকুন্দ হকচকিয়ে যায়, সরে যাবার পথও বন্ধ; কন্দর্পবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। শশব্যস্তে এগিয়ে যায় মুকুন্দ। পায়ের ধুলো নেওয়া এতকালের অভ্যেস—আজ পায়ে হাত দিতে কেমন ইতস্ততঃ

করে—বিশেষ করে এত লোকজন, তার কর্মচারী—খাতা সরকারের সামনে। তাই শুকনো মুখেই প্রশ্ন করে।

—কেমন আছেন বড়বাবু? ওরে বড়বাবুকে সন্দেশ এনে দে।

কন্দর্প জবাব দেয়—থাক, থাক; বাসায় খাওয়া-দাওয়া সেরেই বের হয়েছি।

মুকুন্দ হাত কচ্‌লাতে থাকে ওর দৃষ্টির সামনে। বুক কাঁপছে দুরু দুরু।

—সেদিন যাবে বলেছিলে, একমাস হয়ে গেল। কি ব্যাপার তোমার?

বেশ কঠিন কণ্ঠে কৈফিয়ৎ চায় কন্দর্পবাবু। মুকুন্দ ওর দিকে একবার চেয়ে দৃষ্টি নামাল। চোখের দিকে চাওয়া যায় না। রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির ছিদ্রপথে যেন জ্বালা বের হচ্ছে।

—কথা বলছো না যে?

—একটু কাজে আটকে পড়েছিলাম বড়বাবু, দু'একদিনের মধ্যেই গিয়ে দেখা করবো।

আচ্ছা! এ কথার যেন খেলাপ না হয়।

কন্দর্পবাবু চলে গেলো ওপাশে, মুকুন্দ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

—দে বাবা একটা ডাব কেটে দে। বড্ড অম্বলের সঞ্চার হয়েছে।

ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার। নিবারণ মুখুয্যের মুহুরী হুঁকো হাতেই এদিকে এগিয়ে আসছে। ও সন্ধান করছে মুকুন্দের, সামনে ওকে দেখে বলে ওঠে।

—এই যে সাঁপুই মশায়, বাবু একবার ডাকলেন। এখুনিই।

নিবারণবাবু দূর থেকে কন্দর্পকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছেন।

মুকুন্দকে তাঁদের হাতে রাখা প্রয়োজন। দরকার হয় আশ্রয়ও দিতে হবে।

ডাবের জল খেয়ে একটু শান্ত হয় মুকুন্দ।

—একটান দাও দিকি; টেনে টুনে যাবো।

ওর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে একটু আরাম করে টানতে থাকে মুকুন্দ। বুকে আবার বল ভরসা ফিরে আসে। নিবারণ মুখুয্যে আর কন্দর্পবাবু দুইদিকেই ঝুঁকছে তার পাল্লা; দেখা যাক কোন্‌দিকে পাষাণ আছে। কারবারী মানুষ। সুযোগ সুবিধা বুঝে চলতে হবে গা বাঁচিয়ে; মুকুন্দ সাবধানে পা ফেলে চলছে।

—চল বাবা। দেখি তোমার বাবুর আবার কি হুকুম। কোর্ট কাছারিতো নয়, পয়সা খেঁচবার কল। পা ফেলতে এখানে কড়ি লাগে।

নিবারণ মুখুয্যে মনে মনে ভাবছেন। কালীপুর বাজার থেকে নদীর কোল অবধি পাঁচহাজার বিঘে ডাঙ্গা—বর্ষার জলেও একগাছি ঘাস জন্মে না, কিন্তু তবুও ওই জমির দখল তাঁর ছাড়া চলবে না, দরকার হয় কন্দর্পের সঙ্গে ফৌজদারীই করবেন। কিন্তু কোনও কৌশলে কাজ হাসিল হলে ওসব গোলমালে যাবেন না।

মুকুন্দ সাঁপুই ওরা কন্দর্পের অনেক দুর্বলতার সংবাদ জানে। ওকে তাই ডেকে পাঠিয়েছেন নিবারণবাবু। দেখা যাক কি হয়।

—এসো এসো; নিবারণবাবু আপ্যায়ন করে মুকুন্দকে।

মুকুন্দ ঘরে ঢুকে গড় হয়ে প্রণাম করে তাঁকে।

চাঁদের আলো ক্রমশঃ কলায় কলায় বেড়ে পূর্ণিমার ভরা যৌবনে পৌঁছে·· ওই তার শেষ সীমানা, আবার ক্রমশঃ কমতে থাকে তিলে তিলে অমাবস্যার নিঃশেষ পরিণতির দিকে টগরবৌ-এর মনেও তেমনি কোন দুর্বার কামনা তিলে তিলে সর্বগ্রাসী পূর্ণতার দিকে চলেছে। সেই বৃষ্টিঝরা রাতে—ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে মনে কামনার ক্রিমিকীট জন্মেছিল—পরমা ডোম তার সন্ধান জানে না। পরমাকে নিঃশেষ গ্রাস করেই থামেনি সে; মনের মাঝে বার বার ভেসে ওঠে একটা মুখ—কাতর চাহনি ফুটে উঠেছে তাতে। অপরাহ্নে অস্তরাগরঞ্জিত বাগানে মৌমাছির কানাকানি; শত পাওয়ার মাঝে সেই নিদারুণ অতৃপ্তি তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

বুড়ীর দুঃখ ঘুচেছে। পরমা এখন প্রায় নীলে হাড়ীর ঠাঁই নিয়েছে।

দুবেলা খাওয়া পরার দুঃখ ঘুচেছে বুড়ীর। তাই ওর হয়েই কথাটা পাড়ে।

—পরমাকে সাঙ্গা কর কেনে টগর।

বুড়ী পরমাকে বেঁধে রাখতে চায়। ভরযোয়ান খাটিয়ে মরদ। রোজগারের ভাবনা থাকবে না, কিন্তু টগর তার চেয়েও বেশী হিসেবী। পরমাকেই জীবনের পরমার্থ করতে চায় না।

— দেখি ভেবেচিন্তে।

পরমা বুড়ীর কাছ ঘেঁসে বসেছিল, সে বলে ওঠে অধৈর্য হয়ে,

—ভেবে কি দেখবি ইয়ার, বল্?

কথা বলল না টগর, চুপ করে থাকে। আবছা আলোয় ওর একরাশ চুল কাঁধের উপর পড়েছে—কানে সোনার ফুল, চিক চিক করছে। সুন্দর ঢলঢলে মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে। পরমাই জবাব দেয়।

—বেশ বাপু, ভেবেই ছাখ তুই। ইয়াতে জোর জাবুরির কিছু নাই।

টগর স্বপ্ন দেখছে সবুজ বনসীমার বুকে ছোট্ট টালিবাঁধানো বাংলোর, নদীর জলের কাছ বরাবর। লালডাঙ্গার শেষে বাংলোটা।

টগর বলে ওঠে—ঘরখানা বানাতে হবেক।

পরমা সায় দেয়—নিশ্চয়। কাঠ বাঁশ যোগাড় করে রাখি—মাঘ ধান উঠলেই খড় এনে ছাওয়াবো।

টগর নীচু ঝুপড়ির মধ্যে থাকতে চায় না, সে অন্য স্বপ্ন দেখছে। রূপ যৌবন থাকতে থাকতেই হাতিয়ে নিতে চায় কিছু। পরমা ওর মনের গহনের সংবাদ জানে না, তাহলে শিউরে উঠতো, টগবগ করে ফুটতো নিষ্ফল আক্রোশে বুনো-রক্তে। হেসে ওঠে টগর ওর দুরাশায়।

—হাসছিস যে? পরমা ওর দিকে চেয়ে রয়েছে।

—এমনই। হাসতেও মানা? টগরের দুচোখে কি এক মায়া।

পরমা ওর টোলপড়া নিটোল গালের দিকে চেয়ে থাকে; এত কাছে রয়েছে তবু ওকে মনে হয় ধরতে ছুঁতেও পারেনি সে।

—একটু নেশা দে।

টগর মাটির হাঁড়ি থেকে ধেনো খানিকটা ঢেলে দেয়। বেহুঁশ হয়ে যাক পরমা, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সব ঢেকে আসছে। বেহুঁশ বেটোর হয়ে পড়ে থাক পরমা।

—নে।

তাজা ঝাঁঝালো পানীয়টা এগিয়ে দেয় তার দিকে।

—লেগো।

বুড়ীর দিকেও খানিকটা মদ এগিয়ে দেয় টগর, অমনি পরমার আনা দুটো ঝালবড়া, দাঁত নেই—মাড়ি দিয়ে চাবলাতে থাকে বুড়ী।

টুকচেন দে বৌ, বেশী দিস নাই কিন্তুক।

মনে মনে হাসে টগর; কলাইকরা বড় গেলাসটা ভর্তি করে তুলে দেয় তার হাতে; চোঁ চোঁ করে গিলছে বুড়ী।

টগরের এসব চলে না—বিশ্রী কেমন গন্ধ লাগে; অন্য কিছু হলে চলতো।

মামড়ার জঙ্গলমহল ইজারা নিয়েছে কৃপাল সিং। শাহীসড়ক থেকে কালীপুরের খোয়াঢাকা রাস্তা পর্যন্ত বিশাল বন কাটাই হচ্ছে। মোটা মোটা পনেরো-বিশ সনের শাল গাছগুলো চালান যাচ্ছে কলিয়ারীতে—প্রপ্ বা খুঁটির কাজে লাগবে।

সেই সঙ্গে ডাঙ্গা থেকে বনের ভিতর পর্যন্ত একটা ফায়ার ক্লের স্তর বের করে সাদা মাটি তুলে চালান দেবার ব্যবস্থা করেছে কলকাতায়। খানতিনেক ট্রাক এনেছে—লোকজন ড্রাইভার কলকব্জাও আমদানী হয়েছে—বনের বাইরে টিলার উপরে গড়ে তুলেছে ছোট্ট একটি বাংলো।

চারিদিকের পাহাড়ী বুনো মাটি তুলে ফেলে নদীর পলিভরাট করে রকমারী গাছ লাগিয়েছে—ঘনপাথরের কালো স্তর ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে কুয়ো খুঁড়েছে।

জায়গাটার ভোল পালটে ফেলেছে কৃপাল সিং।

কয়েক মাসের মধ্যেই কৃপালসিং কালীপুর বাজারে পরিচিত হয়ে উঠেছে। কাঁচা পয়সার অভাব নেই—কুলি মজুর লাগাচ্ছে এন্তার, পাথরের স্তরের নীচেই সাদামাটি—তুলতে পারলেই পয়সা।

রাতের আঁধারে ঢেকে গেছে বনভূমি, মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাক ভেসে আসে। অন্ধকারে চলেছে একটি ছায়ামূর্তি। গ্রাম থেকে বের হয়ে বনের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওর বাংলোর দিকে ক্ষিপ্র গতিতে! ভয়লেশ নেই—শ্বাপদ পশুদের চারণভূমিতে চলেছে স্বৈরিণী।

কৃপাল সিং সন্ধানী লোক। কালীপুব বাজার ফিরতি পথে একদিন টগরকে দেখেছিল রেল ফটকের সামনে। এক নজরেই পরস্পরকে চিনতে দেরি হয়না তাদের।

টগর চেয়ে থাকে ওর দিকে—দীর্ঘ সুন্দব চেহারা। দাড়িগোঁফ ঢাকা মুখখানা রোদের আভায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

—ভুবনপুর যাবে? আস না।

নিজের ট্রাকে তুলে ডাঙ্গার কাছে নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় বলে ওঠে।

বেড়াতে যাবে না তুমি? ওই যে আমার ডেরা আছে।

টগর কি যেন ভাবছে। রোদ-পোড়া ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে শালবনের সবুজঢাকা বাংলোর দিকে। রুক্ষতার মাঝে একটু শান্তির নির্ভর আকর্ষণ।

তারপর থেকেই ক্রমশঃ ওপথে পা পাড়িয়েছে টগর।

কৃপাল সিং নিশাচর জীব। বাংলোর নীচে পায়চারী করছে। প্রায়ই এমনি সময় আসে টগর। অন্ধকার ফুঁড়ে আজও এগিয়ে আসে সে। কৃপাল সিং হাসছে। অস্পষ্ট তারার আলোয় দুটো চোখে ধক ধক জ্বলছে শ্বাপদ লালসা—বনের অতল থেকে নেকড়ে বাঘ এমনি সন্ধানী লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শিকারের দিকে।

—আঃ, ছাপ খেয়ে ফেলাবা নাকি সিংজী?

টগর হাসছে; লুটিয়ে পড়েছে ওর শাড়ীর আঁচল, আদুড় গায়ে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সে—কৃপাল সিং মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দেহের দিকে চেয়ে আছে।

কালীপুর বনের মধ্যে আবার মালগাড়ী লুঠ হয়েছে। বহু জিনিসপত্র চুরি গেছে। দুখানা ওয়াগন ভেঙ্গে গাঁট গাঁট কাপড়—ওষুধপত্র—সাবান—আরও কত কি লুঠ হয়েছে তার হিসেব নেই। লুঠেরার দল কোন চিহ্নমাত্র রেখে যায়নি। রাতের আঁধারেই বনের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে সব কিছু।

কালীপুর বাজারে ওই নিয়ে তুমুল ঝড় ওঠে। মুকুন্দ সাঁপুই পস্তাতে থাকে; হাজার হাজার টাকার মাল এতাবৎ তারই গুদামে এসেছে জলের দামে। আজ সেই লাভের একটা কড়িও তার হাতে আসবে না। কন্দর্পবাবু আবার কোন সন্ধান বের করে সেই নোতুন পথে মাল পাচার করছে।

পুলিস এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে কালীপুরের বনের আশেপাশে। দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ভয়ে ঢুকতে সাহস করেনি। মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে কাগজে কাগজে। এই নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। পুলিস বিভাগের গাফিলতির কথাও উল্লেখ করেছে তারা।

নিবারণ মুখুয্যে বাতাসে কিসের যেন সন্ধান পান। এসব কোত্থেকে হয় তা জানেন—কিন্তু অতি চতুর, সাবধানী সে। তবুও তাকে জালে জড়াতে পারলে সবদিক দিয়ে জয় হবে তাঁরই। কন্দর্পকে এই জালেই জড়াবেন নিবারণ বাবু।

সন্ধ্যার পরই মুকুন্দকে ডেকে এনেছেন শুকদেবের বাড়ীর ভিতরের ঘরে। চর দখলের কথা ভোলেননি নিবারণ মুখুয্যে। একথা সেকথার পর আসল বক্তব্যটা বলতেই চমকে ওঠে মুকুন্দ সাঁপুই। নিজের মনের কোণেও একটা হিংসা চাপা ছিল—হাজার হাজার টাকার মালপত্র লুঠ হল, তার হাতে একটুও এসে পড়লো না। কিন্তু এ নিয়ে ঘাঁটানো কোন দিক থেকেই নিরাপদ নয়। কন্দর্প আচাই বাঘের চেয়ে নিষ্ঠুর, সাপের চেয়ের ক্রুর।

—কি ভাবছ মুকুন্দ ?

—আজ্ঞে, বিষম বিপদের কাজ হবে ওটা।

—পুলিসের কাছে গোপনে নাম ক'টা বলে দেবে মাত্র। পুরস্কার তো পাবেই তাছাড়া সরকারী খেতাবও পেয়ে যেতে পারো।

বুক কাঁপছে মুকুন্দের—পুরস্কারের টাকায় তার লোভ নেই, রায়সাহেব পদবীটা হলে মন্দ লাগতো না। কিন্তু পরিণাম ভাবতে গেলে চমকে ওঠে মুকুন্দ!

নিবারণবাবু ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। সাহস দেবার জন্যই বলে ওঠেন,—কোন ভয় নেই মুকুন্দ। তোমার গায়ে হাত দেবার সাধ্য তাদের হবে না।

উর্বশী যুগযুগের চেনা আপনজন—সর্বজয়ী। গতি সর্বত্র। কালীপুরের বাবু—মহাজনদের গদিতে তার অবাধ গতি। রাতের অন্ধকারে মহাজনদের পিছনের দরজা দিয়ে যাতায়াত করে। সেই রঙ্গিণী মূর্তি রাতের আঁধারে আলেয়ার মত জ্বলে ওঠে আবার দপ্ করে নিভে যায়।

খবরটা সেই-ই আনে। কন্দর্পবাবু ওকে বহুবার বহুভাবে দেখেছে—মাঝে

মাঝে কিছু সাহায্য করেছে নীলে হাড়ীর বৌকে। টগর যে এতদূর এগোতে পারে তা ভাবতে পারে না কন্দর্পবাবু। উপরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কন্দর্প—অবাধ উন্মুক্ত যৌবন-নদী খল খল করছে মাদক লাস্যে। হাঁপাচ্ছে সে এতখানি পথ রাতের আঁধারে দৌড়ে এসে।

—সত্যি বলছিস ?

—হ্যাঁ গো। ক'দিন থেকে নিবারণ মুখুয্যে কালীপুরেই আসা-যাওয়া করছে। মুকুন্দ সাঁপুই এর সঙ্গে খুব ফুসফাস চলেছে। প্রথমে ভরসা পায়নি মুকুন্দ, আজ রেতেই বলছিল আমাকে।

মুকুন্দও নিবারণের দলে ভিড়ছে। ও শয়তান সব পারে।

—কি বলছিল মুকুন্দ ? কন্দর্প স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

টগব জবাব দেয় এগিয়ে এসে।

—দুব এইবার আচাইদের বনেদ তেড়ে। পুলিসে যাবেক নাকি তারা। সদরে। ইখানের থানায় লয় গো।

কন্দর্পবাবু দপ্ করে জ্বলে ওঠে, দুটো চোখ ধক্ ধক্ করছে শ্বাপদ হিংসায়। মুকুন্দ সব পারে—ও অনেক খবরই জানে এদের। বনের ভিতরে সুঁদগুলোও তার জানা। বহু মালপত্র এখনও আছে সেখানে—সরাতে পারেনি। সর্বনাশ করে দিতে পারে মুকুন্দ। নিবারণ ভাল চাল চেলেছে এইবার।

টগর ওর টকটকে মুখের দিকে চেয়ে আছে। কন্দর্পবাবু বলে ওঠে।

—যা তুই। অভা-পরমাকে ডেকে দিয়ে যা এখুনিই।

রাতের আঁধারেই সব কাজ সারতে হবে। একমুহূর্ত দেরী করা চলবে না। নিবারণ মুখুয্যেকে দেখিয়ে দিতে হবে—কালীপুরে বসে তার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র করা চলবে না।

—বড়বাবু!

অন্ধকার ফুঁড়ে যমদূতের মত অভা এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনে তার কয়েকজন বাছাই করা যোয়ান। আবছা অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়েছে তারা হুকুমের অপেক্ষায়। কন্দর্প আচাই আজ সব কিছুর জন্য তৈরী। অভা পরমাকে হুকুম দেয় মুকুন্দ সাঁপুইকে যেখান থেকে পারিস তুলে নিয়ে আসবি এই রাতেই জঙ্গল সুঁদে।

বের হয়ে গেল ওরা ছায়ামূর্তির মত।

কন্দর্পবাবু চরম পন্থা নেবার জন্যই তৈরী হয়েছে। পাঁচু গোমস্তা কৃপাল সিংকেও ডেকে এনেছে।

কৃপাল সিং করিতকর্মা লোক। রতনে রতন চেনে। কন্দর্পবাবুর সঙ্গে

ই তিমধ্যেই তার দোস্তী হয়ে গেছে। অত্যন্ত বিনয়ী—মাথা নীচু করেই আছে সর্বদা। সেই-ই পথ বাতলে দিয়েছে। ওসব লুটের মালপত্র এখানের বাজারে ছাড়া নিরাপদ নয়। তার তিনখানা ট্রাক আছে তাতেই করে রাতারাতি আসানসোল —বরাকর নাহয় সোজা কলকাতার বাজারে তারই জাত বেরাদারদের আড্ডায় পৌঁছে দেবে—কাকপক্ষীতে টের পাবে না।

কৃপাল সিংও লরী পাঠিয়ে দিয়েছে কাঁচা সড়কে, রাতারাতি সব মাল পাচার করে দেবে।

—ইতো বহুৎ সিধা কাম আছে বড়বাবু! আপনার মেহেরবাণীতে সব সাফ করে দোব পান্ মিনিটকো অন্দর।

রাতের অন্ধকারে ডুবে গেছে শালবন, নদীর দিগন্তপ্রসারী বুকে অখণ্ড স্তব্ধতা নেমেছে। থমথমে আঁধারে ওরা হাত-পা-মুখ বাঁধা মূর্তিটাকে নিয়ে এসে নামাল সুঁদের ভিতর। পাথরের স্তর ফাটিয়ে তৈরী করা সুড়ঙ্গ। একটা কেঁদকাঠের মশাল জ্বলছে, পাথরের গায়ে গায়ে লাল হিংস্র আলোর আভা দূর সুড়ঙ্গের মধ্যে অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

ঠিক ঠাওর করতে পারে না মুকুন্দ, মনে হয় সে যেন কি এক দুঃস্বপ্ন দেখছে। কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলো কাঁপছে তার চোখের সামনে, হাত পা মুখ বাঁধা। হাঁটু দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। ঠোঁটের দুপাশে রক্ত ঝরছে। ধস্তাধস্তি করে মুকুন্দকে বেঁধে এনেছে তারা।

হঠাৎ সামনেই কন্দর্পবাবুকে দেখে শিউরে ওঠে মুকুন্দ। সুঁদের ভিতর গমগম করে ওঠে ওর গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

টাকা দেওয়া তো দূরের কথা—একবার দেখাও করতে আসোনি, উল্টে পুলিসের কাছে সব খবর দিতে যাচ্ছিলে?

আর্তনাদ করে ওঠে মুকুন্দ—মাইরি বলছি ওসব বাজে কথা।

--নিবারণ মুখুয্যেকে কি বলেছিলে? কন্দর্পবাবু গর্জন করে ওঠে।

—কিছুই বলিনি। মা গন্ধেশ্বরীর দিব্যি।

মুকুন্দ আর্তনাদ করে কাঁদছে। আজ তার চোখের সামনে ঘনিয়ে এসেছে নিষ্ঠুর মৃত্যুর পদধ্বনি।

--বলতে! শয়তান কোথাকার!

—দোহাই আপনার। এগিয়ে এসে পাথুরে মাটির উপর আছড়ে পড়ে কন্দর্পবাবুর পায়ে। সরে দাঁড়াল কন্দর্প আচাই।

—আর তোমার ফিরে যাবার উপায় নেই মুকুন্দ। নিবারণ মুখুয্যেও এখানে

এলে সেও আর ফিরে যেতো না।

সরে গেল কন্দর্প। অন্ধকার গুহার ভিতরে গুমরে কাঁদছে মুকুন্দ—ছোট ছেলের মত ঘ্যানঘ্যানানি কান্না।

অভা-পরমা-রতন আরও কয়েকজন অপেক্ষা করছে। এ কাজ আগেও করতে হয়েছে তাদের। অতীতের সেই চিহ্ন আজও লুকানো রয়েছে গুহার নীচে অতলস্পর্শী খাদের অন্ধকারে। দিনের আলো কোনদিনই ঢোকেনি সেখানে।

মামড়ার জঙ্গল—সাপ আর বাঘের জন্য বিখ্যাত। শাহীসড়কের উপর দিনের আলোতেই অনেকে দেখেছে তাদের। চিতা বাঘ তাই বিশালকায়। নাগেশ্বরী চিতা এই বনেই দেখা যায়। আর আছে সাপ। ইছাই ঘোষের গড় এলাকা। বনের ভিতরে এককালে দুর্ভেদ্য নগর—বুরুজ—কেল্লা গড়ে তুলেছিলে তারা। উঁচু লাল পাথরের ঢিপিগুলো ঘন বনে আবৃত হয়ে পড়ে আছে। কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল অনেক। সেসব কূপ আজ বুজে গেছে ঘন জঙ্গলে। সুঁদের ভিতরেই সেই সব অঞ্চল।

কুয়োর নীচে একটা ক্ষীন আর্তনাদ ওঠে। ক্রমশং নীরব হয়ে আসে সব।

স্তব্ধ হয়ে গেছেন নিবারণবাবু। রাতের বেলাতেই সব মতলব করে রেখেছিলেন। সকালে ওকে সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গিয়ে জবাববন্দী লেখাবেন। এখানের থানার ওর এজাহারে কোনই কাজ হবে না। কন্দর্পের পরাজিত বন্দী মূর্তিটা চোখের উপর ভেসে ওঠে। টাকে হাত বোলাতে থাকেন অসীম তৃপ্তিতে। সারা অঞ্চলে শান্তির নির্ভর ছায়া নেমে আসবে।

কিন্তু কন্দর্প তাঁর চেয়ে বেশী চালাক; রাতের অন্ধকারেই সে সব কাজ সেরে ফেলেছে—নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে নিবারণবাবুর মূল সাক্ষীকে।

বাড়ীতে একখানা চিঠি পাওয়া গেছে মুকুন্দের নিজের হাতে লেখা, সিন্দুকের চাবি—জিনিসপত্র নড়চড় হয়নি। "সংসার থেকে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার জন্য তীর্থযাত্রা করছে সে।" কালীপুরের গদি দখল করেছে মুকুন্দের ভাইপো মিতন, মনে মনে চায় না সে কোনদিনই মুকুন্দ আবার ফিরে আসুক। সুতরাং ব্যাপারটা সত্যি বলে সেও রটনা করছে—কাকা বৃন্দাবন গেছে।

মুকুন্দের নিজের হাতে লেখা চিঠি পুলিসের কাছে র'য়েছে। অনেকেই কথাটা বিশ্বাস করেছে। মিতনও নিজে এজাহার দিয়েছে—তাকেও বলে গেছে, তীর্থে যাবার কথা। সুতরাং এ নিয়ে নিবারণ মুখুয্যের চিন্তিত হবার কিছু নেই।

পুলিসও বলে—আত্মীয়স্বজনকে চিঠি দিয়ে গেছেন, সুতরাং এর কি করবো বলুন।

মুকুন্দ সাঁপুই নীরবে সরে গেল—অন্তর্ধান হয়ে গেল রহস্যজনক ভাবে।

কে জানে মুকুন্দ আজ বেঁচে আছে কি নেই। নিবারণ মুখুয্যে কথাটা ভাবতেও শিউরে ওঠেন। কন্দর্প সব পারে। কালীপুর বাজার এবং ওঅঞ্চলের মধ্যে ও একটি আতঙ্কের নাম। ভয়ে শ্রদ্ধায় অনেকের রসনা সংযত হয়ে আসে। জঙ্গলঘেরা কালীপুর—কন্দর্প আচাই সেখানের মুকুটহীন সম্রাট।

এর পরও নিবারণের সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই কোর্টের বারান্দায়। দুজনে যথারীতি একসঙ্গে বসে চা খাবারও খেয়েছে। নিবারণবাবু কিন্তু কেমন যেন সংযত হয়ে উঠেছেন ওর সঙ্গে কথাবার্তায়। নিবারণবাবু খবর দেন।

—মানব ভালই পড়াশোনা করছে। সামনের বছরই পাস করবে। দাদা বলছিলেন ওকে বিলাত পাঠাবার জন্যে।

এই যেন কন্দর্পের অন্তরে একটা চরম দুর্বলতা। নিজের সমস্ত বিষয়-আশয় প্রতিপত্তি সত্ত্বেও এইখানে কন্দর্প নিদারুণ অসহায়, মনে মনে ওর একটা পুঞ্জীভূত দুর্বলতা। তার নিজের সন্তানও তাকে অগ্রাহ্য করেছে, অবহেলা করেছে নিদারুণ ভাবে। ওই কথাটা শুনালেই কন্দর্পের সমস্ত তেজ যেন মিইয়ে যায়।

চুপ করে গেল কন্দর্প। নিবারণবাবু ওর অসহায় মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কন্দর্পই বলে ওঠে।

—যা ভাল বোঝে করুক বসন্ত!

—তোমার তিন নম্বর মামলা?

—কালীপুর জঙ্গল নিয়ে?

কন্দর্প আচাই যেন আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। আবার মুখে ফিরে আসে স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা। বেশ জোর গলাতেই জবাব দেয়!

—আইন আদালত করে কিছু করতে পারবে না নিবারণ; মাটি বাপেরও নয়, দাপের। পারো তবে এসো—উৎখাত করো আমাকে।

শালা ভগ্নীপতির লাঠিবাজি কোর্টের সামনে খাবারের টেবিলে প্রায়ই জমে। বহুলোকই জানে—ওদের এই বাহ্যিক লৌকিকতা আর বহু বৎসরের লড়াইএর ব্যাপার লোকের কাছে গল্পকথা হয়ে উঠেছে। কন্দর্প মনে মনে গজরাতে থাকে; একদিকে মুখুয্যেগুষ্ঠী তাকে হার মানিয়েছে, কিন্তু আর সব দিক দিয়ে মুখুয্যেবংশকে সে হটিয়ে রাখবে। কালীপুর মৌজার প্রায় সবই তার দখলে এসেছে—বনের মধ্যেও ঢোকবার সাহস ওদের নেই। বেশ দাপের সঙ্গেই বলে।

—চাকরি, আর ওকালতি করে জমিদারি চালান যায় যা ভায়া; এ জাত

কাঠ। আপনা থেকেই বনে জন্মায়। পিটুলি কাঠ আর শালগাছ জাতই আলাদা। জোড় কলম বাঁধে না।

মুকুন্দের কথা আর ওঠেনি। ওয়াগন লুটপাট এখনও ঘটে চলেছে। কৃপাল সিংহের লরীর সংখ্যা বাড়ছে ক্রমে ক্রমে।

আরও পাঁচজনের পথই নিয়েছে কৃপাল সিং। ওই এলাকায় পাশেই কলিয়ারী মহল; ওপাশেই বার্ণপুর কুলটি কারখানা। ব্যবসার ঠাঁই, বাতাসে এখানে ঝরা পাতার সঙ্গে নোট ওড়ে। কৃপাল সিং একখানা লরী কিনে বন ব্যবসা শুরু করেছিল; কন্দর্পবাবুর সঙ্গে জমি ইজারা নিয়ে 'চায়নাক্লে'ও তুলতো—তারপর সবচেয়ে চালু কারবারের সন্ধান পেয়ে গেছে। রাতারাতি লরীগুলো পাড়ি জমায় ত্রিপল ঢেকে। একবার শাহীসড়কে উঠতে পারলে আর কে ধরে।

কৃপাল সিং তোফা আছে: কাঁচা পয়সা—মহুয়ার চোরা চোলাই মদ—আর টগরবৌ; কোনদিকেই বিন্দুমাত্র অভাব তার নেই। শাঁসে জলে ফুলে উঠছে সে। মসৃণ গতিতে ভাগ্যের চাকা ঘুরে চলেছে—সেও ধাপে ধাপে উঠছে সৌভাগ্যের শিখরে। কিন্তু কোথায় যেন যন্ত্র বিকল হয়ে গেল অকস্মাৎ অতি তুচ্ছ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

পরমা ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। টগরের হাবভাব চালচলন ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে।

—ই শাড়ী কুথা পেলি রে?

টগর মনে মনে হাসে ওর খবরদারিতে; জবাব দেয়।

—রাজারা মাণিক পায় কুথায়? বাজারে কিনেছি।

পরমা ঠিক কথাটা মানতে পারে না। ওর দিকে চেয়ে থাকে। বিয়ে সাঙ্গা করবার কথা উঠলেই বলে টগর।

—তুকে সাঙ্গা করতে হবেক?

বুড়ী প্রথম প্রথম পরমার দিকই টানতো,

—তাবাপু আছিস যখন—ওটা কর। লোকের চোখে ঠেকে যি।

সেই বুড়ী ক্রমশঃ টের পেয়েছে বৌএর রোজগারের পন্থা; পরমার দেওয়া সামান্য কিছু ধান—টাকাটা-সিকেটা তার তুলনায় অতি নগণ্য। সাঙ্গা করলেই সবই হাতছাড়া হয়ে যাবে; টগরকেও বাঁধবার সামর্থ্য পরমার নেই। বুড়ীই বলে ফেলে পরমাকে একদিন সাফ কথাটা।

—উসব থাক বাপু। আসিস-যাস সেই-ই ভালো। আলগাই থাক কেন্নে—বাঁধন-ছাঁদনে দরকার কি তুর?

পরমার মনে হতাশা ঘনিয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে মনে জেগে ওঠে জ্বালা। এতদিন তাকে ঠকিয়ে এসেছে দুজনে!

পরমা রাগ হতাশা চেপে কথাটা টগরকেই জিজ্ঞাসা করে।

—তুরও কি সেই কথা টগর?

টগর চোখ মটকিয়ে বলে—তুর মুরোদ তো বোঝা গেছে, মদ খেয়েই শ্যাষ করেছিস সব।

ইঙ্গিতটা বোঝে পরমা—দপ্ করে জ্বলে ওঠে সারা মন! টগর তাকে এতদিন ল্যাজে খেলিয়ে এসেছে।

বন্য হিংস্র মন জেগে ওঠে তিলে তিলে। টগরের দিকে চেয়ে থাকে—টগর জানে না পরমার দু'হাতের চাপে অমন কত মেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু টগরের এই সাহসের মূল কারণ দেখতে হবে, ওর সব গৌরব চুরমার করে দেবে পরমা। মনের অসহ্য রাগটা চেপে থাকে।

টগর বলে ওঠে—কাজে যা কেনে? সারাদিন উবু হয়ে বসে মাগীর দিকে চাইতে লজ্জা করেনা র‍্যা।

বুড়ী ফোড়ন কাটে—অপরূপ! কখনও দেখেনি কিনা।

পরমা চুপ করে বের হয়ে এল। তার প্রচণ্ড পৌরুষ দুর্মদ রূপ যেন হারিয়ে গেছে কোথায়, সামান্য একটা মেয়ের হাতে পুতুলের মত হয়ে উঠেছে।

সারা মনে তার ঝড় উঠেছে—তার সব সাধ স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে, হু হু ঝড় বইছে দামোদরের শূন্য রৌদ্রতপ্ত বালুচরে।

বৈশাখের খাঁ খাঁ রোদে নদী পার হবার জন্য জনমানবও এগোয়নি। দু'পারের ছায়াতে অপেক্ষা করছে। লু বইছে শুকনো নদীর বুকে—আগুনতাতা বালি—পা দিলেই ফোস্কা পড়ে যাবে। যাতায়াত বন্ধ। হাজারো বিসর্পিল রেখায় নৃত্য করছে দুরন্ত রোদ ওর বুকে—মরীচিকার ইসারা আনে।

কৃপাল সিং সেদিন নিবারণবাবুকে তার বাংলোয় আসতে দেখে একটু অবাক হয়। কালীপুরের ছ'আনার মালিক, কিছু জঙ্গলও তাঁর রাখে কৃপাল সিং। শশব্যস্তে এগিয়ে আসে।

—আসুন উকিল সাহেব।

নিবারণবাবু ওর বাগান দেখে প্রশংসা না করে পারেন না—বাঃ এযে ডাঙ্গার উপরে ইন্দ্রভুবন বানিয়েছো সিংজী।

কৃপাল সিং দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে—প্রশংসায় ভরে উঠেছে তার বুক।

—একটু মালাই হোক বাবুজী।

ঘরের গাইএর দুধ দিয়ে পাঞ্জাবী চা তৈরী হয়ে আসে। নিবারণবাবু একথা সেকথার পর বলে ফেলেন আসল উদ্দেশ্যটা।

—কন্দর্পবাবুকে খাজনা দিও না সিংজী।

—কিঁউ? মনে মনে কি যেন ভাবছে সিংজী।

দু'পক্ষই যুধ্যমান তা শুনেছিল সে, তাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধটা ঘনিয়ে উঠবে এবং সে এই ফাঁকে সুযোগটুকু নেবে কিনা ভাবছে।

—ভয় পেয়ে গেলে নাকি? কোর্টে কেস করলে আমি তোমার হয়ে লড়বো।

সিংজী বাতাসে কিসের ঘ্রাণ পায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলে বিনা পুঁজিতে ব্যবসায় নেমে আজ চারখানা ট্রাকসমেত এই আলু কারবার গড়ে তুলতে পারতো না।

নিবারণবাবু বলে চলেছেন।

—জমিদারি আমাদের, কাগজ কলমে সবই ঠিক আছে। দখলটুকু মাত্র ওর। তুমি খাজনা দিও না ওকে।

-সাঁচ বাত?

হ্যাঁ, উল্টে তোমার কাছে আমারই খাজনার দাবী করে নালিশ করতে পারি।

নিবারণবাবু যেন একটু অর্থব্যয়ের ভয় দেখান ওকে; ওরা এমনি লুঠপাট করতে পারে—খুনখারাবিও, কিন্তু কোর্ট পুলিস করতে ওরা চাইবে না।

—একটু সমঝে দেখি উকিল সাব। পরে দেখা করবো।

—রাত্রি গভীর হয়ে উঠেছে। শেষ মেইলট্রেন চলে গেছে মাটি কাঁপিয়ে পশ্চিমের দিকে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। নিবারণবাবু চলে যাবার পরে থেকেই কি ভাবছে সিংজী—আর হাসছে আপন মনে ঠা ঠা করে।

হঠাৎ টগরকে আসতে দেখে হাসির মাত্রা আরও বেড়ে যায় তার।

—মলো, হাসিতে যি কুটিবাটি হ'লা গো। টগর বলে ওঠে।

—হ্যাঁ। শের সিংহে লড়াই হবে—শিয়াল শিকার লিয়ে ভাগবে।

—মানে? টগর ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা, কিছু অনুমান করে মাত্র। ওর সাবধানী মন মুহূর্তের মধ্যে কিসের সন্ধান পায়। এগিয়ে গিয়ে ওর গায়ে হেলান দিয়ে বসলো। আবেগে ওর গালেই একটা চুমু খেয়ে ওকে কাছে টেনে নেয়;

—কিগো? স্বৈরিণীর দুচোখের তারায় কিসের আহ্বান!

—নিবারণবাবু এসেছিলো, বলছে তুম খাজনা মৎ দেও কন্দর্পকে। হামভি দেগা নেই কিসিকো। ব্যস—মুফৎ খায়েগা।

টগর ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। সিংজী হাসছে—আবেশে বুজে আসে ওর দুচোখ। বিড় বিড় করে কৃপাল সিং বলে চলেছে নিবারণবাবুর সব কথাগুলো।

…রাত বেড়ে চলে। টগরবৌ উঠে দাঁড়াল। অভিসার-শেষে ফিরছে মানিনী! ক্লান্তিতে ছেয়ে আসে ওর দেহ—পা টলছে ঈষৎ। সিংজীর দেওয়া একটা বোতল পেট-আঁচলে বেঁধে নিয়েছে।

…হঠাৎ কৃপাল সিং কেমন চমকে ওঠে। ছায়ামূর্তিটা অতর্কিতে এগিয়ে এসে লাফ দিয়ে পড়ে তার উপরেই। হাতের তীক্ষ্ণধার ছুরিটা আসমানে তুলেছে। সবশক্তি দিয়ে ধাক্কা মেরে তাকে ছিটকে ফেলবার চেষ্টা করে কৃপাল সিং।

পরমা ক্ষেপে উঠেছে। সারা শরীরের রক্ত মাথায় উঠেছে। এতদিন পর আজ বুঝতে পেরেছে টগরকে ভুলিয়েছে ওই দাঁড়িওলা জানোয়ারটা। ছিনিয়ে নিতে চায় টগরকে তার বুক থেকে।

কিন্তু বিদেশী জানেনা ডোমের রক্তে আগুন আছে—সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে! আজ তৈরী হয়েই এসেছে পরমা।

সিংজী ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ধস্তাধস্তিতে ছিটকে পড়েছে ছুরিখানা। কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে পরমা সাঁড়াশির মত শক্ত হাত দিয়ে। হাঁপিয়ে উঠেছে কৃপাল সিং; পরমার খুনে হাতগুলো লোহার চেয়ে বেশী দৃঢ়। কৃপাল সিং বালিশের নীচে থেকে বের করেছে অস্ত্রটা। আজ অত্যন্ত দরকারে লাগে।

…আধারে গর্জন করে ওঠে রিভলবারটা। স্তব্ধ হয়ে গেছে পরমা; হাতের বাঁধন আলগা হয়ে যায়। একটি মুহূর্ত। আর্তনাদ করে ওঠে পরমা। থর থর করে বার কয়েক কেঁপে উঠে সশব্দে আছড়ে পড়ে গেল পরমা। পিঠের গভীরে ক্ষত থেকে ঝরছে তাজা রক্ত। কৃপাল সিং ছাড়া পেয়েই উঠে দাঁড়াল। চোরা রিভববার বিনা লাইসেন্সে রেখেছে, আজ তাতেই রক্ষা পেয়েছে। কি করা যায় ভাবছে সিংজী। পরমার দেহটা পাষাণের মত নিথর হয়ে পড়ে আছে মেজেতে।

শকুনের মাংস কাকে খেয়েছে এই নিয়ে বেশ একটু রসাল আলোচনাও চলে। পরমাকে কারা খুন করেছে। ওরা খোঁজাখুঁজির পর বনের ভিতর শকুন উড়তে দেখে সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে ঘন গাছপাতার ভিতর মৃতদেহটা পায় ক'দিন পর। বিকৃত হয়ে গেছে। নেকড়ে শিয়ালে সারারাত ছেঁড়াছেঁড়ি করে যতটা পারে নিয়ে গেছে—বাকীটা পড়ে আছে। মাথায় উপর চক্কর দিচ্ছে শকুনের দল। যে কোন মুহূর্তেই বাকী মাংসটুকু ঠুকরে শেষ করে দেবে। পরমা ডোম এ অঞ্চলের মধ্যে একটা আতঙ্কের ছায়া এনেছিল—সেই

অসুর পরমার মৃত্যু এমনি নাটকীয় ভাবেই ঘটেছে স্বাভাবিক গতিতে।

কালীপুরের অনেকেই বলে ব্যাটা কোথায় ডাকাতি করতে গিয়ে জখম হয়ে এসেছিল—তাতেই মরেছে।

সাপের রোজা সাপেই মারে—ভূতের রোজা ভূতে। মরার পরও রেহাই নেই।

ওরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৃতদেহটার কাছে। অভা বলে উঠে

—নিয়ে চল, ডাহ করতে হবেক নাই?

কৃপাল সিং সকালবেলাতেই চলেছে কন্দর্পবাবুর বাড়ীতে, সঙ্গে এনেছে দুটো ভাল বিলেতী বোতল। রাগে অপমানে জ্বলছে কন্দর্প। সিংজী তাতে ফোড়ন দেয়।

—জরুর কোন দুশমনের কাজ আছে বাবুজী। নিবারণবাবুদের লোকজনকে দেখেছে হামি ইখানে।

—কি! কন্দর্পবাবু গলার কাছে ঢেলেছে সদ্য আনা মদ। এ উৎকৃষ্ট মদ, প্রতিটি বিন্দু যেন মেতে উঠছে শিরায় শিরায়। সমস্ত রাগ-উত্তাপ দ্বিগুণ হয়ে উঠছে। মুখচোখে অস্বাভাবিক একটা লালিমা ফুটে ওঠে;

—হু। গম্ভীর ভাবে কি ভাবছে কন্দর্প।

আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। বিদেশীর কাছে এত সহজে মনের কথা ফাঁস করতে যাওয়া নিরাপদ নয়। বুকের ভিতর দাউ দাউ আগুন জ্বলছে, মুখুয্যেদের এই কাজ। মুকুন্দের বদলে পরমাকে খুন করেছে তারা। এইখানেই এই চিতা নিভবে না। এর লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে অনেক কিছু। একপাত্র পানীয় তুলে গলার কাছে ঢেলে দেয় কন্দর্পবাবু।

কৃপাল সিং দাড়িগোঁফ ঢাকা কুতকুতে চোখ দিয়ে দেখছে—আক্রোশটা জমে আছে ঠেকে ওর অন্যত্র। সেই ঠাঁইটাকে চেনে কৃপাল সিং।

দুপক্ষের এই আগুন তাকে জিঁইয়ে রাখতে হবে—নিজের কাজ গোছাবার জন্য।

মানবের মন থেকে অতীতের সব স্মৃতি যেন মুছে গেছে। ভুবনপুরের দিনগুলো সে ভুলতে চায়। কোন মাধুর্য কোন শ্রী তাতে নেই। উষর প্রান্তর শালবনসীমা আর নদীর দিগন্তপ্রসারী চরে কেঁদে বেড়ায় অসীম রুক্ষ শূন্যতা। সার্থকতার কোন স্বপ্নই তাতে মাখানো নেই। নিরাভরণা ধরিত্রী। একটু সবুজ স্বপ্নের ইসারা নিয়ে এসেছিল মাধুরী, সেও আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। মাধুরীকেই মনে পড়ে

একমাত্র। একটু বেদনার রঙে রঙীন স্নিগ্ধ অনুভূতি।

মানব কলকাতার সমাজে মিশেছে, মামার বন্ধুবান্ধব গোষ্ঠীতেও সে পরিচিত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্যানার্জির বাড়ীতে প্রায়ই যায়, তিনিই বলেন।

– গ্লাসগো গিয়ে একটা ফরেন ডিগ্রী নিয়ে এসো। দাম বেড়ে যাবে।

কথাটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে চায় না মানব। তিনি বলে চলেছেন,

– সরকার বহু প্রজেক্ট শুরু করবে ; এই সময় ইঞ্জিনিয়ারের দাম অনেক।

মানব চুপ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। দীপা বলে ওঠে,

—তাই ভাল, নইলে শুধু 'বি. সি. বি. ই' কেমন ন্যাডাবোঁচা ডিগ্রী।

দীপা মানবের দিকে চেয়ে রয়েছে। বাবা মেয়ে যেন একছাঁচে গড়া। ওদের চিন্তাধারাও তেমনি একখাতেই বয়ে চলেছে। মিসেস ব্যানার্জি ওদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেন না।

মাধুরী আব তার অসহায় বৃদ্ধ বাবাকেও মনে পড়ে। এমনি মহৎ বৃহৎ জীবনের স্বপ্ন তারা ভুলেও দেখেনি। তবু কোথায় যেন আত্মিক একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল। এদেব মুখেচোখে ব্যবহারে সেই মাটির স্পর্শমাখা সজীব সান্নিধ্য নেই।

—বাবা মত দেবেন না? দীপাই বলে ওঠে।

বাবা!…মানব ভাবছে। বাবাকে ঠিক ভয় না ভক্তি করে আজও তা জানেনা মানব। মনে হয় আর বেশীদূর না এগিযে এখন থেকেই চাকরি খুঁজে নেওয়া ভালো। বাবার উপর চাপ দিতে মন চায় না সে।

—না ঠিক অমত নয়। দেখি!

—দেখবার সময় নেই বুঝলেন। দীপা তাকে যেতে অনুরোধ করে বার বার —অবশ্য আপনার টুনুবৌদির মত নেওয়া দরকার।

দীপা সুন্দরী—তন্বী। আসমানী রং ঢাকাই বুটিদার শাড়ী, মাথায় একরাশ কোঁকড়ান চুলে শ্যাম্পু আভিজাত্যের ছাপ।

মানব যেন এদের ঠিক চিনতে পাবে না—ওর কথার একটা বিদ্রূপের সুর ফুটে ওঠে।

ওর দিকে চেয়ে থাকে মানব। রূপ—টুনুবৌদির রূপ ওর চেয়ে অনেক বেশী, জ্বালাধরানো রূপ সে নয়—শান্ত মাধুর্যভরা। বলে ওঠে,

—তাকে জানানো দরকার। কোনদিনই বৌদি বাধা দেবে না। জানেন —বৌদিই আমাকে এগিয়ে দিয়েছে এতদূর। সেই-ই তো শিবপুরে জোর করে ভর্তি করায়।

—তাই নাকি? দীপা কৌতূহল ভরে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। মানব

বলে ওঠে,

—এমন ব্যক্তিত্ব প্রতিভা সহজে দেখা যায় না।

—একদিন না হয় দেখে আসবো।

মানবও ভেবেছে ওকথাগুলো পাশ করেছে ভাল ভাবেই। কি করবে এর পর তাই ভাবনা। একই চুপ করে বসে আছে বাড়ীতে, মনটা ভালো নেই। এ বাড়তেও টুনুবৌদির সম্বন্ধে দুএকটা কথা শোনে। মামার বাড়ীর পরিবেশও যেন বদলাচ্ছে।

বৌদির সঙ্গে একটা বিষয়ে পরমর্শ করা দরকার।

হঠাৎ ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বৌদি হাতের বইখানা নামিয়ে চেয়ে থাকে। মানবের মনের চিন্তার ছায়া—মুখে তারই চিহ্ন পরিস্ফুট। টুনুবৌদি ওকে দেখে বলে ওঠে।

—কি হল সাহেবের ?

চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বললো মানব—কিছু না !

টুনুবৌদি ওর দিকে চেয়ে আছে। চোখের উপর ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো, একটি কিশোর এসেছিল কয়েক বৎসর আগে। শালগাছের মত ঋজু সোজা সজীব শ্যামল। কান্নাভরা ডাগর চোখদুটো আজও মনে পড়ে টুনুর। ফেলে আসা অতীতের জন্য কান্না।

সেই অতীতকে ভুলিয়েছে টুনুবৌদি—ভবিষ্যতের আলোর সন্ধান দিয়ে। কয়েকটা বছর দেখতে দেখতে চলে গেছে। মানব আজ কৃতী যুবক। বলে ওঠে মানব।

—ওরা বলে বিলেত গিয়ে ডিগ্রী নিয়ে আসতে।

হাতের বইখানা নামিয়ে রেখে এগিয়ে আসে টুনুবৌদি। বিলেত! কথটা কানে গরম সীসের মত বেঁধে। স্বামীর কথা মনে পড়ে— বহু বৎসর অতীতে সেও অমনি আলো আঁধারি সন্ধ্যার অন্ধকারে কথাটা শুনিয়েছিল। তারপর ? কি যেন এক অসহ্য যন্ত্রণার মত মনে হয় সেই কথাটা।

তিন বছর পর ফিরে এল সনৎ—কিন্তু তার কাছে আর ফেরেনি। আজ মানবও ওই কথা বলে। একটু চমকে ওঠে টুনুবৌদি। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে সহজ কণ্ঠে বলে ওঠে টুনুবৌদি।

—কারা ?

—দীপার বাবা—দীপা—মামাবাবু।

—দীপা! টুনুর মুখে এক ছোপ কালি যেন চকিতের জন্য ফুটে ওঠে। তৎক্ষণাৎ হাসির আলোয় ঝলসে তোলে সব কালো আঁধার।

—কই দেখালে না একদিন তাকে ?

—থাক আর দেখে কাজ নেই। ওরা অদেখাই থাকুক তোমার।

—কেন ভ্যাংচি দোব নাকি যে দেখাতে চাও না! খুব সুন্দরী বুঝি ?

মানব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—রসিকতা রাখ। সত্যি কি করা যায় বলো বৌদি। ব্যবসা করতে বলছো—তাতে যে অনেক টাকার দরকার।

উঠলো টুনুবৌদি—সে কথা পরে ভাবা যাবে। চল—রান্নার ব্যবস্থা দেখে আসি। যাও পোশাকগুলো বদলাও। যাবাও বলছিলেন প্রথম গ্রামে গিয়ে মা বাবা দাদুকে প্রণাম করে এসো দু-একদিনের মধ্যে। তারপর ভাবা যাবে পরের কথা।

মানব কালীপুর স্টেশনে নামল কয়েক বৎসর পর। চারিদিক চেয়ে যেন ঠিক ঠাওর করতে পারে না। কালীপুব ক্রমশঃ বদলাচ্ছে। স্টেশনের পাশেই সাইডিং লাইন খুলেছে একটা, মালগাড়ীতে কৃপাল সিংহের কাঠবালি বোঝাই হয়। দু-একটা দোকানও বেড়েছে, ব্যাটারি-সেট রেডিও আমদানী হয়েছে চা-খাবাবের দোকানে।

সদর থেকে শাহীসড়ক ধরে দু'একটা যাত্রীবাহী বাস উজিয়ে আসে কালীপুর স্টেশন পর্যন্ত। এদিকে এখনও সেই দুস্তর গৈরিক প্রান্তর—বনসীমা। রেললাইন চলে গেছে দুদিকের পাথর প্রাকার ভেদ করে।

স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল—সেটা কোয়ার্টার তেমনিই আছে। কয়েক হাত রেলের সীমানা 'কব্‌ল স্টোন' দিয়ে বাঁধানো। সেই ইঁদারা হতে জল পেয়ে এখনও করবী ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। পাশের কোয়ার্টারে কলরব যায়—কে জানে ওই ফুল আজও কেউ হয়তো আনমনে খোঁপায় পরে। মাধুরীর কোন চিহ্ন এখানে নেই।

—পাল্কী এনেছি ছোটবাবু!

গড় করে দাঁড়াল অভা। বয়স হয়েছে তবু বাঁধন তেমনি মজবুত রয়ে গেছে।

—ভালো আছো ?

অভার মুখে ম্লান হাসির আভা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পাল্কী থাক ; মালপত্র তুলে নাও! হেঁটেই যাবো আমি।

—হেঁটে যাবেন! অবাক হয় অভা।

ওদিকে শুকদেব ডাক্তার নামছিল ট্রেনে, এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে মানবকে।

—পাশ করেছিস শুনলাম। এইবার কি করবি ?

শুকদেবের কথার জবাব দেয় মানব—দেখি কি হয়।

অভা এই ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করে না। তাগাদা দেয় ··

—বেলা বেড়ে গেল ছোটবাবু। রোদে কষ্ট হবে।

শুকদেব বলে ওঠে—বাবুকে এইবার রোদে জলেই কাটাতে হবে অভা। ব্যবসাই কতক আর চাকরিই করুক, একটু রোদ সইতে শিখুক। কি বল?

হাসে মানব।

আবার সেই নিস্তব্ধ বাগানের প্রহরাঘেরা গ্রামে ঢুকলো। ওদিকে দূরপ্রসারী নদীর নির্জন স্তব্ধতা পাখীর ডাকে ভরে ওঠে। পাখীডাকা অভ্ররোদে আজ নোতুন প্রাণসত্তার পরিচয় পায় মানব। তাম্রাভ ডাঙ্গায় কিসের সন্ধান করছে মানব আনমনে।

কিছুদিন থেকে বাসন্তী দেখেশুনে শিউরে উঠেছে। কন্দর্প আচাই তান্ত্রিক উচাটনানন্দকে দীক্ষাগুরু পদে বরণ করেছে। শীর্ণ পাকানো বীভৎস চেহারা, চোখেমুখে একটা নিষ্ঠুর পাশবিকতার ছাপ। গলায় রকমারী যন্ত্র মাদুলী, বাহুতে গাছের শিকড়, রুদ্রাক্ষ, রঙ্গীন কাঁচের টুকরো; দিনরাত কারণবারি সিঞ্চনে চোখদুটো লাল। কন্দর্পকে মহাশক্তিশালী অণিমাদি ষড়ঐশ্বর্যের অধিকারী করে যাবে সে। যোগসাধনায় পূর্ণাভিষেক হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। একদিকে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে অন্যদিকে উন্মাদের মত এগিয়ে চলেছে বিকৃত মনের পরিতৃপ্তির সন্ধানে কন্দর্প আচাই।

রাত্রে বন্ধঘরের সামনে ওদের কথাবার্তা শুনে শিউরে উঠেছে বাসন্তী,

—লতা সাধনার প্রয়োজন। চাই ডোম্বিনী কামিণী! সাধনার প্রধান অধিকরণ। তার যোগাড় হয়ে গেছে। টগরবৌ চুপিসারে আসে—রাতের আঁধারেই আবার চলে যায়। কানে আসে কাদের ফিসফাস শব্দ মন্ত্রধ্বনি

পুষ্পিনী মকরন্দেন ততো হোমং সমাচরেৎ।
ওঁ নমস্তে ভগমালায়ৈ ভগরূপধরে শুভে॥
ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িণী।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মন সিদ্ধির্ভবতি॥

···কন্দর্পের মনে মনে কি যেন দুরূহ শক্তির সঞ্চার হয়। বাস্তব জগতে সে ক্রমশঃই অনুভব করছে পরাজিত হতে চলেছে সে—শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। ততই দুর্মদ হয়ে উঠছে কোন গোপন রহস্য থেকে শক্তি আহরণ করবার জন্য। শক্তিসাধনার বিকৃতিতেই নিজেকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য মেতে উঠেছে সে।

ওই পৈশাচিক কীর্ত্তিকলাপে শিউরে উঠেছে বাসন্তী; থমথমে বাড়ীটাকে ঘিরে

রাতের আঁধারে অশরীরী ভূতপ্রেতের দল যেন হানা দেয়।

বাসন্তী নিজে লেখাপড়া কিছু জানে; সেদিন গুরুদেবের উপদেশ শুনে শিউরে উঠেছিল; জোড়করে বসে আছে কন্দর্প; শুকদেব তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করছে—

দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ
দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চান্ত সিদ্ধতি।

এর অর্থ বোঝে বাসন্তী। কন্দর্প বাহ্যিক জগৎ থেকে পরাজিত যত হবে ততই ওই জঘন্য পথে মেতে উঠবে এই শাক্তসাধনার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়।

কিন্তু বাসন্তী বলবার ভরসা পায় না। রাতের আঁধারে ওরা সব বদলে—যায়—দিশী বিদেশী মদের ঝাঁঝে বিকৃত হয়ে ওঠে ওরা।

বাসন্তী মনে কি এক নিদারুণ ব্যথা চেপে রয়েছে। এ ব্যথা প্রকাশ করা যায় না—কোন নিরাকরণ করবার উপায়ও জানা নেই। এমনি দিনে মানব বাড়ী এসেছে। মাও খুশী হয়।

—তোমার শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে মা।

মানব ছোট ছেলের মত মাকে জড়িয়ে ধরেছে, বাসন্তী হাসে—না রে না। বেশ তো আছি।

—ছাই। চুলে পাক ধরেছে। মুখ-চোখ বসে গেছে।

—বয়স হয়নি? নাতিপুতি হবার সময় হয়েছে, চুল পাকবে না? মা আর ছেলের মাঝে কোন ব্যবধানই নেই। বাসন্তী নিশ্চিন্ত মনে কথা বলতে পারে—দাদা কি বললেন?

—মামা বলেন বিলেত ঘুরে আয়।

—বিলেত! সে তো অনেক দূর বাবা। তাছাড়া—

বাসন্তী জানে—তার বড় ভাইপো সনৎ বিলেত গিয়ে সাহেব হয়ে ফিরে এসেছিল মেম সাহেবকে বিয়ে করে। তার একটি মাত্র সন্তান, সে যদি হারিয়ে যায়—তার সান্ত্বনার কিছু থাকবে না। স্বামীকে নিয়ে কোনদিনই তৃপ্তি পায়নি—শেষ জীবনের একমাত্রআশা-ভরসা ওই মানব—তাকে হারাতে চায় না।

হাসে মানব—সানুদার মত সবাই নয় মা। আরও তো অনেকে এসেছে। জীবনে প্রতিষ্ঠা খ্যাতিও অর্জন করেছে।

—কে জানে বাবা। দেখ উনি কি বলেন।

বাসন্তী স্বামীর উপর কোন কথা বলতে পারে না—মতামত দেওয়া তো দূরের কথা।

ভুবনবাবু খুশিতে ফেটে পড়েন। জীর্ণ স্থবির বৃদ্ধ, চোখে ছানি পড়েছে, ভাল করে মানুষ ঠাওর হয় না।

—এলি দাদুভাই।

প্রণাম করে দাঁড়াল মানব—ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি দাদু!

মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন তিনি; সারা অন্তরের অসহায় আকুতি দু' বিন্দু অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে।

—বংশের মুখ উজ্জ্বল কর ভাই। আচাই বংশের নামে লোক শিউরে ওঠে; তুই তার গৌরব হয়ে ওঠ।

বুড়োর অন্তরের হাহাকার মনে মনেই জ্বলে উঠেছে হু হু করে। বাজ-পোড়া তালগাছ—বুক জ্বলে ছাই হয়ে গেছে, বাইরের খোলসটা টিকে আছে মাত্র।

—বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ। কি কাজে ব্যস্ত দেখলাম। বিশেষ কথাবার্তা হ'ল না।

—তা হবে কেন? দিনরাতই ওই নিয়েই ব্যস্ত ও। কিন্তু রক্তের নেশা, মাটির নেশা একদিন চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়বে ভাই—ও মূর্খ তা বোঝেনি। এ সব খেলাপাতির ঘরকন্না আর ক'দিন? সব চুরমার হয়ে যাবে। পাপে ভরে উঠেছে।

সমস্ত অত্যাচার অনাচারকে শক্তিসাধনার নাম দিয়ে চালাতে চায়—মানুষ সমাজ ধর্ম সব কিছুকে কলঙ্কিত করেছে ওরা। ছি ছি; এই আমার ছেলে! নারায়ণ—নারায়ণ! বুড়ো উত্তেজনায় কাঁপছে। ধরে বসাল ওকে মানব।

চুপ করুন দাদু।

—চুপ করবো না, ক'দিনই বা আছি। তুই শুনে রাখ মানব—এই সাধের প্রাসাদ চুরমার হয়ে যাবে, হিরণ্যকশিপুও ধ্বংস হয়েছিল। বড্ড বেড়েছে কন্দর্প! নুড়ি কুড়িয়েই স্বপ্ন দেখছে মাণিক পেয়েছি। দিন বদলায়, যুগ বদলায়—ও সেই নোতুন যুগের তালে তালে চলতে পারবে না। ওরা ভেঙ্গে পড়বে তবু নুইবে না।

হয়তো বৃদ্ধের কথাই সত্যি। কন্দর্পবাবুও মনে মনে শিউরে উঠেছে। পুলিসের প্রতাপ বেড়ে উঠেছে। চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি। ওদিকে কৃপাল সিংও বেয়াড়া গাইতে শুরু করেছে। দরকার হয় ওয়াগন লুটের কাজ ওরা নিজেরাই করবে—

পারছে না শুধু শত্রু পিছনে রেখে কাজ করা নিরাপদ নয় এই ভয়েই। তাই যোগসূত্র টিকিয়ে রেখেছে কোনমতে। হাততোলা বিশ পঁচিশটাকা লুটের মালের নজরানা দেয়।

খাজনা দিতে গড়িমসি করছে কৃপাল সিং। কন্দর্পবাবুকে বশ করতে চায় বিলেতী মদ দিয়ে, কিন্তু সেদিকে হুশিয়ার কন্দর্পবাবু। মদ খায় কিন্তু হিসাব ভুল হয় না।

—দু'কিস্তী বাকী পড়লো কৃপাল সিং।

কন্দর্পবাবুর কথায় পাগড়ী সমেত মাথা নুইয়ে বলে ওঠে।

—বাজার বড় মান্দা চলেছে বড়োবাবু, জরুর দেবে হামি।

চটাতে সাহস নেই—ফন্দী ফিকিরে যতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে তারই চেষ্টা করছে। নইলে সামান্য টাকা কৃপাল সিং ফেলে দিতে পারে।

কন্দর্পবাবুর মনে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে ধারণাটা। নিবারণ মুখুয্যে ওকে হাত করেছে, গোপনে ও যাতায়াত করে সেখানে এবং পরমার খুনের ব্যাপারেও নিশ্চয় কিছু জানে কৃপাল সিং। শিয়ালের মত ধূর্ত ওই লোকটা। ঘৃণাভরে ওর দিকে চেয়ে থাকে কন্দর্পবাবু। কৃপাল সিং এক গেলাস পানীয় ঢেলে তুলে দিতে আসে তার হাতে।

—না, আর খাবনা থাক। কন্দর্প বাধা দিল তাকে। আজকাল কন্দর্পের মনে একটা আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে আসছে; সাধনা থেকে কিছু বিভূতি অর্জন করেছে বলে মনে করে; চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠেছে—কপালে একটা সিন্দুরের দগদগে ফোঁটা।

কন্দর্পবাবু বেশ বুঝতে পারছে আজ নিবারণবাবু একা শত্রু নয়, বিদেশী ওই কৃপাল সিংও তার শত্রু। নিবারণবাবু এবং তাকে একত্রে ফাঁকি দেবার জন্য বুদ্ধিতে বালিশাণ দিচ্ছে ওই ধূর্ত লোকটা। কন্দর্পবাবুর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি কৃপাল সিং। মদের নেশায় চুর করে দিয়েও পারেনি।

চরে আবার নোতুন বাস গড়েছে ভাসানী। গড়ে তুলেছে আবার গরু বাথান ব্রজ দিনরাত পরিশ্রম করে—ভাসানীও। গোবরাও রয়েছে—কিন্তু আজও সেই মাইনে করা লোকই। এত চেষ্টা করেও চর ইজারা পায়নি, ভাসানীকেও না। ব্রজ তাকে ঘিরে রয়েছে। তিলে তিলে সঞ্চিত বিক্ষোভে একদিন গোবরা ফেটে পড়ে।

প্রলুব্ধ করেছে তাকে নোতুন সবুজ মানাচর, গরু বাথান, ছোট একটি ঘরের স্বপ্ন আর ভাসানীর যৌবনপুষ্ট দেহ। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পথে ওই ব্রজ।

আবছা অন্ধকারে সেদিন চরম আঘাত করবার জন্য তৈরী হয়েছে গোবরা। এক আকাশে দুই সূর্য থাকতে পারে না।

চরের মানাবনে অন্ধকারে দুটো দৈত্য যেন মেতে উঠেছে। ব্রজ ভাবতে পারেনি গোবরা তাকে এমনি করে আঘাত হানতে এগিয়ে আসবে। সেও বাধা দেয়।

—কি করেছো? ভাসানী ব্রজের দিকে চেয়ে থাকে। সারাগায়ে ক্ষতচিহ্ন, কাঁধের কাছে বেশ খানিকটা কালশিরার দাগ—নাকমুখ কেটে গেছে। গোবরার নোংরামি বেড়ে উঠেছিল। নিতাই ঘোষ মারা যাবার পর ভাসানীর নামেই চর ইজারা নিয়ে ব্রজ কাজকর্ম দেখাশোনা করছে। গোবরা মোটেই সহ্য করবে না। সেই মালিক হতে চায়।

—গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলাও। ভাসানী একটা গামছা নিয়ে আসে। নিজেই ধুইয়ে দিতে থাকে তার ক্ষতগুলো। ব্রজ চুপ করে বসে আছে। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা কল্পনাই করতে পারেনি। গোবরা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাকে হটিয়ে দিতে চেয়েছিল চর থেকে; ভাসানী আর তার চর দুই-এর মালিকানা পেতে চায় গোবরা।

—ব্যাপারটা কি হল বল দিকি? ওকে তাড়িয়ে দিলে?

ব্রজের সঙ্গে ওদের লাঠালাঠির সময়ে ভাসানী গিয়ে পড়েছিল, নইলে খুন-খারাপিই হয়ে যেত! ভাসানী গোবরাকেই তাড়ালো।

—হ্যাঁ! ভাসানীর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। তার কর্তব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। ব্রজের মতামতের অপেক্ষা রাখে না।

লোকে কি বলবে? ব্রজ ভাবনায় পড়েছে। এ লড়াই-এর কথা ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। তার অন্য মানে করে নিতেও দেরী হবে না।

—যার যা খুশি বলুক। একটু অসাবধান হলেই কি সর্বনাশ হয়ে যেতো বল দিকি? ওকে তাই তাড়ালাম—শয়তান ওটা। তুমিও গুণ্ডা কম নও বাপু। ভাসানীর কণ্ঠস্বরে নিদারুণ উৎকণ্ঠা।

ব্রজ কথা বলে না, ভাসানীর দিকে কৃতজ্ঞতা ভরা চাহনিতে চেয়ে থাকে। আজ ভাসানী ওকে নোতুন দৃষ্টিতে দেখে। ব্রজের পৌরুষ তার চিরন্তন নারীত্বকে মুগ্ধ করেছে।

ওর হাতের নরম স্পর্শ—সমস্ত জ্বালা ভুলিয়ে কি এক স্নিগ্ধতার প্রলেপ আনে। আবছা আলোয় আজ ভাসানী কি এক রহস্যময়ী রূপবতী নারীতে পরিণত হয়েছে। ওর রূপের জন্যই বোধহয় এই আগুন জ্বালা।

—ভাসানী! ব্রজ ওর হাতটা তুলে নেয়।

কাঁপছে তার সারা দেহ অসহ্য উত্তেজনায়—ব্রজের মনের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছে ভাসানী। যে বাধা এতদিন পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুজনের মাঝখানে—গোবরা তা নিমেষেই ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেছে। আজ মনে হয় দুজনে দুজনের দিকেই এগিয়ে এসেছে।

·· কাছে টেনে নিতে চায় ওকে; ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ভাসানীর সুগৌর মুখ। আর্তনাদ করে ওঠে অস্ফুট কণ্ঠে।

—না—না-না! ব্রজ। ভাসানীর মনের ঝড় ফুটে ওঠে চোখের চাহনিতে।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গেল ভাসানী। ব্রজ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। কাঁদছে ভাসানী—অসহায় কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে তার দেহ। কান্নাভেজা কণ্ঠে আর্তনাদ করছে সে—তা হয় না ব্রজ। তা হয় না—হতে পারে না। এ আমার অভিশাপ। তুই জানিস না।

ব্রজ ওর কান্নাভেজা মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে। নিদারুণ ব্যর্থতায় কাঁদছে ভাসানী। এ যেন অন্য কোন মেয়ে। ব্রজ ওকে ঠিক চেনে না। যখনই কাছে যেতে চেয়েছে সারামন—ভাসানী কি এক বিধিনিষেধের গভীর আড়ালে নিজেকে বন্দী করে ফেলে। ছটফট করে নিজেও কিন্তু তবু সেই বাঁধন কোনদিনই ভাঙ্গেনি। সত্য হয়তো কোন অভিশাপ জড়িয়ে রয়েছে। ব্রজ কোনদিন জানতে চায়নি। কাঁদে ভাসানী অসহায় কান্নায়।

নিবারণ মুখুয্যে সেদিন কাছারিতে কন্দর্পকে দেখে চেয়ে থাকেন। ওর দেহমনে একটা পরিবর্তন আসছে—মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে উঠছে। চোখের কোলে জমেছে কালির দাগ; একটা ক্লান্তি-অনাচারের ছাপ ফুটে উঠেছে তার মুখে। মুকুন্দ আর পরমা ডোম দুই পক্ষের দুজন পড়েছে। বিবাদটা আরও ঘনিয়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে। কন্দর্পর চোখেমুখে কেমন দৃঢ়তা।

—কালীপুর মৌজা বিক্রী করে দোব ভাবছি। নিবারণবাবু কথাটা বলেন ওকে। একটু আশ্চর্য হয় কন্দর্প,

—দখল কোথায় যে বিক্রী করবে?

—যে কিনবে সেই-ই দখল নেবে।

নিবারণবাবু যেন শাসাচ্ছেন তাকে। জোরদখল করে ফৌজদারী করবার

কথা বলছেন কন্দর্প আচাইকে।

—পারো তবে তুমিও ছেড়ে দাও ওর ছ'আনি। এইবেলা বুঝলে।

ভগ্নীপতিকে পরামর্শ দিচ্ছেন নিবারণ—ঝড় উঠেছে। সর্বনাশা ঝড়। দেড়শো বছরের পুরোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে; মৌরসী মোকরারী স্থিতিবান রায়তী কোর্ফাস্বত্ব সব বিবাক ফৌত হয়ে যাবে। প্রজা আর সরকার। মধ্যে জমিদারের কোন দালালি থাকবে না। চাষী প্রজা সোজাসুজি খাজনা জমা দেবে সরকারকে।

কথাটা শুনেছিল কন্দর্প কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। গুজব বলেই ধরেছিল। নিবারণের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—সত্যি!

—আইন পাস হয়নি তবে পাস হয়ে যাবে। তার আগেই ওলটপালট বন্দোবস্ত—হস্তান্তর যা পারো করেকম্মে দু'পয়সা ঘরে তোল! শেষতক পঁচাত্তর বিঘে জমিতে ঠেকবে—লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তরও থাকবে না।

—মাত্র পঁচাত্তর বিঘে! অবাক হয়ে যায় কন্দর্প।

সারা দেহ যেন ঘুরপাক খাচ্ছে চোখের সামনে, ঘনিয়ে আসে নিশ্চিত মৃত্যু—চারিদিকে আয় বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্ত জমিদারি চলে যাবে—পাশের গ্রামের লোক আর মাথা নুইবে না—কালীপুর বাজারের দোকানদাররা ইসারা করে দেখাবে তাকে—সাজা রাজা।

এতদিনের সমস্ত অত্যাচার দাপট তারা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে; এইবার যেন সুদসুদ্ধ উসুল করে দেবে তারা। কি এক ভাগ্যাহত বিড়ম্বিত করুণাকুড়ানো জীবনযাত্রা। শিউরে ওঠে সে।

—চা খাও কন্দর্প!

নিবারণকেও ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না কন্দর্প। সব যেন আবছা হয়ে উঠেছে। চা—চা-এ বুকের এই জ্বালা কমবে না। এতবড় আঘাতটা সত্য হয়ে উঠবে নিষ্ঠুরভাবে—ভাবতেই পারেনি সে।

যা পারছে দূর দূরান্তরের জমি-জায়গা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে কন্দর্প আচাই। টাকার দরকার—নগদ টাকা বেশ কিছু চাই। বহু অপচয় করেছে—তখন ছিল নদীর স্রোত—এসেছে গেছে। এখন আর আসা বন্ধ হয়ে যাবে—তার আগেই গুছিয়ে নিতে চায়।

প্রদীপের নিভু নিভু অবস্থা। দপ্ করে শেষবারের মত জ্বলে ওঠে সে। কন্দর্পের সারা মনে তেমনি দুর্বার জ্বালা। ভুবনপুরের আচাই বংশের শেষ

জমিদার সে—তার সঙ্গে সঙ্গেই দেউড়িঘেরা বাড়ী—পাইক পেয়াদার দল—দশ-বিশখানা গ্রামে নামডাক মুছে যাবে। মানব আগে থেকেই তার জন্য তৈরী হয়েছে। কিন্তু! কন্দর্পবাবুর জীবনের শেষ এখনও অনেক বাকী; ভুবন আচাই-এর কথা ফলছে।

—সব উড়ে যাবে, ছাই হয়ে উড়ে যাবে।

মাঝে মাঝে সেই কথাই ভাবছে কন্দর্প। এ ভাবনার কূল তল নেই।

—কি হয়েছে?

বাসন্তী স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে বেদনাহত কণ্ঠে।

—কিছু না। এড়িয়ে যায় কন্দর্প।

বাসন্তী চেয়ে থাকে স্বামীর দিকে। ওই চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ফুটে উঠেছে কি এক অপরিসীম জ্বালা। সব যাবে—কন্দর্প আচাই-এর বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা এই সম্পত্তির কিছুমাত্র অবশেষ থাকবে না।

যাক! বিস্মৃতির আবরণে সব ডুবে যাক। কন্দর্পবাবু শেষবারের মত জীবনকে উপভোগ করে নিতে চায়—শেষবারের মত স্মরণ করিয়ে দিতে চায় ওদের সবাইকে—এখনও কালীপুরের জমিদার সেই-ই।

গোবরা এসে জুটেছে কন্দর্পের আশ্রয়। কন্দর্পবাবু ওর বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে থাকে, চোখ দেখলেই মানুষ চেনে কন্দর্প। দয়ামায়ার লেশ নেই—কঠিন কর্কশ চাহনি। হিংস্র বুনো স্বভাব ফুটে ওঠে। এসব কাজে দয়ামায়া থাকলে চলে না।

—পারবি কাজ করতে?

অভাও ওর দিকে চেয়ে আছে—শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনে সে? গোবরা ভালো লাঠিয়াল। গোবরা বলে ওঠে।

—আজ্ঞে কেনে পারবো না! ইতো আমাদের জাত ব্যবসা।

কন্দর্পের দুর্মদ লোকের দরকার। নীলে—পরমা ডোম একে একে গেছে। তার বাহুবল এখন এরাই।

—থাক, ওস্তাদ যা বলবে শুনবি।

—নিশ্চয়।

বহাল হয়ে গেল গোবরা। কিছুতেই ভুলতে পারে না ভাসানীর সেই হাড়জ্বালা করা কথাগুলো।

রাতের অন্ধকারে কোথা থেকে মেয়ে আমদানী হয়—অভা সাবধান করে।

—যা দেখবি-শুনবি কাক পক্ষীকেও বলবি না। টুঁটি থাকবে না।

গোবরা সায় দেয়—দেখে লিও তুমি।

গোবরা যেন কিসের সন্ধান পেয়েছে। চোখের উপর ভাসানীর মুখখানা ফুটে ওঠে—তার দর্প অহঙ্কার চুরমার করে দেবে। নাকমুখের ক্ষতগুলো মিলিয়ে গেছে কিন্তু ব্রজের মারের দাগ এখনও যায়নি, মনের মধ্যে জ্বালা ধরায়। কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে ওই তেজী মেয়েটা।

টগর—টগর বাবুর কাছে পুরাণো হয়ে গেছে। তাছাড়া টগরের যৌবনে ভাটার স্তিমিত গতি, ধ্বসে যাচ্ছে একে একে বনেদী বাড়ীর ইট খসার মত।

কন্দর্প বাবু তাজা পানীয় ঢেলে চলেছে।

বৈকালের পর থেকে আর কারো সঙ্গে বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ করে না। মদের ফোয়ারা ছোটে। সমস্ত জ্বালা—চিন্তা যেন ওই পানীয়ের মধ্যে নিঃশেষে ডুবিয়ে ক্ষান্ত হতে চায়। কর্মক্লান্ত—ব্যর্থ সে।—অমানুষিক পিশাচের জীবন তার শেষ লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তন্ত্রের শেষ পর্যায়ে নেমেছে। নারী-মাংসও জোটাবার সামর্থ্য কমে আসছে ক্রমশঃ। কেমন যেন ঝড় বইছে শিরায় শিরায়। গোবরা এই মাতনের অর্থ জানে।

—বাবু! ফিস্ ফিস্ করে কথাটা নিবেদন করে গোবরা তাক্ মাফিক।

—উঁ। লাল করমচার মত চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে কন্দর্প।

গোববা এগিয়ে আসে—এই উপযুক্ত সময়।

—হুকুম কবেন তবে চেষ্টা করি, একটা ভালো জিনিস আছে।

—ব্যাটা আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, অপেক্ষায় আছেন। দেখি তোর এলেমখানা।

—আপনার হুকুমে দিনকে রাত করতে পারি। গড হয়ে বের হয়ে এল গোবরা; মুখে চোখে তৃপ্তির আভা—প্রতিশোধের তীব্র বিষজ্বালা ওর মনে। আজ ভাসানীর কথার সমুচিত জবাব দেবে—তার উদ্দেশ্যে সার্থক হতে চলেছে। অন্ধকারেই ক'জনকে নিয়ে নদীতে নামল গোবরা।

রাতের আঁধার রহস্যময় হয়ে উঠেছে। শোঁ শোঁ বইছে বুনো হাওয়া—মানাবন কাঁপছে থর থর। কি-এক বিভীষিকা দেখার রাত। আধারের বুক থেকে জেগে উঠেছে বালুচরে পোঁতা কত নিশ্চল মৃতের দল। নীলে হাড়ীর মুণ্ডুটা যেন সজীব হয়ে উঠেছে—হাসছে হা হা করে কি এক পৈশাচিক উল্লাস।

এই পথে কত রাতে কত বুকফাটা আর্তনাদ উঠেছে—আবার মুছে গেছে রাতের অন্ধকারে। আজও ওঠে—অসহায় বুকফাটা কান্নার ক্ষীণ ধ্বনি।

—চুপ কর।

গর্জে ওঠে আবছা অন্ধকারে গোবরা। মুখবাঁধা দেহটাকে নিয়ে রাতের আঁধারে নদী পাড়ি দিয়ে কূলে এসে পৌছল তারা। জ্ঞানহীন দেহটা

দাপাচ্ছে থেকে থেকে। কাজ হাসিল করে ফিরছে গোবরা।

—অ্যাই! গর্জন করে ওঠে মদমত্ত কণ্ঠে কোন দানবাত্মা। ভাসানী যেন স্বপ্ন দেখছে। আবছা আলোয় ঘরটা রাঙ্গা হয়ে উঠেতে। কাঁপছে ভাসানী এক কোণে দাঁড়িয়ে। কন্দর্পবাবুর কন্থস্বরে জড়তা।

—এগিয়ে আয় এগিয়ে আয় ইদিকে—লজ্জাবতী লতা এসেছেন।

রুদ্ধকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে ভাসানী—ওর হাতের কঠিন বাঁধন ছাড়াবার চেষ্টা করে; প্রবল আকর্ষণে টানছে তাকে কন্দর্পবাবু; আছড়ে পড়ল ভাসানী ওর পায়ে উপর।

— আমি ভাসানী, বিমলার মেয়ে।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কন্দর্পবাবু চমকে ওঠে।

—বিমলা! সামনে যেন সাপ দেখেছে কন্দর্প—বিমলার মেয়ে তুই?

— হ্যাঁ! কালীপুরের বিবলা—

কাঁপছে, কাঁদছে ভাসানী। যে পরিচয় এতদিন গোপন করেছিল সকলের কাছে, ওর শ্বাপদ লালসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আজ সেই পরিচয়ই দিয়ে বসলো, বাঁচবার অন্য কোন উপায় না দেখে।

রাতের আঁধার ফাটিয়ে বজ্রনাদে একখানা ট্রেন ছুটে গেল।

কন্দর্পবাবু যেন স্বপ্ন দেখছে। অতীতের শ্যাম উপবন ঘেরা যৌবনের প্রথম বসন্ত বেলা; পাখীডাকা রাত্রি। বিমলাকে ভালবেসেছিল কিন্তু ব্যর্থ সে প্রেম। জমিদারের বংশের সন্তান—সামান্য একজন ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না; করেনি। বিমলা সন্তানবতী অবস্থায় গৃহ ত্যাগ করে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল ওই চরভূমিতে। নিতাই ঘোষ ওই কুড়িয়ে পাওয়া এইটুকু মেয়েকে মানুষ করে নিজের মেয়ে বলেই পরিচয় দিয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণের বংশে—ব্রাহ্মণের রক্তে জন্ম। ভাসানীর জীবনে এটা একটা স্মৃতিকণ্টক! নিজেকে তাই সব ভোগ থেকে সে সরিয়ে রেখেছিল। ব্রজকে ফিরিয়েছে কতবার।

আজ কন্দর্পের চোখের সামনে সেই বিমলা যেন মূর্তি ধরে এসেছে এই স্তব্ধ রাত্রির গভীরে সেদিনের প্রশ্নের কৈফিয়ৎ চাইতে! কোণে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে দেখছে ভাসানী—একটা জানোয়ারের সামনে এসে পড়েছে।

মদের নেশা ছুটে গেছে কন্দর্পবাবুর। কি এক ঘৃণ্য নারকীয় পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোন যমদূত। নিজেরই সন্তান—আজ তাকে তুলে নিয়ে এসেছে পিশাচের দল তাকেই উপঢৌকন দিতে ভোগের বস্তু হিসাবে। এতবড় পশু হয়ে উঠেছে কন্দর্প আচাই!

লজ্জায় অপমানে গর্জন করে ওঠে কন্দর্প—গোবরা!

দরজার বাইরেই ছিল। ভাল বক্‌শিশ মিলবে। উল্লসিত মনে ঢুকলো গোবরা; উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বক্‌শিশের লোভে হাজির হল—হুজুর!

ওপাশের চাবুকখানা তুলে নিয়ে এগিয়ে আসে কন্দর্পবাবু।

—শয়তান! · গর্জন করে ওঠে কন্দর্প। শঙ্কর মাছের চাবুকটা তীক্ষ্ণাঘাতে আছড়ে পড়েছে গোবরার পিঠের উপর, কেটে বসেছে চামড়ায়—বিন্দু বিন্দু রক্ত জমে ওঠে ক্ষতমুখে। আর্তনাদ করছে গোবরা।

নিরন্ধ্র রাতের অন্ধকারে কার কান্নার সঙ্গে ওর নিষ্ঠুর আর্তনাদ মিশে গেছে একাকার হয়ে। পাষাণপুরীর নিদ্রা টুটে যায়—ধড়মড় করে উঠে বসেছে বাসন্তী, জানলার সার্সিগুলো দুমদাম করে আছড়ে পড়ে দমকা হাওয়ায়! নীচে থেকে ওর আর্তনাদ—ভাসানীর কান্না শোনা যায়।

গুমরে গুমরে উঠছে সেই অশরীরী আর্তনাদ। সারা বাড়ীতে কে যেন কাঁদছে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে বাসন্তী। শরীরের সমস্ত রোমকূপ ভয়ে সোজা হয়ে উঠেছে।

উঠে দাঁড়াল গোবরা। ওর দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কন্দর্পবাবু; উত্তেজনায় রাগে হাঁফাচ্ছে। ওপাশে ভাসানী দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। হুকুম করে কন্দর্প গোবরাকে,

—দূর হয়ে যাবি তুই, আজই—এখুনিই। কাল যদি ভুবনপুরের এলাকায় দেখতে পাই তোকে, জ্যান্ত পুতে ফেলবো। যা—

লাথির চোটে ছিটকে পড়ে বাইরে। পিঠ ফেটে গেছে। রক্তের দাগ কাপড়-চোপড়ে।

মানবের ঘুম ভেঙ্গে যায় একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। কে অসহ্য বেদনায় আর্তনাদ করছে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো—অন্ধকারে কান্নাটা গুমরে উঠেছে। বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে থাকে। অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে। বাসন্তী বের হয়ে আসে।

—মানব যাস্‌নি, যাস্‌নি।

মানব এগিয়ে গেল নীচের দিকে—বাসন্তীও ছেলেকে বাধা দেবার জন্য পিছু পিছু চলেছে।

একতলার কোণের ঘরের দরজাটা খোলা—অন্ধকার দালানে এসে পড়েছে এক ঝলক আলো—হঠাৎ একটা কালো ছায়ামূর্তি ছিটকে পড়লো ঘর থেকে বারান্দায়, উঠেই মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

—মানব।

বাসন্তী মানবকে ধরে ফেলেছে। প্রাণপণে বাধা দেয়—স্বামীর এই নারকীয় বীভৎসতা ছেলের কাছে প্রকাশ পাক এটা চায় না বাসন্তী।

—ফিরে আয়।

—না। একটা বোঝাপড়া হোক।

ঘরের ভিতর থেকে কান্নাটা শোনা যায়, অস্ফুট আর্তনাদ করছে অসহায় কোন নারী।

হঠাৎ ঘরেব মধ্যে মানবকে ঢুকতে দেখে চমকে ওঠে কন্দর্পবাবু. হাতে সেই চাবুকটা তখনও রয়েছে—লাথি মেবে ছিটকে বাইরে ফেলেছে গোবরাকে—সেই সময়েই ঝড়ের মত বেগে ঢুকেছে মানব।

পিছু পিছু বাসন্তীও। ভাসানী হাতবাঁধা অবস্থাতেই ছুটে এসে বাসন্তীর পায়ের কাছে পড়ে - কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে তার দেহ। পাথরের মেঝেতে মাথা ঠুকছে ঠক্ ঠক্ করে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে কন্দর্পবাবু। স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘর—ওর মাথা ঠোকার শব্দ কান্নার সঙ্গে মিশে ঘরের পাথরে গুমরে ওঠে।

—মানব! বের হয়ে যাও ঘর থেকে।

—না। ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

—সেটা আমি বুঝবো। যাও তোমরা।

বাসন্তী স্বামীর দিকে চেয়ে মাথা নামাল—ধীরে ধীরে বের হয়ে এল ঘর থেকে।

—মানব চলে আয়! ডাকল বাসন্তী। স্বামীর সর্বনাশা রাগকে সে হাড়ে হাড়ে চিনেছে।

—তুমি প্রশ্রয় দিতে পারো—আমি দোবনা মা।

—প্রশ্রয়! আমার পরিচয়—টাকা, তোমার দরকার—তোমার প্রশ্রয় দেবার কথাই ওঠে না।

—না। প্রতিবাদ করে ওঠে মানব দৃঢ় গম্ভীর শব্দে।

—তোমার টাকা, তোমার পরিচয় সব কিছু অস্বীকার করেই আমি এ বাড়ী থেকে যাচ্ছি। আজ তার সব শ্রদ্ধা-ভক্তি-কর্তব্যবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওই অত্যাচারী দানব তার বাবা—তার অর্থে তার ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে একথা ভাবতে গেলেও ঘৃণায় মন ভরে ওঠে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কন্দর্পবাবু; বাসন্তী কাঁদছে—তাদের সামনে দিয়ে মানব চলে গেল আজ।

—মানব! বাসন্তী আর্তনাদ করে ওঠে।

—বাধা দিও না ওকে। ও যাক।

কন্দর্পবাবুর চোখের উপর কি যেন নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে। ভাসানী স্তব্ধ আতঙ্কবিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওদের দিকে। মানবের তেজদৃপ্ত মূর্তিটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাসন্তী কাঁদছে—দূরে শোনা যায় তার কান্নার শব্দ, ক্রমশঃ আরও দূরে মিলিয়ে গেল সেটা; নিজের কারাগারে ফিরে গেছে ব্যর্থ মাতৃহৃদয়ের বেদনা নিয়ে বাসন্তী।

কন্দর্পবাবু চেয়ে আছে ভাসানীর স্তব্ধ-ভীত বিবর্ণ মূর্তির দিকে। একটা ঝড় বয়ে গেছে। বিকৃতস্বরে কন্দর্পবাবু গর্জন করে ওঠে—

—তুমি ছবির মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও লোকের কাছে বলে বেড়াও গে—ভুবনপুরের কন্দর্প আচাই-এর কীর্তি।

ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে কন্দর্পের মুখে। কথা কইল না ভাসানী। মুখ তুলে চাইল। এতদিন যাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করেছিল, পরম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল, আজ তাকেই এত নীচে নামতে দেখে দুঃখই হয়।

জবাব দেয় ভাসানী।

—না, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না। ছিঃ ছিঃ, এত নীচে মানুষ নেমে যায় তা জানতাম না! মা বলতো—আপনি মানুষ নন, শয়তান। নইলে আজ আমাকেও—

—চুপ করো! ওর কথা থামিয়ে দেয় কন্দর্পবাবু। মনের ভিতর কেমন সব গোলমাল হয়ে আসে; ওরা সকলেই ঘৃণা করে তাকে। কৃমিকীটের মত পরিত্যাজ্য করে রেখেছে, অস্পৃশ্যের মত আতঙ্কে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ভুবনবাবু, স্ত্রী বাসন্তী, মানব, সকলেই তাকে পরিহার করেছে—অবহেলা কার গেছে। ওই জারজ সন্তান ভাসানীও তার জন্য দুঃখ বোধ করে, লজ্জা পায়, ঘৃণা করে! ওর জন্য এত ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত সারা মনে।

হাসছে কন্দর্প আচাই—উদ্দাম হা হা হাসি। বুকের সমস্ত জ্বালা জুড়োবার জন্যই মদের বোতলটা ঢেলে দেয় গলার কাছে। বুকের জ্বালা আর মদের জ্বালা মিশে একটা অসাড় চেতনাহীন অবস্থা আসে সারা মনে।

—যাও। দূর হয়ে যাও সামনে থেকে। কোনদিন একথা আর প্রকাশ করোনা—যদি বাঁচতে চাও।

ভাসানী কথা বললো না—ঘৃণা ফুটে ওঠে তার দু'চোখে।

—এ আমার খুব গৌরবের পরিচয় নয়। সব শ্রদ্ধা-ভক্তি আমার হারিয়ে গেল—মিছে স্বপ্ন দেখেছিলাম অনেক কিছুর।

…চমকে ওঠে কন্দর্প ; সারা শরীরে হিমপ্রবাহ বয়ে যায় ! মানব—মানবও ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছিল।

কন্দর্প আচাই—স্বামী-সন্তান-পিতা, মানুষের এই তিন স্বাভাবিক অধিকারেরও যোগ্য নয়।

কি যেন বলতে যায় কন্দর্প—ভাসানী তার আগেই বের হয়ে গেছে ঘর থেকে। কম্পিত পদক্ষেপে ঘরময় দরজা খুঁজে বেড়ায় কন্দর্প—মদ্যপ লম্পট সর্বধ্বংসী কন্দর্প আচাই।

আবছা ফিকে কুয়াসার আবরণে ঢেকে গেছে চারিদিক। অন্ধকার আকাশে কোথাও এতটুকু তারার সন্ধান নেই। ভুল করে ঊষর প্রান্তরে কোথাও ডাকছে পাখী—একটা হুডার হিংস্র নীল চাহনি মেলে দূর থেকে তাকে দেখছে। এগিয়ে চলেছে মানব স্টেশনের দিকে।

সারা মনে ঝড় বইছে—এক রাত্রির মধ্যেই জীবনের দর্শন তার নিষ্ঠুর আঘাতে বদলে গেছে। দাদুর বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে—মায়ের অঝোর কান্নাভরা বেদনায় যে সত্য প্রকাশিত হয়নি, নিজের চোখে দেখা সেই নিষ্ঠুর ঘটনা তার দৃষ্টি বদলে দিয়েছে। মুছে গেছে সব দুর্বলতা—কর্তব্য। কত কান্না—রক্তমেশা ওই বংশ পরিচয় আজ বোঝার মত চেপে বসেছে তার বুকে—দমবন্ধ হয়ে আসে।

…স্টেশনে উঠে দেখে ফেলে আসা দিগন্ত আগুনের শিখায় ভরে উঠেছে। পুড়ছে মানাচর ; পুড়ক—ওই বেড়া আগুন এসে লাগুক ভুবনপুরের গাঁয়ে। সব সংস্কার পাপ—কালিমা পুড়ে ছাই হোক অগ্নিস্পর্শে।

…মানবের মনে ওই আগুনের ছোঁয়া—তার সব দুর্বলতা-মোহ পুড়ে যাক। আজ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে তাকে—পিছনের সব পরিচয় অমনি দিগন্তজোড়া আগুনে পুড়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে।

দোতলার জানলা থেকে দেখা যায় লাল লকলকে আগুনের শিখা ; চরের দুর্ভেদ্য শুকনো মানাবনে আগুন লেগেছে। রাতের বাতাসে দূর থেকে ভেসে আসে কাদের কণ্ঠস্বর—আর্তনাদ। বাসন্তী দাঁড়িয়ে দেখছে জানালা থেকে। ধ্বংসমুখী নদী বন্যার গ্রাসে সব খেয়েও নিষ্কৃতি দেয়নি, আবার শুরু করেছে তার তাণ্ডব লীলা।

ব্রজ ধড়মড় করে উঠে দেখে ঘরের বাইরে আশেপাশে আগুন জ্বলছে। আর্তনাদ করে গোয়ালে বদ্ধ অবস্থায় গরুগুলো—দাপাদাপি করছে। রাতের অন্ধকারে কে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

…—জল ! জল ! কারা চেঁচাচ্ছে।

…রুদ্ধশ্বাসে বের হয়ে আসে ব্রজ—অনেকেই কুয়ো থেকে জল টেনে তুলছে; কিন্তু প্রলয়রূপী আগুনের সামনে পড়তে,—পড়তেই সামান্য জল বাষ্পাকারে মুছে যাচ্ছে।

নদীতে জল নেই—একটু যা আছে তাও মাইলখানেক দূরে। বালি ভেঙ্গে ভেঙ্গে সেখান থেকে জল এনে এই বেড়া আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। বালি—ঝুড়ি ঝুড়ি বালি ছুড়ছে আগুনে। লক্ লক্ করে ওঠে শিখা।

—ভাসানী! ব্রজ ওই কোলাহলের মধ্যে ভাসানীকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। হু হু করে জ্বলছে আগুন।

দিগন্তপ্রসারী বিন্না মানা ঘাস রোদে শুকিয়ে বারুদের স্তূপের মত হয়ে আছে, বেড়া আগুন ঘিরে ফেলছে তাদের ক্রমশঃ, পালাবার পথও থাকবে না।

গরুগুলো পাগলের মত দৌড়ঝাঁপ করছে -হঠাৎ কার আর্তনাদে ভরে ওঠে চারিদিক—একটা গরু শিং দিয়ে কাকে পেড়ে ফেলেছে। আহত লোকটা হাত দিয়ে ক্ষতমুখ চেপে ধরে আর্তনাদ করে পালাবার পথ খুঁজছে, কিন্তু পথ নেই, বেড়া আগুনে ঘিরে ফেলেছে চারিদিক! চোখেমুখে ওর নিশ্চিত মৃত্যুর লালাভ ভীষণ ছায়া।

—পালা, যেদিকে পারিস পালিয়ে যা চর থেকে।

বাঁধের উপর উঠে গোবরা শেষবারের মত চেয়ে থাকে মানাবনের দিকে। দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠেছে। হা হা করে হাসছে গোবরা—নে পড়ে মর শালারা। ঝাঁইপোড়া হয়ে মর।

এক দেশলাইকাঠির এত বড় প্রতাপ তা নিজেই সে কল্পনা করতে পারেনি। নাকমুখ পিঠ দিয়ে তখনও ঝরছে চাবুকের ঘায়ে ঝরে পড়া রক্ত—হা হা করে হাসছে নিষ্ঠুর রাতের লাল আভামাখা অন্ধকারে।

ভাসানী কন্দর্প আচাইএর ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসছিল, বাঁধের নীচে এসেই থমকে দাঁড়াল। তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। মানাচিরে আগুন লেগেছে—পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার অতীত—বর্তমানের সমস্ত নিষ্ফল সঞ্চয়। দামোদরের নিষ্ঠুর বন্যা যা পারেনি এই আগুন তাই পেরেছে। নিঃশেষে মুক্তির ইসারা এনেছে তার মনে। ভাসানীর পরিচয়—বংশগৌরবের মোহ কেটে গেছে। নিতাই ঘোষের মেয়ে—এই পরিচয়ই তার বড়; শয়তানের জারজ সন্তানের গৌরব তার মন ঘৃণায় ভরে তোলে।

সমাজ ও ধর্মের সমস্ত আশ্রয় তার হারিয়ে গেছে। মনে মনে পরম নির্ভর আশ্রয় ভেবে এসেছিল যাকে সেই কন্দর্প আচাই-এর ধ্বংসমূর্তি দেখে হতাশ হয়েছে সে। লজ্জায় কালোমুখ আর দেখাতে পারবে না এমাটিতে। নিদারুণ

আঘাত বেদনা তাকে সব শোকদুঃখ সহ্য করবার মত পাথর করে তুলেছে।

—তুই!

ব্রজ এগিয়ে আসে। দূর আঁধারের বুকে আকাশছোঁয়া লাল আগুনের আভায় ব্রজের দিকে চেয়ে থাকে ভাসানী, মুখে দেহে কাপড়-চোপড়ে ছাই। ঘেমে নেয়ে উঠেছে ব্রজ।

—সব চলে গেল ভাসানী। ব্রজের কণ্ঠে যেন আর্তনাদ ফুটে ওঠে। অন্তরের দিক থেকে ভাসানীর যা গেছে তায় তুলনায় চরের সম্পত্তি সামান্য। সে সব হারিয়ে ভাসানী আজ স্থির হয়ে আছে।

--যাক্। ছোট জবাব দেয় ভাসানী।

--কোথায় যাবো? ব্রজের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা।

—যেদিকে দু'চোখ যায়। এমাটিতে আর নয়। এখানে বিষ ঢুকেছে। পাপের বিষ, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল ব্রজ। আজ নিজেকে নিঃশেষে সে সমর্পণ করে ব্রজের হাতে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ব্রজ ভাসানীর দিকে। সে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে ব্রজ এতদিন প্রতিটি পল অনুপলে, সেই পাওয়া আজ স্বেচ্ছায় তুলে দিতে আসে ভাসানী। ভাসানী বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। নিবিড় নিষ্পেষণে জড়িয়ে ধরে ব্রজকে—হু হু কান্নায় ফেটে পড়ে তার মনের সঞ্চিত অপমান—ব্যর্থতার আঘাতের বেদনা।

—ভাসানী! ··ব্রজ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

অশ্রুভেজা কণ্ঠে ভাসানী বলে ওঠে—আমার আজ ঘরে বাইরের সব হারিয়ে গেছে ব্রজ।

ভাসানীর আজ ব্রজকে মেনে নিতে কোন বাধাই নেই। মনের কোণে মিথ্যে আশার স্বপ্ন দেখেছিল সে—ব্রাহ্মণের রক্তে জন্ম তার। কিন্তু সেই সমাজ—সেই কাপুরুষ জন্মদাতা তাকে অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, চরম অপমান করেছে তার। সেই সমাজের উপর—মানুষের উপর সব শ্রদ্ধা হারিয়ে আজ ভাসানী বানে ভাসা জীবের মত সামনেই ওই ব্রজকেই আশ্রয় করতে চায়। বাঁচতে চায় সে নিজের দাবীতে।

·· চরের আগুন তখনও জ্বলছে; আগুনের প্রচণ্ড তাপে ক্ষেপে উঠেছে বাতাস। ঝড় বইছে, উড়ছে বালি।

ম্লান হতে ম্লানতর দেখায় আগুনটা দূর চড়াই-এর উপর থেকে। দিগন্তের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আগুনের স্রোত নেমেছে—আদিম পৃথিবীর অন্তর থেকে জ্বালা উঠছে। হু হু তীব্র জ্বালা। ভাসানীর সব মিথ্যা সংস্কার

পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ ব্রজকে ফিরে পেয়েছে, বহু মিথ্যার বদলে একটি সত্যকে নিবিড় ভাবে অনুভব করেছে।

কন্দর্পের চেতনা ফিরে আসে ভোরের দিকে। ঘরের মেজেতেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলো সে সারারাত; মাথাটা ঝিমঝিম করছে। গতরাত্রের ঘটনাটা স্বপ্নের মত আবছা মনে পড়ে। কি যেন নিদারুণ বৃশ্চিকজ্বালার মত জ্বালিয়ে দেয় সারামন।

বিমলা! বিমলাকে মনে পড়ে। পায়ে ধরে কেঁদে গেছে অতীতের সে—তোমার এতবড় বাড়ীর এক কোণে একটু ঠাঁই দাও, ঝিয়ের মত থাকবো, শুধু যে আসছে তাকে বাঁচতে দিও।

বিমলার সব কান্না আজও যেন গুমরে ফেরে শূন্য মনের অতলে। বিমলাকে দূর করে দিয়েছিল, নিজের জীবনের প্রথম বসন্ত দিন কেঁদে ফিরে গেছে। আজও মনের অতলে সেই হাহাকার নোতুন করে জেগে ওঠে।

বিমলার কান্নার দাম সে দেয়নি। তারই মেয়েকে ধরে এনেছিল চরম অপমান করবার জন্য! কিন্তু!!

—বাবু! বড়বাবু!

ডাকছে অভা—চরের সব কারা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে বাবু।

চরের বুকে আগুন! ভাসানী! নিতাই ঘোষের খাজনাকরা এলাকা, তারই জমিদারী! সেখানে কে আগুন দেবে?

চমকে ওঠে কন্দর্প! ভাসানীর জন্য আজ দুঃখ হয়। তার কাছে ক্ষমা চাইবে—আবার প্রতিষ্ঠিত করবে তাকে জীবনে। দরকার হয় সব পরিচয়ই দেবে। বেদনাহত মন একটু স্নেহ প্রীতির কাঙ্গাল আজ।

—চল। হ্যাঁরে ছোটবাবু কোথায়?

—রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে গেছে।

—ও! কথা বললো না কন্দর্প। চারিদিকে কেবল ভুল আর বঞ্চনা। একত্রে সব কিছু আঘাত এগিয়ে আসছে তার দিকে।

শূন্যপ্রায় চর অসীম নিঃস্বতায় খাঁ খাঁ করছে। যতদূর চোখ যায় কেবল কালো ছাই; মানাঘাসের শিকড়গুলো জেগে আছে মাত্র; দূরের দিকে তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন। কতকগুলো শকুন শিয়াল এসে নেমেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে এসেছে কুকুরগুলো; ধারাল নখদাঁত দিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে বিকৃত দেহগুলো। থানা থেকে দারোগা এসেছেন কয়েকজন

লোক নিয়ে। দু'একটা মৃতদেহও পাওয়া যায়; চেনা যায় না তাদের। মেয়ে মানুষের দেহও তুলেছে কয়েকটা ছাইগাদা থেকে। পুড়ে বিকৃত-কালো হয়ে গেছে।

—আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

দারোগার প্রশ্নে কন্দর্পবাবু মুখ তুলে চাইল শূন্যদৃষ্টিতে। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো সে।

- কি করে বলি?

বাসন্তী স্বামীর দিকে এগিয়ে এল। কালো ছাইলাগা কাপড়-চোপড়—কন্দর্পর মাথার চুলে জমেছে বাতাসে উড়ে আসা গুঁড়ি গুঁড়ি ছাই।

—শ্মশান থেকে ফিরলে নাকি? প্রশ্ন করল বাসন্তী।

কথা কইল না কন্দর্প, কে জানে কার শেষ চিতাভস্ম তার সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে। শিউরে ওঠে সে।

কে যেন আঁধারের বুক থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আজও। চোখ মেলবার সাহস নেই তার।

—জানালাটা বন্ধ করে দাও। আর্তনাদ করে ওঠে কন্দর্প।

চরের অসীম নিঃস্বতা দেখা যায় জানালা থেকে—নদীর রূপোলী বালিয়াড়িতে। শ্মশান ভৈরবদল নেমেছে। হু হু আসছে অগ্নিগর্ভ বাতাস। বুক জ্বলে যাচ্ছে। ওদিকে চাইতে ভয় পায় কন্দর্প।

জানালাটা বন্ধ করে দিল বাসন্তী।

স্বামীর দিকে চেয়ে আজ বাসন্তীর মনে হয় দেহমনে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চোখেমুখে তার হতাশার নিবিড় ছায়া।

—একগ্লাস জল দেবে বড় তেষ্টা পেয়েছে।

·· কন্দর্পবাবু যেন হার মানছেন ধীরে ধীরে।

এর পর আর কলকাতাতেও থাকতে পারে না মানব।

টুনুবৌদি ওকে বাড়ী থেকে ফিরতে দেখে অবাক হল। মনে হয়, সারা দেহমনে একটা নিদারুণ ঝড় বয়ে গেছে।

—চলে এলে ঠাকুরপো?

—হ্যাঁ।···

টুনুবৌদি সন্ধানী চোখে কি যেন দেখছে—কি হয়েছে বলো ত?

—কিছু না।

—মানব! টুনুবৌদির ওই চাউনির সামনে মানব এতটুকু হয়ে যায়। স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, ওই রূপ আর তীব্র সে চাউনি। বেদনাহত কণ্ঠে বলে ওঠে মানব।

—তোমাকে বলা যায় না বৌদি। অতি নোংরা সে ব্যাপার। বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেই এলাম। মা প্রতিবাদ করতে পারেননি। কিন্তু আমার সহ্য হ'ল না।

চুপ করে গেল টুনুবৌদি। কিছু কিছু সেও শুনেছে এ সম্বন্ধে। মানবের মত বিদ্রোহী সন্তান এর প্রতিবাদ করবে সেটা স্বাভাবিকই।

হতাশা ভরা কণ্ঠে বলে মানব।

—আজ আমার কিছুই নেই বৌদি। আমার ভবিষ্যতের পথও বন্ধ করে এসেছি।

…টুনুবৌদি ওর পিঠে হাতখানা রাখল—শান্ত-নিবিড় স্পর্শ। মানব ওর দিকে চেয়ে থাকে—জীবনে এমনি কোন স্নেহস্পর্শ সে পায়নি।

টুনুবৌদি বলে ওঠে।

—তুমি পড়বে মানব। বিলেতই যাবে।

—টাকা? নিজের বলতে মাত্র কয়েক হাজার।

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আশ্বাস দেয় টুনুবৌদি। মানবকে দেখে কি যেন সমবেদনায় মন ভরে ওঠে। মানব বলে ওঠে।

—সেই ভাল বৌদি। দেশছাড়াই যখন হলাম এ মায়াই বা কেন আর!

সে আজ কয়েক বছর আগেকার কথা। টুনুবৌদিকে ভোলেনি মানব। দূর বিদেশ থেকে চিঠি আসে। টুনুবৌদি আজ যেন মাঝে মাঝে দেখতে পায় কলেজ থেকে ফিরছে একটি তরুণ—চোখেমুখে তার প্রতিভার দীপ্তি। মনের কোন অতলে আপনজন বলে মেনে নিয়েছিল।

…কিন্তু সেই আবছা স্মৃতি কেমন জট পাকিয়ে যায়। স্বামীকেও মনে পড়ে একটু একটু। বোম্বাই-এর বিখ্যাত ডাক্তার। টাকাকড়ি মাঝে মাঝে পাঠায়—মাঝে মাঝে দু'একছত্র চিঠি—সামান্য কুশল সংবাদ নেয় মাত্র। ওদিকে টুনুবৌদিরও কোন কৌতূহল নেই। অন্যান্য জায়েরাও বলে মাঝে মাঝে।

—ধন্যি মেয়ে যাহোক। হাজার হোক স্বামী, একবার চোখেও দেখবে না?

—না। টুনু জবাব দেয়।

—কারো দয়া কুড়িয়ে বাঁচতে চাইনা আমি। টুনু সেই নিদারুণ অপমানটা ভোলেনি। হৃদয়হীন সেই অবহেলা।

…এতদিন বাড়ীতে এ কথা নিয়ে কেউ বলতো না! দিদিমা মারা যাবার পর জায়েরা এক আধটু আলোচনা শুরু করেছে। টুনুবৌদিও পথ ঠিক করে—দেশের বাড়ীতে থাকবে গিয়ে। কারো গলগ্রহ হয়ে থাকবে না সে।

জায়েরা যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়।

মানবকে এ সংবাদটা লেখে না—হয়তো কিছু ভাববে সে।

নিজের পথ নিজেই বেছে নেবে টুনু—প্রতিবাদ যখন করেছে করবেই।

টুনুবৌদির সহজ স্বাভাবিক মেলামেশাটাও আজ ওরা বিকৃতচোখে দেখে। এতদিন শ্বাশুড়ী সব আঘাত থেকে টুনুকে আগলে রেখে ছিল, এবার ওরা যেন তার দোষ ধরতেই ব্যস্ত।

বড়জা আড়ালে মন্তব্য করে—খুকুর মাস্টারকে কাল কি বলছিল না টুনু ও মেজ? বেশ আলাপও জমিয়েছে ওর সঙ্গে, দেখেছিস?

মেজবৌ পাথরের মেজেতে বিপুল দেহখানা গড়াগড়ি দিতে দিতে বলে—কি আর বলবো দিদি, কয়েক বছর আগেই দেখনি মানবকে নিয়ে কি আদিখ্যেতা। সোনার চাঁদ ছেলে, তাকে নিয়ে নাচানাচি। যাক, বাছা বিলেতে গিয়ে যেন বেঁচেছে।

—ওই ওর স্বভাব। নইলে বামুনের ঘরে এমন সতীন থাকে বৈকি—যাবে না। এক গোঁ।

টুনু জানে—এমনিতর আলোচনা তাকে নিয়ে হয়। দিনরাত বই পত্র নিয়েই আছে সে, ওদের সঙ্গে বড় একটা মেশেও না। মাঝে মাঝে মানবের কথা মনে পড়ে। মানব তবু বড় হোক—তার মুখ থাকবে।

কয়েকটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। জমিদারির মধ্যস্বত্ব জোত চলে যাচ্ছে। চার বছরের বকেয়া খাজনা জমিদারের বাকী। সরকার নিয়েছে হালসন থেকে। কালীপুর মৌজাও বেহাত হয়ে গেল চীনামাটির জমিটুকু ছাড়া। কৃপাল সিং বাকী চারসনের খাজনা মিটায়নি—আজও গড়িমসি করছে।

আগে হলে কন্দর্পবাবু কবে আদায় করে নিত—কোথায় মনের অতলে একটা আঘাত তাকে মুষড়ে দিয়েছে।

একটি রাত্রি কথা আজও ভোলেনি কন্দর্প। মানব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাজের জবাব চাইছে। আজ মনে হয় বাঘের বাচ্চা বাঘই। তার উপর টেক্কা দিয়েছে।

কিন্তু মানব আর ফিরে আসেনি। সে আজ কয়েক হাজার মাইল দূর বিদেশে। বাসন্তীকে চিঠি দেয়। টাকা পয়সা পাঠাতেও নিষেধ করেছে।

—টাকা সে নেবে না বুঝলে। কন্দর্প জবাব দেয়।

—না গো না। মানব তেমন ছেলেই নয়। সব ঠিক হয়ে যাবে, ফিরে আসুক তো। ফিরতে আর দেরী নেই। ভালভাবে পাস করেছে। ছেলের গর্বে মায়ের বুক ভরে ওঠে।

কন্দর্প কি ভাবছে! এত সহজে ফাঁক বুঝবে না। এ পার্থক্য অনেকখানি। কাজ কমে আসছে। জমিদারির চিন্তা থেকে রেহাই দিয়েছে সরকার—রাতাবিরেতে সেই দুর্দাম জীবন, ওয়াগন লুটের কাজকর্মও চলে না। পুলিস গুলি চালাতে শুরু করেছে।

হাত গুটিয়ে বসে আছে কন্দর্প আচাই। রঙের মাতন কমে গেছে। তন্ত্রসাধনা! আজ মনে হয় কোথায় যেন মস্ত একটা ভুল রয়ে গেছে। মাত্র কয়েকটি অক্ষর মন্ত্র আর চিত্রবিচিত্র বর্ণের ছক—কতকগুলো প্রক্রিয়াতেই সমস্ত ষড়ঐশ্বর্য মেলে—সেগুলো কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না।

নইলে সে আজ বিপর্যস্ত হতে চলেছে কেন!

উদ্দাম নেশা আর সব-ভোলানো মত্ততার মাঝে শক্তিসাধনার স্বপ্ন দেখে কন্দর্প। নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে অদেখা সেই খুঁতগুলো ধরে সাধনায় ডুবতে চায়—অণিমা লঘিমা ইত্যাদি ষড়ঐশ্বর্য পেতেই হবে তাকে।

মানব ফিরে আসছে। বিলেতে বসেই টুনুবৌদির চিঠিখানা পায়; দেশের বাড়ী থেকে লিখছেন বৌদি—বিশেষ কাজে এখানেই আছি, থাকবোও। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না মানব। কোথাও যেন একটা গণ্ডগোল বেধেছে। দীপার চিঠিখানাও হাতে আসে।

মিঃ ব্যানার্জি বসন্তবাবুকে কথাটা আগে থেকেই বলে রাখেন—

—মানব ফিরলেই যাতে শুভকাজটা হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করো তুমি। বসন্তবাবু সহকর্মীকে বন্ধুর মত ভালবাসেন; মিঃ ব্যানার্জিকে দরকার, মানবের একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থাও করবেন তিনি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার করে বলতে পারেন না বসন্তবাবু—মানবের বাবাকে কথাটা জানানো দরকার। তাঁর মতামত চাই তো।

—শিওর! মিঃ ব্যানার্জিও সায় দেন তাতে—চলনা একদিন যাই ওঁর কাছে। একটি মাত্র মেয়ে বসন্ত—মেয়ের বাপ হলে বুঝতে কি দুশ্চিন্তা। চল একদিন দেখা করে আসি ওর বাবার সঙ্গে।

এই কাজটিকে এড়াতে চান বসন্তবাবু। ভগ্নীপতিকে চেনেন—কি মেজাজে কখন থাকে জানার উপায় নেই, একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে দেরী হবে না। বলে ওঠেন –এত ব্যস্ত হবার কারণ নেই। মানব ফিরুক আগে তারপর কথাবার্তা হবে। তাছাড়া আজকালকার ছেলেমেয়ে—তাদের মতামতও দরকার।

হাসেন মিঃ ব্যানার্জী—তার জন্য ভাবনা নেই বসন্ত। দে আর নট ইন্ আওয়ার এজ।

দীপার সম্বন্ধে মানবের অমত হবে না—তা তিনিও অনুমান করেন।

বসন্তবাবু কি ভাবছেন। নিজের একটি সন্তান সেও অর্থবান। তিনিও আজীবন চাকরি আর অর্থ উপার্জন করে গেলেন। কিন্তু ছেলে বৌ নিয়ে সংসার তার হল না। দুজনে রয়ে গেলেন দু দিকেই। ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। একটু ভুলই করেছেন তিনি। আজ বয়সের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয় জীবনের একটা দিক শূন্যই রয়ে গেছে। ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া—মনোমত সঙ্গী বেছে দেবার দায়িত্বও রয়েছে পিতামাতার; কিন্তু ঈশ্বর সেসব দিক থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করেছেন।

—কাকামণি! কই খাচ্ছেন না যে।

দীপা ইতিমধ্যে কখন এসে পৌঁছেচে—বারে! কেকগুলো আমি নিজে হাতে বানিয়েছি—খান।

—এই যে মা। বসন্তবাবু যেন এই জগতে ফিরে আসেন। আধুনিকা ধনী বাপের মেয়ে হয়েও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য হারায়নি দীপা। সামান্য প্রসাধনেই অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে। মানবের মুখটা অকারণেই ভেসে ওঠে মনে।

—আমাকে একটু বেরুতে হবে ব্যানার্জি।

দীপা এগিয়ে আসে—বেশতো' কফি খেয়ে নিন, আমিই আপনাকে লিফ্‌ট দিয়ে আসবো।

চমকে ওঠেন বসন্তবাবু—তুমি ড্রাইভ করবে?

—কেন—ভয় হচ্ছে নাকি কাকামণি! জানেন ছ'বছর গাড়ী চালাচ্ছি, আজও কোন অ্যাকসিডেন্টই করিনি।

দীপার কথায় বলে ওঠেন বসন্তবাবু—তাই কি আজ বেরুবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো? বানার্জি বসন্তবাবু দুজনেই হাসতে থাকেন।

দীপা সবদিক থেকেই মানবের যোগ্য; বসন্তবাবুরও খুব ইচ্ছা, কিন্তু কতক-ক্ষেত্রে তিনি নিরুপায়। একবার চেষ্টা করে দেখবেন মাত্র।

ঘরে বাইরে আঘাত—অপমানে জর্জরিত মানুষটি তিলে তিলে নিজের অতলে ডুবেছে। অন্ধকার অতল সে ঠাঁই। পরিত্রাণের আশায় গুরু জুটেছে।

পঞ্চ 'ম'কার সাধনায় ডুবে চলেছে কন্দর্প। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে মেতে উঠেছে।

চেয়েছিল ক্ষমতা—শক্তি—অর্থ সম্পদ। দুর্মদ প্রাণশক্তি ভরা মানুষটি ব্যর্থতার নিদারুণ আঘাতে ধীরে ধীরে পশু হয়ে উঠেছে। আজ তার শেষ স্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বাসন্তী প্রতিবাদ করে—বাবা বলেছেন, কুলদেবতা আছেন। এত অনাচার পাপ বাড়ীতে চলবে না। এসব কি করছো তুমি?

স্ত্রীর কঠিন স্বরে একটু অব্যক হয় কন্দর্প।

মানব যাবার পর থেকে কেমন যেন বাসন্তীও বদলে যাচ্ছে। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বলে ওঠে কন্দর্প।

—এও ধর্মাচরণ করছি।

—ধর্ম! শিউরে ওঠে বাসন্তী। কাকে আসতে দেখে জবাবটা আপাততঃ না দিয়ে সরে গেল বাসন্তী! কেমন ঘৃণা জন্মেছে ওর মনে। বহুদিনের সঞ্চিত ঘৃণা।

এমনি সময় এসে হাজির হয় পাঁচু গোমস্তা। জামাটা ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে, ছাতাটা কেড়ে নিয়েছে ওরা। হাঁটু-পা ছড়ে গেছে ঠাঁই ঠাঁই। কাপড়খানা হাঁটুর কাছ থেকে ছিঁড়ে ঝুলছে। কপালে চুলে রক্তের দাগ!

—দেখুন বড়বাবু, কি দশা করেছে দেখুন ব্যাটা পাঞ্জাবী। আর্তনাদ করছে পাঁচু।

চমকে ওঠে কন্দর্প আচাই। দশখানা পরগণার মুকুটহীন সম্রাট—যার দাপে বাঘে বলদে একঘাটে জল খায়, তারই কর্মচারীর গায়ে হাত। কাঁদছে পাঁচু।

—আমাকে রেহাই দ্যান বড়বাবু, খাজনা চাইতে গেলাম—ব্যাটা রুখে এসে খড়ম দিয়ে পিটে বল্লে—এই তোকে দিলাম, এইবার তোর বাবুকে আসতে বলিস।

—পাঁচু! দপ করে জ্বলে ওঠে কন্দর্প আচাই।

—হ্যাঁ! আমার কোন চোষ নাই বাবু।

পায়চারী করছে কন্দর্প আচাই—চরম পরীক্ষা। কৃপাল সিংকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাক পাঁচু, এর জবাব সে পাবে। কন্দর্প আচাই এখনও বেঁচে আছে। নাও—

দশটা টাকা ওর হাতে দিল। পাঁচু গড় হয়ে পেন্নাম করে।

রাগে অপমানে টকটকে রং সিঁদুর বরণ হয়ে উঠেছে। কৃপাল সিং-এর কথাগুলো ভুলতে পারে না কন্দর্প। এত বড় স্পর্দ্ধা ওর—ভয় দেখাতে সাহস পায়।

লকলক করে জ্বলছে হোমাগ্নি। সপ্তপদী হোম। তান্ত্রিকাচার্য উচাটনানন্দ কারণবারি সিঞ্চিত করে হোমে বসেছে—রক্তাম্বর পরে স্বাহা ধারা দিচ্ছে কন্দর্প। দাউ দাউ জ্বলছে আগুন—লাল চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে কি এক জ্বালা!

—ওঁ স্বাহা। ওঁ স্বাহা।

অপাম সোমম্ অমৃত অভুম।

সোমপান করে আমরা অমরত্ব লাভ করেছি। নবজীবন—মৃত্যুকে জয় করবার অমৃত ওই কারণবারি।

দেবীর প্রসাদ লাভে শক্তিসামর্থ্য ফিরে আসুক। শত্রুজয়ী কালজয়ী হবে সে। প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করছে পূর্ণ ঘটের সামনে

—স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি রক্তচন্দনসঞ্জিতম্।

তথা ত্রিশূলপুষ্পঞ্চ বজ্রপুষ্পং বরাননে—

…ছায়ামূর্তিগুলো অন্ধকার আঙ্গিনায় প্রতীক্ষা করছে। নিস্তব্ধ গ্রাম—থমথম করছে রহস্যঢাকা রাত্রি। অভা আজ মেতে উঠেছে। পরমার হত্যার শোধ নিতে হবে। কৃপাল সিংকে আজ জবাব দিতে হবে। অভা দলবল তৈরী করে তুলেছে। তাদের প্রাণভর খাইয়েছে মাটির হাঁড়িতে তাজা পানীয় আর প্রসাদী মাংস। গলা জ্বালা করছে—রক্তে মাতন লাগে। বুনো ডোমের রক্ত—রক্তখাওয়া রক্ত—সেই রক্ত মেতে উঠেছে। বলে চলেছে অভা,

—সামিলে যাবি, আগে ঢুকে ব্যাটাকে বেঁধে ফেলবি। ছামুঘরে বন্দুক দুটো আছে—সেদুটোকে আগে হাতাতে হবে।

কালো ভুষোকালি মাখা লোক দুজন ঘাড় নাড়ে।

—অভা!

বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁক পাড়ে কন্দর্প। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর—নেশার স্পর্শে ভারি হয়ে উঠেছে। একটা শালপাতায় প্রমাদী সিঁন্দুর এনে দেয়। কপালে ঘষতে থাকে ওরা।

…কন্দর্প আজ চরম পরীক্ষা দিতে চলেছে। হয় উত্থান নাহয় নির্মূল হয়ে যাবে। কালীপুরের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার দখল সম্মান—ইজ্জৎ।

—অভা! কণ্ঠস্বর যেন কাঁপছে।

—হুজুর ইর জন্যে ভাববেন নাই। এই এলম বলে। ব্যাটার দাড়ি সমেত মুণ্ডুটা দামোদরের চরে পরমার পাশে থুয়ে দিই আসবো।

দণ্ডবৎ করে হাঁক দিয়ে ওঠে—বলো কালী মায়িকী…

অন্ধকার শিউরে ওঠে। বাসন্তীর বুক কেঁপে ওঠে। ভুবন আচাই অন্ধ হয়ে পড়েছে—হাতড়ে খাট থেকে নেমে চীৎকার করে ওঠে।

—বৌমা! বৌমা! নিষেধ করো—নিষেধ করো ওদের। ওরে কন্দর্প—

হাহাকার করে ওঠে বৃদ্ধ অন্ধ। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রও বোধহয় এমনি অসহায়ের মত কেঁদে উঠতো পুত্রের উন্মত্ততায়।

আঁধারে ছায়ামূর্তিগুলো মিলিয়ে গেছে।

হোমের আগুন নিতে এসেছে। ধিকি ধিকি আঁধারে গন্ গন্ করছে আঙ্গরাগুলো। নিস্তব্ধ নির্জন সূচীভেদ্য আঁধার ঘেরা রাত্রি। দূরে কোথায় একসঙ্গে কতকগুলো শিয়াল ডেকে উঠলো।

চমকে ওঠে কন্দর্প। এর অর্থ বোঝে।

আক্রমণ করেছে—আক্রমণ করবার সঙ্কেত ওদের। দুরু দুরু কাঁপছে বুক। ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি চলছে গাছেব পাতায়। কি এক আকাশ জোড়া দীর্ঘশ্বাস উঠছে মৃত্তিকাব বুক থেকে।

গুড়ুম্।…কড় কড় কড়।

প্রচণ্ড গর্জনে ভরে ওঠে চারিদিক। বন্দুক চালিয়েছে ওরা। একটা ক্ষীণ কলরব শোনা যায়। চঞ্চল ভাবে পায়চারী করছে কন্দর্প।

অধীর ব্যাকুল এ প্রতীক্ষা। অন্তহীন নির্জনতার মাঝে সব ডুবে গেছে। মুছে গেছে।

…কয়েকটি মুহূর্ত তার মনে গভীরভাবে কেটে বসেছে। এর আগেও বহু আক্রমণ ফৌজদারী করেছে। এত বিচলিত কোনদিনই হয়নি।

—বাবু!

অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট আলোয় এগিয়ে আসে মূর্তিটা। অভার ভাইপো নাটু।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু।

চমকে ওঠে কন্দর্প। স্থির দৃষ্টিতে ওর ক্ষতবিক্ষত দেহের দিকে চেয়ে থাকে—ওরা বন্দুক চালিয়েছে। কাকার বুকে লেগেছে। একবারে খতম।

—কৃপাল সিং!

—সড়কী চালালাম বাবু, ব্যাটার ডানহাতটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। জান লিতে পারলাম।

—মাদীর দল তোরা, শেষ করে আসতে পারলি না?

—গুলির মুখে এগোতে পারলাম না বাবু, সর্দারই শ্বাষ হয়ে গেল!

কাঁদছে আহত রক্তাক্ত বীভৎস নোটনা। কন্দর্প আচাই আজ চুপসে গেছে অজানা আতঙ্কে। সব বিক্রম নিঃশেষ হয়ে গেল। সবাই গেছে—টিকে ছিল অভা। সেও গেল।

কন্দর্প আচাই আজ চরম হেরেছে। ভাগ্যলিপি লেখা হয়ে গেল তার। কালীপুর মৌজার বন মহালের দখল আজ হাতছাড়া হয়ে গেছে। কৃপাল সিং-ই জিতলো ওই লড়াই-এ। এই দাঙ্গার ফলাফল স্পষ্ট অক্ষরে সে দেখতে পায়। আর করবার কিছু নেই।

চুপ করে থেকে কন্দর্প বলে ওঠে—পালা। বনের ভিতর দিয়ে হাঁটা পথে অজয় নদী পার হয়ে ইলামবাজার ছাড়িয়ে কোন কুটুমবাড়ীতে পালা। কেউই যে না থাকে। যা কীর্তি করে এসেছিল, পুলিসে সব বাঁধা পড়বি। আর বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নেই। যে যেদিকে পারিস পালিয়ে বাঁচ। হাল ছেড়ে দিয়েছে কন্দর্প।

ফিসফিসিয়ে বলে নোটন!

—লাশটাকে বয়ে এনেছি হুজুর।

—নদীর গাভায় পুঁতে দিয়ে যা।

—পুঁতে দেবো? মিত্তুকালে আগুন পাবেনা যি গো?'

নোটনার আপন কাকা—এটা যেন কেমন লাগে তার মনে।

জ্বলে ওঠে কন্দর্প।

—হ্যাঁ। তবে কি ঘটা করে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হবে ওঁর। অপঘাতের মড়া, এখুনি সদরে নিয়ে গিয়ে কেটে ফর্দাফাঁই করে দেবে। যা বলি তাই করে পালা যে যেদিকে পারিস। রাত পুইবার আগে পালাবি।

আর দাঁড়াল না নোটনা। ডাকাতের আবার সৎকার! চিরকালই রাতের আঁধারে মরেছে ওরা—মাটির নীচে আশ্রয় নিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। মৃত্যুটাও ওদের গোপনতম ব্যাপার। কোন শোকদুঃখ করবার উপায়ও নেই। মাটির নীচে মাটি হয়ে যাবে ওর শরীর—আপ্তজনের বুকের ভিতর চোখের জল জমে পাথর হয়ে উঠবে। বুক ফাটবে তবু মুখ ফোটান চলবে না।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে কন্দর্প আচাই; ভুবনপুর আচাই বংশের শেষ জমিদার। সুগৌর ললাটে তার পরাজয়ের অপমানের কালো ছাপ—সমস্ত বিক্রম তার মুছে গেলো রাতের আঁধারে। তন্ত্র মন্ত্রসাধনা—সব বৃথাই হয়ে গেল। শক্তি তার হারিয়ে গেছে। সামনে পূজাবেদীর পূর্ণ ঘটটা লাথি

মেরে ফেলে দিল—ঘটের জলে হোমের শেষ আগুনটা নিভে ছাই হয়ে যায়। শূন্য বোতলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে—অন্যটা তুলে নিল। সব চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পায় কন্দর্প আচাই।

কালীপুর বাজারে হুলস্থুল পড়ে গেছে। কৃপাল সিং হাসপাতালে। কি মহা-প্রলয় ঘটে গেছে গতরাত্রে ওই বনধারের বাংলোয়। দারোগা থেকে শুরু করে পুলিস অফিসার পর্যন্ত অনেকেই এসেছেন—কালীপুর বাজারে তারই আলোচনা। কৃপাল সিং-এর বাংলোয় পাহারা বসেছে।

…ভুবনপুরের কুখ্যাত দাগীদের অনেকেই বাড়ীতে নেই। কুটুমবাড়ী গেছে। নাহয় তীর্থে গেছে এক সঙ্গে। পুলিস অফিসার ভদ্রলোক কালীপুর সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখেন।

কন্দর্পবাবুকে বলে ওঠেন তিনি—সকলেই এত ধার্মিক হয়ে উঠলো যে হঠাৎ ?

কন্দর্পবাবু জবাব দেয়—তার খবর আপনারাই ভালো জানেন। জেলে কি মন্তর জপান আপনারা, বের হয়েই সাধু হয়ে যায় ব্যাটারা।

কন্দর্পবাবু আজ তেমন অভ্যর্থনার আয়োজন করেনি। চারিদিকে আদায় উসুল নেই, মামলা মোকদ্দমার খরচ আছে, তাছাড়া মরিয়া হয়ে উঠেছে কন্দর্প।

ভিতরে অবস্থা হয়ে এসেছে গজভুক্ত কপিত্থবৎ। খোলাটাই টিকে আছে—শাঁস বলতে ভিতরে বিশেষ কিছুই নেই।

কন্দর্পবাবুকেই বলে ওঠে অফিসার ভদ্রলোক।

—আপনাকে থানায় যেতে হবে একটু। গাড়ীতেই যাবেন, আমরাই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

—অর্থাৎ! কন্দর্পবাবুর চোখেমুখে সন্দেহের ছায়া। কোথায় যেন একটা ছেঁড়া কালো ঝড়ো মেঘ ঘনিয়ে আসছে দামোদরের বালিয়াড়ির ঈশান কোণে। দেউড়ি শূন্য, পাহারা নেই। অভা মরে গেছে। আজ ডানহাত ভেঙ্গে গেছে তার। একা গোমস্তা আর একজন পিটপিটে হালসানা বসে রয়েছে ওদিকে।

—এজাহার নিতে হবে একটু!

—দরকার থাকে এখানেই তা স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন। আরে মশাই, ওর ওটা নারীঘটিত ব্যাপার মনে হয়। ওর চরিত্রদোষ তো বিখ্যাত—হয়তো কারো মা-বোনের ইজ্জৎ নিয়েছিল—ব্যাটার জান নিতে এসেছিল সে। ওসবের আমি কি খবর দোর বলুন ?

পুলিস অফিসার এতে সন্তুষ্ট হন না।...প্রায় কালীপুর মৌজায় এসব লেগেই আছে। খুন—ডাকাতি—রেললুঠ প্রায়ই ঘটে কিন্তু ওরা কোন চিহ্ন পর্যন্ত রেখে যায় না। আজ তার কিনারা করতে চান। বলে ওঠেন তিনি একটু ভদ্রভাবেই।

—তবু একবার গেলে ভালো হয়।

কন্দর্পবাবু জবাব দেয়—আমার সময় নেই, কাছারীর কাজ অনেক বাকী; আপনারা আসুন। সেই দোর্দ্রণ্ডপ্রতাপ কন্দর্প আচাই যেন ক্ষণিকের জন্যও বর্তমানের সবকথা ভুলে গিয়েছে। চোখেমুখে ফুটে ওঠে কঠোর কাঠিন্য।

ইঙ্গিতে কনস্টেবল দুজনের বন্দুক নড়ে ওঠে। দেউড়ির দিকে দৃষ্টি রেখে তারা।

অফিসার ভদ্রলোক বেশ কঠিন স্বরেই ঘোষণা করেন।

—আপনাকে অ্যারেস্ট করা হোল। বুকপকেট থেকে ওআরেণ্টটা বের করে জানান—না গেলে জোর করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই করতে হবে।

কন্দর্পবাবু যেন স্বপ্ন দেখছে। জীবনে বহুবার বহু বাধা পার হয়ে গেছে—এবার বিধি বাম। বাধার মৈনাক এসে দাঁড়িয়েছে কালো গ্রানাইট পাথরের কর্কশতা নিয়ে।

—কি বলছেন আপনি? ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না কন্দর্প।

ভুবনপুরের জমিদার! আজ তার সব গেছে। বাধা দেবার কেউই নেই। একমাত্র সন্তান—তাকেও আজ পর করে দূর দেশে নির্বাসন দিয়েছে। তার চরম বিপদের দিনে কেউ পাশে নেই।

ভুবনবাবু কথাটা শোনেন। বাসন্তী কান্নাভেজা গলায় বলে ওঠে।

—কি হবে বাবা? মানব ফিরে আসছে—এসে এইসব কথা শুনলে কি ভাববে!

ভুবনবাবু নির্বিকার চিত্তে জবাব দেন—নিয়তি কেন বাধ্যতে! অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘটবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না মা। এ নিয়তির বিধান। মানবকে কষ্ট পেতে হবে—উপায় নেই।

—এই অন্যায় অবিচার চুপ করে মেনে নোব? বাসন্তী কি ভাবছে।

—এ ছাড়া পথ কি মা! এসব হবে আগেই জানতাম; সাবধানও করেছি—কথা কানে তোলেনি। ছেঁড়া কাঁথার মত পড়ে রইলাম দূরে।

বাসন্তী এই বিধান মানতে রাজী নয়। তার স্বামী অন্যায় করুন ন্যায় করুন তার জন্য শাস্তি পুরস্কার যাহা হয় তিনিই পাবেন, তাই বলে স্ত্রীর

কর্তব্য থেকে সে কেন বিরত থাকবে ?

কি যেন ভাবতে থাকে। শূন্যপ্রায় ঘর। ঝি চাকর দু'একজন রয়েছে। পাইক বরকন্দাজ কেউ নেই, ডোমপাড়া আজ পুরুষশূন্য। সকলেই পুলিসের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে বনে পালিয়েছে! একটা স্তব্ধ নির্জনতা ছেয়ে এসেছে গ্রামে—কে যেন এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। বুক চাপা ক্ষীণ কান্নার সুর—অভার বৌ কাঁদছে। তার সব গেছে। বুক ফাটানো কান্না বাতাসে গুমরে ওঠে। ওরা কাঁদে—বাসন্তী গুমরে মরে। বেদনা আর দুঃসহ লজ্জা তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

কয়েকদিন হল মানব ফিরে এসেছে বিলাত থেকে। দেহেমনে নোতুন কর্মপ্রেরণা। এ যেন অন্য মানুষ—ভবিষ্যতের আশায় দ্যুতিময় ওর দৃষ্টি।

সারা মন ভরে ওঠে দীপার খুশিতে। মানবের মন থেকে পথক্লান্তি এখনও ঘোচেনি। প্লেনে আসার ফলে পথের পরিবেশ এই নিবিড় পরিবর্তন-টাকে স্বাভাবিক করে তোলেনি; মনে হয় এখনও যেন সেই কুয়াসাচ্ছন্ন দেশের কোন কারখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শত কাজের ফাঁকে সেখানে ভেসে উঠত মায়ের বেদনাহত দৃষ্টি; আজও তাকে অহরহঃ সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। একজনকে মনে পড়ে—সে টুনুবৌদি। তার শান্ত চাহনি ভোলা যায় না।

—কি এত ভাবছ বল দিকি? দীপার চোখে মুখে পড়েছে এক ঝলক চাঁদের আলো; শহরের উপকণ্ঠে বিরাট বাড়ীখানা রাতের নির্জনে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে।

দীপার দিকে চেয়ে থাকে মানব—কই না তো?

—না! ভাল করে কথাই কইছো না। বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি দাম বেড়ে গেলো নাকি?

হাসে মানব—তা বাড়াই স্বাভাবিক। ভাবছি একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। অনেকদিন মাকে দেখিনি। বৌদিকেও দেখে আসবো একবার।

দীপা যেন খুশিতে উছলে পড়ে—চলো, আমিও যাবো।

—যাবে?

—কেন যাবো না? মাকে প্রণাম করে আসবো। অবশ্য তুমি যদি অমত না করো। তোমাদের দেশটাও দেখা হবে।

রাত্রিশেষে বের হয়েছে ওরা! দীপাই গাড়ী চালাচ্ছে। জি. টি. রোডের বুকে মসৃণ গতিতে ছুটে চলেছে দামী বুইকখানা—যেন রাজহাঁস পালক মেলে চলেছে। স্প্রিং-এর নিখুঁত সমাবেশ, এতবড় গাড়ীখানা টলছে মাত্র। মানবের মনে গত

অপরাহ্নের স্নিগ্ধ স্মৃতিস্পর্শ তখনও মুছে যায়নি। জাগর রাত্রির তমসায় তারার দ্যুতিতে ফুটে ওঠে কার চাহনি।

—চুপ করে বসে আছো যে? দীপা বলে ওঠে।

—এমনিই। মানব ছোট্ট জবাব দিয়ে এড়িয়ে গেল!

দুপাশে ছুটে চলেছে শূন্য ধানক্ষেত। শিশির-ভেজা গাছগুলো পাতা ঝেড়ে চলেছে। পালক থেকে জল ঝাড়ছে ভিজে ওঠা পাখী।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আবার কালীপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে সে।

…বনভূমি জেগে উঠেছে সকালের আলোয়; দিগন্তবিস্তৃত সবুজ বনসীমা—উঠে নেমে চলে গেছে অসীমের দিকে: মাঝে মাঝে শুকনো রুক্ষ প্রান্তরের বুকে পুঞ্জীভূত পলাশের লাল নেশা। সবুজের বুকে লাল রংএর ছোপ মোটা তুলির আঁচড়ে এঁকে গেছে কোন নিপুণ চিত্রকর।

মাথার উপর দিয়ে চলেছে হাইটেনশন লাইনের তামার তারগুলো, রোদে ঝিকমিক করছে। সাদা পোস্টের সঙ্গে কালো কালো ইন্‌সুলেটার দিয়ে বাঁধা—কোন দৈত্য যেন লাটাইএর সঙ্গে আটকে রেখেছে ওগুলোকে। বনরাজ্য জয় করতে চলেছে বিজ্ঞানের জয়দূত।

কালীপুর স্টেশনের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ট্রাক-জিপ এদিক ওদিকে দেখা যায়। সাইডিং লাইনে নানা মালপত্র যন্ত্রপাতি নামছে। দিশী-বিদেশী লোকজনও ঘোরাফেরা করছে। লোহালক্কড স্তূপাকার করে নামান। মাঠের মাঝে কাঁটাতার দিয়ে টিনের গোলাকার শেড তৈরী হচ্ছে। বাজার সীমাও বেড়ে গেছে। চায়ের দোকানগুলো ছিমছাম হয়ে উঠেছে। কোথায় বাজছে রেডিও। অন্ধকার তমসা থেকে কালীপুর জেগে উঠেছে আলোর স্পর্শে। আর তাকে চেনা যায় না। প্রান্তরের বুক চিরে গড়ে উঠেছে টারম্যাকাডাম রাস্তা। এ কোন নোতুন রাজ্যে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে মানব।

হঠাৎ চমকে উঠলো—শত ভাঙ্গাগড়া পরিবর্তনের মাঝে রেসকোম্পানীর কুয়োর কাছে আজও টিকে আছে ফুলফোটা সেই রক্তকরবী গাছটা। বাড়তি জল পেয়ে আজও সে সজীব। একটি সুন্দর স্মৃতি।

—চলো! দীপা একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ওর কথায় মানবের মনের সব চিন্তাজাল ছিঁড়ে যায়। ছোঁয়া পেয়ে শম্বুকচিতা আবার তার নীরবতার কঠিন খোলে ঢুকে পড়ে।

—হ্যাঁ।

…দিন বদলেছে। মুক্ত প্রান্তর—বনভূমি অনেকখানি কেটে উড়িয়ে দিয়েছে

ওরা। শ্বাপদসঙ্কুল প্রান্তরে সন্ধ্যাবেলায় নামতো থমথমে আঁধার জড়ানো আতঙ্কের ছায়া। জনমানব ওদিকে যেতো না। বর্ষার দিনে ওর বুক গড়িয়ে ঢল নামতো; গেরুয়া জল গিয়ে মিশতো নদীর বুকে। আজ সেখানে গড়ে উঠেছে উপনিবেশ, মানবজীবনের অঙ্কুর গজিয়েছে কঠিন উষর বনামৃত্তিকায়! সারিবন্দী লাগান হয়েছে শিরীষ—জাম—নিম গাছ। এক রাস্তার এক এক রকমের বনস্পতি। মাঝে মাঝে গড়ে উঠেছে বাংলো—সাধারণ কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার।

আগামী দিনের নোতুন সম্ভাবনার মাঝে ভুবনপুর কোথায় হারিয়ে গেছে। নদীর উপর আম কাঁঠাল শালবনের ছায়াপ্রহরা ঘেরা ছোট্ট গ্রামখানি আজ ধুঁকছে, অদূরে আগামী সভ্যতা চোখরাঙ্গিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে; মনে মনে হাসছে ওর মৃত কঙ্কালের দিকে চেয়ে—আজকের নবযৌবন। বাতাসে শোনা যায় জোর চীৎকারে রেডিওঘোষক কি যেন সংবাদ পরিবেশন করছে। আকাশ ফাটিয়ে উঠেছে কোথায় জয়েস্ট রিবিট করার শব্দ—কয়লার ধোঁয়ার নীল আকাশকোল কালো হয়ে উঠেছ।

গাড়ীখানা এগিয়ে গিয়ে বালিঢাকা জলগড়ানি পথে নামলো; দীপা বলে ওঠে—

—বাবাঃ, এ গাঁ তো নয় যেন—অন্ধকার পুরী! দীপা যেন হতাশ হয়েছে। অভ্যর্থনা করবার জন্য কেউ নেই। কোথায় লোকলস্কর—বাদ্যভাণ্ড! সব কল্পনা তার বদলে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ। মানব ভাবে দীপা আগেকার দিনগুলো দেখেনি, তাহলে হয়তো শিউরে ওঠতো সেদিন। অসমতল পথে গাড়ীখানা এদিক ওদিক হেলতে দুলতে চলেছে। দু'একজন চাষী, কৌতুহলী ছেলেমেয়ে চেয়ে থাকে ওদের দিকে। ছায়াঢাকা তেঁতুল গাছের ফাঁকে মস্ত বাড়ীখানা দেখা যায়—অনেকদিন চুনকাম হয়নি; সবুজে শেওলার ছাপ লেগেছে সারা গাঁয়ে। পুরনো গাঁয়ের জীবনের সঙ্গে ওর যেন একটা মিল রয়েছে।

অবাক হয়ে যায় বাসন্তী। বিলাত থেকে ফিরেই মানব ছুটে আসবে তাকে দেখতে কল্পনা করেনি। ওদিকে নিবারণবাবু বহুচেষ্টা করেও কন্দর্প আচাইএর জামিনের হুকুম পাননি; এস. ডি. ও. রাজী হননি, নিবারণবাবু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরবার করতে ছুটেছেন। বাসন্তী এই অবস্থায় মানবকে আসতে দেখে যেন নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু সঙ্গে আর একটি কে মেয়ে—পোষাক-আশাকে সভ্যতার ছাপ, চালচলও তেমনি কেতাদুরস্ত! গায়ে আলতো ভাবে চাপানো রয়েছে

একটা কাজকরা দামী সিল্কের ক্লোক।

…সঙ্কোচের বালাই নেই।

—মা। মানব পরিচয় করিয়ে দেয়। এগিয়ে এসে প্রণাম করে দীপা।

—থাক্, চিনতে পেরেছি। দীপা যেন বকছে মানবকে। হাসতে চেষ্টা করে বাসন্তী—এসো মা।

মানব মায়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সারা বাড়ীতে কেমন একটা থমথমে নীরবতা, বাইরের মহলে লোকজন নেই—সেই দাবা পাশার ছকও পড়েনি। কাছারী বাড়ীর বিশাল দাওয়ায় লোকজন প্রজা-পাটক আসেনি; পাইক বরকান্দাজরাও মিলিয়ে গেছে। চালাঘরে একটা পাল্কী পড়ে আছে, একটা পাল্লা তার ভাঙ্গা, বহুদিন ওতে কেউ চড়েনি। এবাড়ীর সমস্ত কিছু ঘিরে একটা নিরাভরণ শ্রীহীনতা ফুটে উঠেছে।

কেমন যেন এক স্বপ্নপুরীর স্তব্ধতা ঘিরে রয়েছে সবুজ শেওলাধরা বাড়ীখানাকে। বাসন্তীই বলে ওঠে—দাদুকে প্রণাম করে আয় বাবা। চলো মা!

দীপাকে নিয়ে চলে গেল বাসন্তী উপরের মহলে।

স্বপ্ন দেখছেন ভুবনবাবু, জীর্ণস্থবির বৃদ্ধ। ঘোলাটে অস্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে অতীত বর্তমান একাকার হয়ে গেছে মহা ঝড়ে। সব ভেঙ্গে পড়েছে। পড়ুক! সত্য যা, চিরকালই তা সত্য—সে যত কঠিনই হোক না কেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা ভুবনপুর নিঃশেষ হয়ে যাবে। কন্দর্প আচাইএর প্রবল পরাক্রম আজ ধুলোয় মিশিয়ে যেতে বসেছে! তুফান ডাকা সর্বনাশা নদীর বুকেও ওরা বাঁধন আনছে। উপছে পড়া যৌবনের অপচয় আর হতে দেবে না। তাকে বন্ধ ক'রে প্রতিদিনের শিবযজ্ঞে নিয়োজিত করবে আগামী দিনের মানুষ। তবু জীর্ণ মন অতীতের দিনগুলোর জন্য কাঁদে।

—দাদু!

চমকে ওঠেন বৃদ্ধ; ছানিপড়া চোখে ভালো দেখা যায় না। কানে বাজে ওই অতিপ্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর। অতীতের তীর থেকে আগামী ভবিষ্যতের আহ্বান। অস্তাচলের তীর থেকে ফিরে দেখছে উদয়াচলের দিকে একটি রক্তিম যৌবনস্বপ্ন।

—মানব! ফিরে এলি ভাই!

—হ্যাঁ দাদু! প্রণাম করছে মানব। বৃদ্ধ আবেগভরে ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে থাকেন। স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে সারা জীর্ণ দেহ। দুচোখ দিয়ে নেমে আসে অশ্রু।

—বাবাকে দেখছি না ?

মানবের প্রশ্নে ভুবনবাবু কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। মামারা ওকে কিছু বলেনি। হয়তো দুঃখ পাবে তাই। বৃদ্ধের বুক জীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে।

—এ শাস্তি তার পাওয়া দরকার ছিল মানব। বহুবার নিষেধ করেছি, তবু শোনেনি। সেই পাপের শাস্তি তাকে পেতেই হবে দাদুভাই। ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়ে সদরে গেছে পুলিস হেপাজতে। সামনে যেন বজ্রাঘাত হয় মানবের। সারা দেহমনে কি এক শিহরণ খেলে যায়। বাবা! তারই বাবা কিনা আসামী হয়েছে ছেঁড়া মামলার। খুনে—ডাকাতদের প্রধান এই তার পরিচয়।

—আসামী হয়ে গেছেন ? মানব বিশ্বাস করতে পারছে না।

কথা কইলেন না বৃদ্ধ, ঘাড় নাড়লেন মাত্র। চোখ মোছবার চেষ্টা করেন।

—আমার সন্তান যে এমনি হবে স্বপ্নেও ভাবিনি ; হয়তো কালেরই দোষ। যুগধর্ম হিসাবেই সমাজ মানুষ গড়ে ওঠে। তাই কন্দর্প ও পথেই গেল। আবার তারই সন্তান তুই বেছে নিলি অন্যপথ ; সেও আগামীযুগের ধর্মেই।

মানব বলে ওঠে—অশান্তি, অভাব এই যুগেই তো সব থেকে বেশী দাদু।

বৃদ্ধ জবাব দেন,—তাইতো মানুষের শুভবুদ্ধি সেই অভাব-অশান্তি দূর করতে মেতে উঠেছে। অনেকেই হতাশ হয়েছে এই যুগের আচার-ব্যবহার চালচলনে। কিন্তু আমি আস্থা হারাইনি মানব। মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে হয়তো এই সামান্য পরিবর্তনটুকু দরকার, কিন্তু এইটাই সব নয়। এটা বাহ্যমাত্র ; অন্তরের সত্যধর্ম যে কোন মুখোশেই ঢাকা থাক না কেন—সে অমর ; তার মুক্তিপথ সে ঠিক বেছে নেবে। কল্যাণ সে ঠিক আনবেই এই দুঃখের মধ্যে দিয়েই।

বুড়ো হাঁপাচ্ছেন। আজ সর্বনাশের তীরে বসেও মনের এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আগামী জগতের মানবকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সব ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও। ওঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মানব।

হঠাৎ দরজার কাজে নজর যেতেই দেখে দীপা সেখানে দাঁড়িয়ে ; ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। কানে গেছে মানবের বাবার কথা। খুনী আসামী হয়ে হাজতবাস করছে। খুনী! মানবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই রেগে নীচে চলে গেল দীপা। দাঁড়াল না।

…বাসন্তীকে একলা পেয়ে মানব প্রশ্ন করে বসে—বাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবার কথা বলোনি কেন ?

বাসন্তী ছেলের কথার জবাব দিল না। ওর দিকে মুখ তুলে চাইল।

সেই দৃষ্টিতে কি এক অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে, ছলছল চোখে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে বাসন্তী। আজ মনে হয় মানবের—মাকে সেই-ই সব থেকে বেশী আঘাত দিয়েছে। বয়স হয়ে গেছে। মাথার দু'চারগাছি চুল সাদা হয়ে উঠেছে তার, চোখের কোলে জমেছে কালির ছায়া; এতদিন নীরবে যে বুকফাটা দুঃখ সয়ে এসেছে আজ তা অসহ্য হয়ে উঠেছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বাসন্তী।

—ওর সামনে বলতে পারিনি বাবা। লজ্জায় তোরই মাথা নুইয়ে আসবে। আজ আমার সব গেছে। সম্মান-সম্পদ সব।

সব হারিয়ে রিক্ত নারী আজ কাঁদে। এ বাড়ীর অন্ধকার পরতে পরতে শতবর্ষের কান্না জমে আছে, জমে আছে বহু রক্তস্রোতের নীরব স্পর্শ—বহু পাপের বোঝা।

—তিনি এখনও জানেন না, ভুবনপুর ছেড়ে দেবার নোটিস এসেছে। বাসন্তীই কথাটা মানবকে জানায়।

—কেন?

—বাঁধ তৈরি হয়েছে। সারা ভুবনপুর তলিয়ে যাবে দামোদরের জলে। জমি-জারাত-বাড়ী-বাগান সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কি যেন ভাবছে মানব। পথে পথে তারই প্রস্তুতি দেখে এসেছে। কালীপুর ব্যারেজ গড়ে উঠবে ভুবনপুরকে নিঃশেষ করে। এই জীবনের সব কালীমা মুছে দিয়ে।

—দাদু জানেন?

—হ্যাঁ। বাসন্তী জবাব দিল।

মানব বেশ দৃঢ় স্বরেই বলে।

—বেশ হয়েছে। এ পাপপুরীর ধ্বংস হওয়াই উচিত।

—মানব! বাসন্তী মানবের কথায় চমকে ওঠে—তোর নিজের জন্মভূমি, বাপ পিতামহের ভিটে, এযে স্বর্গের চেয়েও বড়।

—ওসব বইএর কথা মা। একালে অচল।

বাসন্তী ছেলের দিকে চেয়ে থাকে, কে জানে কি শিখেছে ওরা! এত সহজে এ কথাটা মেনে নিতে বাসন্তী পারে না।

প্রথম দীপার বেশ ভালোই লেগেছিল জায়গাটা। কলকাতার ইটকাঠে গড়া ঘিঞ্জী নাগরিক জীবন ছেড়ে দু'চারদিনের জন্য অসীম মুক্ত উদার দিগন্তের কোলে এসে নোতুন প্রাণ পেয়েছে। একদিকে লালডাঙ্গায় গড়ে ওঠা ছোট ছোট

সুন্দর বাংলো বাড়ী, ওদিকে শালবনের সবুজ সীমা, এদিকে দিগন্তপ্রসারী রূপালী বালিয়াড়ি। পোড়াচরে আবার গজিয়েছে সবুজের আস্তরণ ঢাকা কাশবন। উঁচু বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে দীপা, নদীর দূর পারে নীল ছায়াঘন বিহারীনাথ শৃঙ্গ। কালো গাছের জটলা, মাঝে মাঝে পলাশ শিমুলের রক্তাভা। নদীর বুকে কাজলকালো জলধারা বয়ে চলেছে। এ এক স্বপ্নঘেরা দেশ।

কিন্তু হঠাৎ সংবাদটা শুনে দীপা চমকে উঠেছে। কাগজেও দেখেছে খবরটা। কুখ্যাত খুনে জমিদারকে আসামী হতে হয়েছে।

মানবকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। কিন্তু বিশ্বাস করেছে দীপা, তাই বৈকালে নির্জন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কেমন আনমনে চেয়ে রয়েছে দূরের দিকে মানব বলে চলেছে।

—বর্ষায় দেখোনি, পাগলা নদী দুপাশে যা পায় সাপ্‌টে মুখে পুরে দেয়। পাহাড়ের গা বয়ে নেমে আসে রাক্ষসী নদী। মরণ মাতনে মেতে ওঠে।

মরণ মাতন! দীপা এই বিচিত্র আবহাওয়ায় ভয় পেয়েছে। খুনী আসামী। খুনী আসামী ওর বাবা। এ মাটিতে খুন-খারাপি লেগেই আছে। সব শ্রী তার মন থেকে মুছে গেছে।

মানবের চোখেমুখে কি এক দৃঢ়তা, স্থির দৃষ্টিতে দূরপ্রসারী নদীর দিকে চেয়ে আছে, সহজাত কাঠিন্য ফুটে উঠেছে তার মুখচোখে। ব্যক্তিত্বপ্রতিভা আর ঋজুতা মিলে একটা কঠিন বস্তুবোধ এনেছে ওর মনে। দীপা ঐ লোকটিকে ঠিক চেনে না। এতকাল শহরে যাদের সঙ্গে মিশেছে—এ সে জাতের নয়। কেমন শিউরে উঠেছে সেই নির্মম মানুষদের একজনকে এই পরিবেশে কাছে দেখে।

খুনী বাকার রক্ত ওর শিরায় শিরায়। তাই বোধ হয় কঠিন নির্দয় সে। দীপা আজ এই রুক্ষ পরিবেশে ওর বন্য উদ্দামতার সন্ধান পেয়ে শিউরে উঠেছে। সন্ধ্যা নামছে আদিম বন্য পরিবেশে। দীপা বলে ওঠে।

—চল ফেরা যাক্।

এই শুষ্ক কঠিন ঠাঁইটুকু তার আর বিন্দুমাত্র ভাল লাগে না। ভাল লাগতে বাধছে তার মানবকেও।

এতদিন চেনেনি—আজ মনে হয় কঠিন দুর্মদ ওই মানব। নদীর মত মাতন-ভরা মন তার। রুক্ষ মাটির মত হৃদয়হীন ওর অন্তর।

কয়েক দিনেই তার দেহমনে একটা নিবিড় পরিবর্তন এসেছে। কন্দর্প-

বাবু এসে দাঁড়াল কালীপুর স্টেশনে। নিবারণবাবু বহু চেষ্টায় ব্যক্তিগত জামিনে খালাস করেছে। যা কোনদিনই চায়নি কন্দর্পবাবু তাই করতে বাধ্য হয়েছে আজ। চারিদিকে কৌতূহলী জনতা; দূর থেকে তাকে ইসারা করে দেখায়। চাপা স্বরে আলোচনা শুনতে পায় অনেক রকমের। মনে জ্বালা ধরে ওঠে। বাড়ীতে কোন খবর দেয়নি ইচ্ছে করেই। স্টেশনে গাড়ী পাল্কী কিছুই আসেনি। আজ বহু বৎসর পর প্রথম একা একা সাধারণ পথিকের মত বাড়ী ফিরছে কন্দর্প আচাই; আগে পিছে পাইক বরকান্দাজ সব উপে গেছে। আলপথে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসে কন্দর্প আচাই। ভুবনপুরের বাঁধের নীচে শালপাতা সর মানা দিয়ে ঝুপড়ি গড়ে উঠেছে। বাঁধে কাজ করতে আসা বিলাসপুরী কুলি কামিনরা বাগানের ছায়ায় চারপাই পেতে আসর জমাচ্ছে। গাছের ডালে বাবুইদড়ির সিকেতে ঝুলছে তেলকালিমাখা মাটির হাঁড়ি; এদিক ওদিকে চরে বেড়ায় কয়েকটা মুরগী। ওপাশে লালডাঙ্গায় লোহালক্কর জমা করা হচ্ছে।

চমকে ওঠে কন্দর্প আচাই; বাগানের গাছে কুসি কুসি আম এসেছে; কাঁঠাল গাছের ঘন মিশকালো পাতার আড়ালে দু'একটা মুছি পড়তে শুরু হয়েছে, তালপাতা কাঁটাবেড়া দিয়ে ঘিরে শিয়াল চোরের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থাই এবার করা হয়নি। সেইসব ফল পাড়ছে ওদের আধনেংটো ছেলেগুলো নুড়ি ছুঁড়ে।

—অ্যাই! ধমক দিয়ে ওঠে কন্দর্পবাবু।

ছেলেগুলো একটু দূরে সরে গেল মাত্র। লোকটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওরা। ধুলো উড়িয়ে অন্ধকার করে ছুটে গেল পাথর বোঝাই কয়েকটা ট্রাক—উদ্ধত কণ্ঠে শাসন করে গেল তাকে। ছেলেগুলো আবার গাছে ঢিল ছুঁড়ছে, ওর দিকে চাইবারও দরকার বোধ করে না তারা।

এ কোন এক বিচিত্র রাজ্যে এসে পড়েছে কন্দর্পবাবু। বিদেশী অপরিচিতের মত গাঁয়ে ঢুকলো।

—এলে! বাসন্তী এগিয়ে আসে সঙ্কুচিতভাবে।

—হ্যাঁ; না এলেই কি খুশী হতে? কন্দর্পবাবুর কণ্ঠে শ্লেষের সুর। সব কিছু তার কাছে বিকৃত হয়ে উঠেছে—হাজতবাসের গ্লানি সমস্ত মন বিষিয়ে তুলেছে।

—মানব ফিরেছে। সঙ্গে দাদার এক বন্ধুর মেয়েও এসেছে।

কুণ্ঠার সঙ্গে কথাটা জানাল বাসন্তী। মেজাজ সপ্তমে উঠেছিল, বাসন্তীর কথায় দপ্ করে জ্বলে ওঠে। মনে হয়, ওকে সকলেই সন্দেহ করছে কখন কি-

অঘটন ঘটাবে। তাই সাবধান করতে চায়।

—আমাকে কি করতে হবে? কন্দর্প প্রশ্ন করে বিরক্তিভরে।

স্বামীর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল বাসন্তী; দীর্ঘ কয়েক বৎসর বিদেশে থেকে একমাত্র কৃতী সন্তান ফিরলো বাড়ীতে; বাবার মনে কোন ভাবান্তরই নেই।

একমনে শূন্য কাছারি বাড়ীতে বসে কাগজপত্রগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে কন্দর্প। সরকার থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ভুবনপুর—বরসো—মানাবন মৌজার সমস্ত জমি—বসতবাড়ী সরকার থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। স্বপ্ন দেখছে কন্দর্প। বিপদের কালোছায়া ঘনিয়ে আসছে আকাশে আকাশে। ভুবনপুর নিশ্চিহ্ন করে দেবে ওরা। সব গেছে—এইবার আশ্রয়টুকুও হারাতে হবে।

মানবকেও প্রণাম করতে দেখে মুখ তুলে চাইল কন্দর্পবাবু। কোন কথা কইল না। নীরবে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

—হ্যাঁ। এসব কি শুনছি বাবা? মানব গত হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করছে। শূন্য কাছারি বাড়ী। লোকজন কেউ নেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পিতাপুত্র। মানব যেন আজ জবাব চাইছে বাপের কাছে।

—ঠিকই শুনেছ। বিষয়-আশয় থাকলে এমন মালি-মোকদ্দমা হয়।

—তাই বলে ফৌজদারী মামলার আসামী হতে হবে? মান সম্মান—

কন্দর্পের মাথার উষ্ণ রক্তপ্রবাহ বইছে। ঘৃণা—সবাই ওকে আজ ঘৃণা করে। বাসন্তী মানব সকলেই।

—কেন? একমুহূর্ত! হাতের কাগজপত্র ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কন্দর্প আচাই। মুকুটহীন বলহীন সম্রাট্। অভা ডোম, পরমা, গোবরা সবাই গেছে, বাকী যারা তারাও পলাতক। বনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আজ বেদখল হয়ে গেছে। সর্বহারা কন্দর্প আচাই আলাময় দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাইলো। অতীত এক রাত্রের কথা মনে পড়ে। জবাব সেই দিনই দিয়েছিল কন্দর্প। আজ আবার রুখে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

—কৈফিয়ৎ দিতে হবে? তোমার কাছে?

দীপাও এসেছিল আলাপ করতে, দূরে থেমে গেছে। খুনী। চোখমুখ লাল হয়ে গেছে কন্দর্পবাবুর, রাগে কাঁপছে। দীপা সামনেই ওই মূর্তিতে কন্দর্পকে দেখে চমকে দাঁড়িয়েছে। মানবকে দেখছে সে।

মানব বাবার দিকে চেয়ে রয়েছে। বাল্যকাল থেকেই ভয়ে এড়িয়ে এসেছে তাকে। আজ যেন সব ভয় তার কেটে গেছে। দাদু মা নীরবে ওর সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে এসেছে বিনা প্রতিবাদে। চোখের উপর দেখেছে মানব মায়ের নীরব দুঃখভোগ। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তার সারা মন তিলে। অনেক-

সহ্য করেছে, আজ প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর সে। তাই স্পষ্টকণ্ঠে বলে চলেছে সে।

—সকলের প্রতি আপনার কর্তব্য আছে। দাদু মা ওদের দিকে চেয়ে দেখেছেন? আপনার জন্য সকলেই কষ্ট পাচ্ছে।

কন্দর্পই বংশের সব দুর্ভাগ্যের মূল—এই অভিযোগ তার সন্তানও করতে সাহসী হয়েছে।

—মানব। বন্দী সিংহ গর্জন করে উঠেছে—আমি সব বুঝি মানব। দয়া করে উপদেশ আর দিও না।

বাসন্তী ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল ভিতরের বাড়ীতে। মানবকে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে বাসন্তী! দীপা অবাক হয়ে গেছে। এ বাড়ীর কেন্দ্রে কেমন একটা থমথমে রহস্য বাসা বেঁধে আছে। কি যেন গোপন পাপ ওরা লুকিয়ে রাখছে তার কাছ থেকে। রীতিনীতি আইন-কানুন সবই এখানে আলাদা, ঠিক সাদামাঠা নয়।

—মানব! বাসন্তী এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে।

—তুমি থাম মা। মানব মাকে সরিয়ে দিতে চায়।

—কৈফিয়ৎ আমি কাউকে দিইনি, আগেও তাই বলেছি তোমায়। আমাদের মত আর পথ এক নয়।

কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয় কন্দর্প আচাই। চারিপাশ থেকে সব বাঁধন খুলছে। একমাত্র নির্ভর ছিল মানব সেও সরে গেল আজ।

কন্দর্পবাবু ঘরের ভিতর চলে গেল। বারান্দায় মানব দাঁড়িয়ে আছে, মুখচোখে তার অপমানের গাঢ় লাল ছাপ।

—এ তুই কি করলি বাবা? বাসন্তী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বাবার উপর মায়ের এই অসহায় বিশ্বাসকে আজ সহ্য করতে পারে না মানব। কোন প্রতিবাদ করা স্ত্রীর অন্যায় ওর এই বিশ্বাসের জন্যই বাবা আজ কোথায় নেমে গেছে। স্ত্রীর কর্তব্য মা করেনি।

মানবের সামনে আজ জীবনের পথ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বাসন্তীর চোখের জলে পথ পিছল হলেও সেই পথেই সে চলবে।

—তুমিও কি এমনিভাবেই পড়ে থাকবে মা?

মানব যেন মাকে নির্দেশ দিচ্ছে। যোগ্য সন্তান, মাকে আদেস দেবার অধিকার তার জন্মেছে। বাসন্তী চেয়ে থাকে ওর দিকে।

—হ্যাঁ। আমার যাওয়া সম্ভব নয়।

—ভুবনপুরে বসবাস উঠে যাবে জেনেও যাবে না?

—না। যেতে হয় ওঁর সঙ্গেই যাবো।

স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় বাসন্তী। আজীবন ভুল করে এলেও তার স্বামীকে এই দুর্দিনে পরিত্যাগ করে ছেলের সঙ্গে যেতে পারবে না বাসন্তী। সর্বনাশ জেনেও যাবে না।

মানব হতাশা ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে।

—বেশ। তবে ফুটো নৌকায় ভরানদী পাড়ি দেওয়া যায় না। ভরাডুবি হবে সেই কথাই বলছিলাম। এখনও সময় আছে।

মা কোন কথার জবাব দিল না।

দৃশ্যটা নীরবে দেখে গেল দীপা। তার করবার কিছুই নেই। মানবের প্রকৃত পরিচয় সে কিছুটা পেল মাত্র। কঠিন আদর্শবাদী মানব—সকলের মতের বিরুদ্ধে দৃঢ়তর হয়ে দাঁড়বার সামর্থ্য তার আছে। কঠোর কঠিন পুরুষ সে, প্রকৃতির বশ নয়, প্রকৃতিকে পরাজিত করবার প্রেরণা তার মনে।
ওর বাবাকে দেখে শিউরে উঠেছে—কপালে সিঁদুরের ছাপ, লাল কাপড় পরা বীভৎস মূর্তি—কেমন ভয় হয় তার।

বার বার চেষ্টা করেও মানব এই ব্যবধান ঘুচোতে পারেনি। মায়ের জন্য ফিরে ফিরে আসে। ব্যর্থ হয় সেই চেষ্টা।

বড় রাস্তা থেকে গাড়ীখানা বেঁকে গেল; দীপা চুপ করে বসে ছিল; কালীপুর আসার উদ্দেশ্য তার ব্যর্থ হয়েছে। না এলেই হয়তো ছিল ভালো। এতদিন মানবকে দেখেছে বিশেষ মুহূর্তে—নিজের মন এবং তার মনও পরস্পর দেওয়া-নেওয়ার জন্য তৈরী ছিল। ওর অতীত সত্তা—পরিচয় না জেনেও গ্রহণ করলে শোধরাশে পারতো। কিন্তু আজ মানবের সবকিছু জানতে এসে কি এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দীপা—আঘাতই পেয়েছে। বার বার চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না অত্যাচারী লম্পট খুনে এক জমিদারের বিষরক্ত ওর শিরার—আজকের এই সভ্যতার মুখোশ খুলে সেই পরিচয়টা কখন ফুটে বের হবে কে জানে! অজ্ঞাতেই মনের অতলে জমে উঠেছে একটা বিতৃষ্ণা।

—কোথায় চলেছি?

গাড়ীখানা অন্যরাস্তায় চলেছে দেখে প্রশ্ন করে ক্লান্ত স্বরে দীপা।

এই অভিসার শেষ হলেই যেন নিশ্চিন্ত হয় সে।

মানব বলে ওঠে।

—একটু দেখা করে ফিরবো কলকাতায়।

—কার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ?

মানব দীপার মনের এই ঝড়ের সংবাদ জানে না। জানতেও পারেনি। ওর কথায় বলে ওঠে—চলই না। মানব হালকা হাসিতে মুখ ভরে তোলে।

ছোট্ট রাস্তাটা দিয়ে গাড়ী চলেছে। দূরে ছায়াঘেরা একখানা গ্রামের সাদা দালানগুলো দেখা যায়।

চকমিলান বাড়ী। সামনে খানিকটা ফুলের বাগান, বিশাল গেট ; রং করা রেলিংগুলো উঠে আছে। লাল সুড়কি ঢালা পথটার দুপাশে ফুলের কেয়ারি—একটা চাঁপা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটেছে, বাতাসে তারই সৌরভ! লাল-হলদে গোলাপগুলো বাগান ভরে রেখেছে। গাড়ীখানা হর্ন দিয়ে গেটে ঢুকতেই বাগানের ওপাশে কে যেন চেয়ে দেখে এগিয়ে আসে।

গাড়ী থামিয়েই নেমে এগিয়ে যায় মানব।

—বৌদি।

—তুমি! টুনুবৌদির টকটকে রং লালচে হয়ে ওঠে উত্তেজনায়। মানব বাগানের চারিপাশে চেয়ে বলে ওঠে।

—তুমি এ বাড়ীতে আছো তা চোখবুজে বলে দিতে পারি।

—কেন!

—নইলে এর চারিপাশ এত সুন্দর করে তুলবে কে? যাতে হাত দেবে তাই ফুলে ফলে ভরে উঠবে।

—হ্যাঁ। তবে শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ। কচের জীবন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, দেবযানীকে সে পায়নি। ব্যর্থ জীবনে শিখেছিল সঞ্জীবনী মন্ত্র ; নিজের জীবন বাঁচাতে পারেনি—মন্ত্র দিয়েছিল অন্যকে। যাক্ ··এসেছো মনে করে।

—কি যে বল!

হঠাৎ টুনুবৌদির চোখ পড়ে গাড়ীর দিকে—ওকে বসিয়ে রেখেছো?

লজ্জায় পড়ে মানব—ও হ্যাঁ, এসো পরিচয় করিয়ে দিই। ওই দীপা। ইনি—

দীপা হাত তুলে নমস্কার করে—থাক, চিনেছি ওঁকে।

টুনুবৌদির দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে দীপা, বৌদিও দেখছে তাকে।··· রূপ! দীপা অবাক হয়ে যায়। এত রূপ এত রং স্বাস্থ্য সে দেখেনি। একরাশ চুল ঘাড়ের কাছে খোঁপা করে বাঁধা।

টুনুবৌদি ওর কাছে এসে দাঁড়ায়,

—চল ভিতরে চল দীপা।

—আমাকে যে আজই কলকাতায় ফিরতে হবে।

—তাই কি হয়! এলে দুজনে অন্ততঃ একটা দিনও থেকে যাও। দীপার মনে যে ঝড়ের সুর উঠেছে। মানব চুপ করে আছে। থাকতে আপত্তি তার নেই।

দীপা একটু কঠিন স্বরেই বলে ওঠে।

—আমার পক্ষে অসম্ভব বৌদি, উনি নাহয় থাকুন। আমি একাই গাড়ী চালিয়ে যেতে পারবো।

বাধা দেয় টুনুবৌদি—তা হয় না। মানবও ফিরবে তোমার সঙ্গে।

একটু চুপ করে গেল বৌদি। দীপা মাথা নামালো। বেশ বুঝতে পারে ওই বুদ্ধিমতী মেয়েটির চোখ এড়ায়নি দীপার এই অসহিষ্ণুতা।

চা খাবারের আয়োজন করেছে বৌদি। দীপা দোতালা থেকে চেয়ে দেখছে বাইরের দিকে। গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে হলদে পাতাঢাকা শালবনরেখা, ওদিকেই রূপালী বালুভরা নদী।

—বৌদি! মানব দীপার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়েছে। টুনুবৌদিকেও আঘাত করে কথা বলাটা পছন্দ করেনি।

বৌদি মুখ তুলে চাইল—কি যেন বেদনা ঝরে পড়ে ওর চোখে।

—ওকে নিয়ে আসা ভুল হয়েছে বৌদি।

বৌদি কথা বললো না। মানব অনুভব করে কোথায় নিবিড় ব্যথা জমে আছে বৌদির। মানব কথাটা পাড়ে।

—কলকাতা ছেড়ে এখানে এলে কেন?

—এইতো বেশ আছি। বৌদি হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে হাসিতে ফুটে ওঠে অনন্তের পুঞ্জীভূত বেদনার কালো ছায়া।

—তোমার কথা কোনদিনই ভুলিনি বৌদি।

মানবের কথায় ওর দিকে চাইল টুনুবৌদি; বলিষ্ঠ সুন্দর যুবক—চোখে মুখে স্তব্ধ একটা ছায়া। শিউরে ওঠে টুনুবৌদি! সনতের সঙ্গে ওর মুখের আদল অনেকটা মেলে।

অতীতের একটি দিনের বেদনাতুর স্মৃতি ফুটে ওঠে ওর সারা মনে। সনৎও এমনি করে কথা বলেছিল বিদেশিনী একটা মেয়েকে এনে। তখনও অভিনয় করেছিল ভালবাসার।

আজ! একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে টুনুবৌদি!

—চল, দীপা একা রয়েছে।

মানবের কথার কোন জবাব দিল না বৌদি। খাবারগুলো নিয়ে ও-ঘরে চলে

গেল। এড়িয়ে গেল মানবের সব প্রশ্ন।

দীপা ঘড়ির দিকে চাইতে থাকে চায়ে চুমুক দিতে দিতে।

—পাঁচঘণ্টা লাগবে যেতে।

—হ্যাঁ। টুনুবৌদি জবাব দেয়।

মানব কি ভাবছে। দীপা গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে আগে থেকেই।

একটি মুহূর্ত। সিঁড়ি দিয়ে নামছে দুজনে। থমকে দাঁড়াল টুনুবৌদি ওর ডাকে; মানব এগিয়ে আসে ওর কাছে, অসহায় কণ্ঠে বলে।

—রাগ করেছো বৌদি? এত বছর পর এলাম, বিলেত গিয়ে সাহেবও হইনি; মেমসাহেবও আনিনি, তবে অপরাধটা করলাম কোথায়?

হাসে টুনুবৌদি—ওযে মেমসাহেবের বাড়া।

হেসে ফেলল মানব। আকাশের কালোমেঘ সূর্যের সোনালী আলোয় ঢেকে যায়।

—একদিন এসো। টুনুবৌদি আমন্ত্রণ জানায় ওকে।

মানব গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। দীপা মন্তব্য করে—ফিরেছো তাহলে!

মানব কথা কইলো না। একবার ওর দিকে বেদনাহত দৃষ্টি মেলে চাইল মাত্র।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে দীপা—মানবের সম্বন্ধে যে মোহ তার মনে ছিল, আজ ওর পিতৃপরিচয় বংশগৌরব আরও অনেক কিছু দেখে কেমন ফিকে হয়ে আসছে। এখানে এসে আবার নোতুন কি যেন দেখতে পেয়েছে। টুনুবৌদিও দেখে গেল সন্ধানী দৃষ্টিতে।

এসে হয়তো ভালই করেছে দীপা, নইলে তাকে ভুলের বোঝা বইতে হ'ত বহুদিন।

কালীপুরে ব্যারেজ গড়ে উঠেছে। এখনও নদীর বুকে 'পিলার কাস্টিং' শেষ হয়নি। বালির নব্বই ফুট নীচ থেকে পিলার গেঁথে উঠছে; দেড়মাইল লম্বা ব্যারেজ-এর ভিত্তি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশন। কালীপুর-মামড়ার জঙ্গল কাটাই শুরু হয়েছে। নদীর দুধারে গ্রানাইটের স্তর ডিনামাইট চার্জ করে ফাটানো হচ্ছে। ধ্বসে পড়ছে পাথরের স্তূপ।

—বুম্-ম্-ম্।

কাঁপছে ভুবনপুরের মাটি। ঘর-বাড়ী দরজা-জানালা কাঁপছে থর পর করে। যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে। জীর্ণ ভুবনপুর বন্দী জানোয়ারের মত ভয়ে কাঁপছে। ফট্ ফট্ ফট্—মেসিনগান ফায়ারিংএর মত তীক্ষ্ণ শব্দ নিস্তব্ধতা ভেদ করে এগিয়ে আসছে। ওয়েলডিংএর শব্দ। হ্যাঁ। শত্রুগণ আক্রমণ করছে ভুবনপুর।

নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ধড়মড় করে উঠে বসে কন্দর্প আচাই। ঘুমের শান্তি তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে ওরা। বাসন্তী ম্লান আলোয় ওর মুখচোখে থমথমে আতঙ্ক দেখে বিস্মিত হয়। এগিয়ে আসে কন্দর্প আচাই, অসহায়ের মত কাঁপছে।

—শোও, উঠলে যে? ও কিছু নয়।

কি ভাবছে কন্দর্প আচাই। কারা যেন দল বেঁধে হানা দিয়েছে ভুবনপুর লুঠ করতে; কোথায় গেল বরকন্দাজ-পাইক দল। দুর্মদ অভা'ডোম—পরমা! মাথায় উষ্ণ রক্তস্রোত বইছে। চীৎকার করবার চেষ্টা করে কন্দর্প।

শুনছো? স্বামীকে ডাকছে বাসন্তী।

ওর আতঙ্কবিস্ফারিত চাহনি সহজ হয়ে আসে ক্রমশঃ।

—ও! হ্যাঁ, এমনিই ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক গ্লাস জল দাও। জল।

কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে পিপাসায়। কন্দর্প আচাই কি দুঃস্বপ্ন দেখছিল রাতের গভীরে! জানলা দিয়ে দেখা যায় মানাবনের পাশে হাইপাওয়ার ইলেকট্রিক সার্চলাইট জ্বলছে শালখুঁটির মাথায়; ট্রাকটারগুলো চারিপাশে বাঁধ দিচ্ছে পাহাড়প্রমাণ, দামী যন্ত্রপাতি দামোদরের হড়পা বানে যাতে ডুবে না যায় তাই বালির পাহাড়প্রমাণ বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখছে। সিমেণ্ট মিক্সচার যন্ত্রগুলো ঘুরছে—ওদের বিশাল গহ্বর থেকে বের হয়ে আসছে মিক্সচার, বালির অতলে ঢুকছে সেগুলো। রাক্ষসী নদীর পাতাল জোড়া গহ্বর বোঝাই করে দিচ্ছে ওরা। দিনরাত্রি কামাই নেই ওদের কাজের। অন্ধকারে জ্বলছে আলোগুলো—আকাশবাতাসে তারই গর্জন।

—জানলাটা বন্ধ করে দাও।

নিষ্কৃতি পেতে চায় কন্দর্প ওদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে।

দীপার মনে কোথায় একটা বেসুরো বাজছে! চিরকালই মাথা উচু করে এসেছে সে। প্রাচুর্য বিলাস-ব্যসনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তার চারিপাশে যারা ভিড় করে এসেছে—তারাও স্বীকার করে নিয়েছে দীপার এই প্রাধান্য। এইটাই দীপার আকর্ষণ। মানব এদের থেকে স্বতন্ত্র।

ওর পিতৃপরিচয়, বংশকলঙ্ক সবই স্বীকার করতে পারতো দীপা যদি—মানব ওই ধাতের না হোত। কিন্তু মানব এই রঙ্গীন মানুষের জাত থেকে স্বতন্ত্র।

দীপা বলে ওঠে মানবকে—এখানে যে আসা যাওয়া কর সেটা কি বৌদি তোমার জানেন? ওই টুনুবৌদি!

—মানে? মানব একটু কঠিনস্বরে প্রশ্ন করে। দীপার কথায় একটা জ্বালা

রয়েছে।

—জানেন বলে মনে হয় না। ওঁর অমতে—

বাকী কথাটা মানব বলে ওঠে—ওঁকে চেনোনি দীপা, মনের খাদ ওঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তাই হয়তো সহ্য করতে পারোনি ওঁকে।

—তাই নাকি। কণ্ঠে বিদ্রূপের স্বর ফুটে ওঠে।

হ্যাঁ ; অন্যায়ের প্রতিবাদ বৌদি করবেনই। ন্যায়কে স্বীকার করতেও তিনিই পারেন। স্বামীর অন্যায়কেও ক্ষমা করেননি।

—লক্ষ্মণ দেওর! দীপা কথায় এতটুকু শ্লেষ আনা যায় তাই এনেছে। মানব কথা বললো না। নীরবে উঠে গেল।

দীপার মনে কোথায় সেই ছবিটা আজও ভেসে ওঠে। মানব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, সামনে সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী কন্দর্প আচাই! দু'চোখে তার কি দুঃসহ ব্যর্থতার জ্বালা! বয়স হয়ে গেছে তবু সে অনমনীয়, কঠিন শপথের মত ঋজু। দুজনের মাঝে দুটি যুগ—বিদায়ী পুরাতন আর সামনে তার যুদ্ধোদ্যত আগামী কাল।

মানবের সেই রূপও ক্ষমা করতে পারতো—কিন্তু বিদ্রোহী মন সোজা পথে চলে না ; নিজে প্রতিবাদ করতে চায়—তাই প্রতিবাদের জ্বালায় ঝলসে ওঠা ওই রূপবতী বৌদিকে নিবিড়ভাবে ভালবাসে মানব। দুজনের প্রকৃতির কোথায় একটা মিল আছে।

ভালবাসা! কথাটার মানে যে অন্য রকম। কিন্তু দীপা নিজের চোখকে অবিশ্বাস করে না। মানব হয়তো নিজেই সে খবর জানে না। তবুও সেটা সত্যি।

একদিন সেই সত্যই ওর সারা মনে ঝড় তুলবে—ভিত নড়িয়ে দেবে। মিথ্যাই স্বপ্ন দেখেছিল দীপা—মিথ্যা রঙ্গীন আশার জাল বুনে জীবনের মূল্যবান ক'টা বছর আসমানে উড়িয়ে দিয়েছে।

·· কঠোর কঠিন সমস্যাবিজড়িত জীবনপ্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে চায় দীপা। হেসে ফেলে। প্রজাপতির মত হালকা পাখায় ফুলে ফুলে উধাও হবার স্বপ্ন তার চোখে—মনে। আবার সেই সহজাত প্রকৃতিগুলো জেগে উঠেছে। মানব! তাই মানবকে সে যেন চেনে না আর চিনতে চায় না।

কলেজে বান্ধবী মীরাকে আসতে দেখে এগিয়ে যায়, বহুদিন পর আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে দীপা ; শাড়ী আঁচল লুটিয়ে পড়ছে। গুন গুন সুরে গেয়ে মীরাকে জড়িয়ে ধরে,

—এতকাল যে বসে ছিলাম, পথ চেয়ে আর দিন গুনে

দেখা পেলাম ফাল্গুনে॥

মীরা অবাক হয়ে যায়, হাসতে থাকে ওর ব্যবহারে।

—কিরে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি নাকি? দেখাই নেই! শুনলাম যুগলে ঘুরে এলি?

হাসবার চেষ্টা করে দীপা—আয়। কেমন আছিস?

—কই আর আছি? বিয়ের আগেই 'হনিমুন' করবার লোকও পাচ্ছি না।

—দুঃখ হচ্ছে? দীপা হালকা পরিহাস করে—এই বাহ্য; ভিতরে ভিতরে যে অগ্নিগর্ভ পর্বত তা তো জানিস না। সেইানে ফসলও ফলে না। ফুলও ফোটে না। শুধু পাথর আর পাথর।

মীরা একটু বিস্মিত হয়ে গেছে; দীপার মনে কোথায় যেন একটা বেসুর বাজছে, তার সন্ধানী চোখ এড়াতে পারে না সে।

—কি হয়েছে তোর বল দিকি!

—কিছু না, বড্ড টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। দীপা সত্যেই আজ ক্লান্ত।

—এরই মধ্যে? সবে তো শুরু—মীরার কথায় হেসে ফেলে দীপা।

—আবার কলেজেই ফিরবো ভাবছি।

দীপার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মীরা—কোন্ দুঃখে? মেয়েরা পড়ে ভালো বর পাবার জন্য—নিদেন পক্ষে একটা চাকরী। তোর ভালো বরই জুটে গেছে—পড়ার কষ্ট আর কেন কন্যে?

দীপা ঠিক পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারে না কথাটা; মনে হয় তেমনি উধাও জীবনই তার কাছে কাম্য। বাঁধন মানতে হয়তো ভয় পায় সে। নিজেই বলে দীপা।

—চল, ইভনিং শোতে ছবি দেখে আসি।

—তাঁর কোন অসুবিধা হবে না তো? মীরা ইতঃস্তত করে।

—কারোর তাঁবে বাস করি না মীরা; চল।

দুই বান্ধবীতে বের হল সিনেমায়। দীপা নিজেই গাড়ী চালাচ্ছে।

—ব্যাপার কি বল দিকি, মান-অভিমানের পালা চলছে নাকি?

দীপার চালচলন কথাকার্তা সবই কেমন রহস্যময় ঠেকে মীরার কাছে,—কে জানে বড়লোকের মেয়ের খেয়াল! দুদিনেই সখ মিটে গেছে তাই বিয়েতেও আর বিশ্বাস নেই।

দীপার মনে ঝড় উঠেছে। মানবের বাবা মা দাদু ওরা সবাই অন্য জগতের বাসিন্দা, একালের সঙ্গে কোন মিল তাদের নেই। দীপার জীবনে সেদিনের অভিজ্ঞতা তাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে—বিয়ে ভাল লাগবে না রে; ও বন্দীদশা।

—তুই মত দিবি না? মীরা প্রশ্ন করে অবাক হয়ে। ওদের জীবনে এমন বিলেতফেরৎ পাত্র—স্বপ্ন কথা।

—না। এ বিয়ে নয়—নিজের স্বাধীন সত্তার সম্পূর্ণ বিলোপ। আমি এতে রাজী নই। মন চায় না, কি করি বল?

—মানববাবুকে বলেছিস। ও বেচারী তো হাবুডুবু খাচ্ছে শুনলাম।

দীপা কথা বললো না। চুপ করে থেকে বলে ওঠে—দরকার হলে বলবো। ওই মাটির মায়া কোনদিনই ভুলতে পারবে না; সেও ওই বংশের সন্তান রক্তের মধ্যে কর্তৃত্ব-প্রধানের বিষ রয়েছে। মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেরী হবে না। ওরা সবাই আদর্শ পাগল—বুঝলি। এ ধরণের ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না।

ছবির পর্দার দিকে দীপার নজর নেই; সে যেন নিজের মনের কথাগুলো আর কাউকে শোনাবার জন্যই মীরাকে ধরে এনেছে সিনেমায়।

মানব সন্ধ্যা থেকে এসে বসে আছে। মিঃ ব্যানার্জি বারকতক এদিক সেদিক ঘুরে কি কাজে বের হয়ে গেলেন।

—তুমি বসো মানব, আমার একটা জরুরী মিটিং আছে। দীপা কোথায় যেন গেছে—অবশ্য ফিরতে দেরী হবে না।

মিসেস ব্যানার্জি দীপার ফিরে আসার পর হতেই কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়েছে। কোথায় একটা ওলটপালট ঘটেছে দীপার চিন্তাধারার, আজ বেশ বুঝেছেন ইচ্ছে করেই দীপা সরে গেছে। মেয়ের ব্যবহার ভাল চোখে দেখেন না। তবু কথাবার্তা বলেন সময় কাটাবার জন্যই।

—তোমার বাবা-মা ভাল আছেন? হ্যাঁ—এদিকে কি যেন একটা ইণ্টারভিউ-এর কথা ছিল, হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, দিয়ে এলাম ইণ্টারভিউ, তবে মনে হয় চাকরি সেখানে হবে না।

—কেন?

—যিনি ইণ্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি কোয়ালিফিকেশনের দিক থেকে আমার নীচে।

দীপার মা যেন একটু হতাশই হয়। ওদিকে দীপার মুখে শুনেছেন মানব বাবার সঙ্গে কি যেন গণ্ডগোল করে এসেছে। তার বাবা স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিয়েছেন—ও বাড়ী আর না যেতে। সবদিক থেকে মিসেস ব্যানার্জি যেন একটু নিরাশ হয়েছে। স্রেফ চাকরি—তাও যদি মনোমত না জোটে, মেয়ে দেবে কাকে!

—চা দিয়ে যাচ্ছে; তুমি বসো—আমি ওদিকের কাজ দেখে আসি। একটা

বাবুর্চি নিয়ে সংসার চলে না ; হিমসিম খেয়ে গেলাম।

মানব উঠে আসছে। রাত্রি হয়ে গেছে। দীপা যেন ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে গেল। যেদিন মানবের সবচেয়ে দীপাকে কাছে পাবার বেশী প্রয়োজন—সেই দিনই নিষ্ঠুর নারী তাকে চরম আঘাত হানবার চেষ্টা করছে।

হেডলাইট জ্বেলে গাড়ীখানা এসে থামল। নিজেই চালিয়ে ফিরছে দীপা। মানবকে দেখে থামল, মুখেচোখে তার বিরক্তির রেখা পরিস্ফুট।

—তুমি ?

—কোথায় গিয়েছিলে ?

—ছবি দেখতে। শরীরটা ভাল নেই, দারুণ মাথা ধরেছে।

—শোন !

কথার অপেক্ষা না করেই উঠে গেল দীপা। একলা দাঁড়িয়ে থাকে মানব। কি ভেবে রাস্তার দিকে এগিয়ে আসে। চাকর-বাকররা ওই দৃশ্যটা দেখেছে কিনা কে জানে ? সারা মনে একটা গ্লানি জমে ওঠে। নিজের উপরই একটা ধিক্কার আসে তার।

ক'দিন ধরে যায়নি মানব ওদিকে ইচ্ছা করেই। নতুন চাকরি স্থির হয়ে যাবার পর একটা বোঝা তার মাথা থেকে নামে। মনের মতই কাজ পেয়েছে। রিভার ভ্যালি ডেভেলাপমেণ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সে। কলকাতার বাইরে কাজ—বন-পর্বত সীমাঘেরা কোন্ অঞ্চলে তাকে যেতে হবে কে জানে। মাথা উঁচু করেই আজ এ বাড়ী ঢোকে মানব।

মিঃ ব্যানার্জি খবরটা পেয়ে খুশিতে উপছে পড়েন, আবেগভরে মানবকে জড়িয়ে ধরেন।

—কনগ্রাচুলেশন মাই বয় ; তুমি স্কোর করবেই এ বিশ্বাস আমার আছে। ধাপে ধাপে উঠে যাবে নিশ্চয়।

মিসেস ব্যানার্জি শশব্যস্ত হয়ে হাঁক পাড়ে—দীপা ! গেল কোথায় সে মেয়ে ? দীপা হাকাহাকিতে বের হয়ে আসে ভাবলেশহীন মুখে।

সেই রাত্রির পর আজ প্রথম আসছে মানব মিঃ ব্যানার্জিকে সংবাদ দেবার জন্যই। দীপার মা টেবিলে একগাদা খাবার চা এনে হাজির করেছে।

—খাও বাবা। দীপা জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেনা ?

মায়ের অকারণ এই আপ্যায়ন সহ্য করতে পারে না দীপা। চুপ করে বসে আছে ওদিকে। বাবা ক্লাবে চলে গেছেন। মা অন্যদিকে কাজে ব্যস্ত। দুজনে চুপ করে বসে আছে—দীপা আর মানব।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বাগানের সুপারী গাছে জমেছে আবছা অন্ধকার; বাইরের রাস্তায় নিওন লাইটের নৃত্যশীল আলোর আভা বিবর্ণ ছাপ এনেছে। মানব জ্বলন্ত সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে দীপার দিকে চাইল।

—দীপা! মানব সেই প্রশ্নের জবাব চায়।

দীপা ওর এত দিনের মনে জমানো কথাগুলো বলে ফেলে—আমার মত নেই, অসুবিধা আছে। দীপার কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠেছে।

মানব ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দীপার চোখের উপর ভেসে ওঠে কন্দর্প আচাই-এর মুখ। ওর বাবার উপর দীপার ঘৃণা। টুনুবৌদিকেও সহ্য করতে পারেনি। মানব এসবের খবর রাখে না। তাই প্রশ্ন করে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বললে ভাল হয়।

দীপা জবাব দেয়—সব কথা খুলে বলা যায় না। তার দরকারও নেই।

—টুনুবৌদি, আমার বাবা-মায়ের সম্বন্ধে কিছু বলবে? মানব প্রশ্ন করে।

মুখ তুলে চাইল দীপা—ওর চোখের চাহনিতে সেই কথারই সমর্থন ফুটে ওঠে। জবাব দিল না মানবের প্রশ্নের। মানব বলে ওঠে—তাঁদের সম্বন্ধে আমার মতামতও জেনে এসেছো। আমার আদর্শকে আমি শ্রদ্ধা করি—তার জন্য সব কিছুই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আমি।

দীপা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জবাব দিল—আদর্শ অপরেরও থাকতে পারে।

—তোমার সংঘাত কি সেইখানেই? মানব প্রশ্ন করে।

—হয়তো তাই। আমিও আমার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি। দীপা জবাব দেয়।

—যদি ভুল পথ হয়?

মানবের কথায় বলে ওঠে দীপা—কে ঠিক, কে ভুল তার মীমাংসা হয়নি আজও। তবে আপনি যে নিষ্ঠুর আদর্শবাদী সেটা জানা হয়ে গেছে।

—নিষ্ঠুর? হয়তো একালের প্রাণহীনতাই তার জন্য দায়ী; আমি নই।

—জোর করে মীমাংসার চেষ্টা না করাই ভাল মানববাবু। তাতে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই কোথায় একটা ভুল করে এসেছিলাম আমি এতকাল, সে ভুল আজ আমার ভেঙ্গেছে।

দীপার চোখেমুখে দৃঢ়তার ছায়া; হালকা নীল রংএর শাড়ীখানায় দৃপ্ত যৌবন ফুটে উঠেছে, গাঢ় নেলপালিশ লাগালো ম্যানিকিওর করা নখগুলোর কি যেন শ্বাপদ জন্তুর নখের মত রক্তলেখা—চোখেমুখে কামনার নগ্নপ্রকাশ। বাঁধনহারা বেপরোয়া নারী, আজ বাঁধনের সীমায় এসে হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে।

—রাত হয়েছে। আপনি আসুন।

—কালই আমি কলকাতার বাইরে চার্জ নিয়ে চলে যাচ্ছি। মানবের কথাটায় যেন বেদনা ঝরে পড়ে।

—সেই-ই ভাল। দীপা নিশ্চিন্ত হতে পারে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীপা ; যৌবনের নগ্ন মাতনতোলা নারীত্ব ; আধুনিক সমাজের পুঞ্জীভূত ভোগলিপ্সা-মত্ত সফেন উচ্ছলতা জমেছে ওর দেহমনে। প্রজাপতির মত উপভোগের রঙ্গীন পাখায় ভয় করে উধাও হতে চায় রূপ রস বর্ণভরা অসীম দিগন্তে। নেশার ঘননীল ঢেউ-এ ডুব দিতে চায়।

—মানব চলে গেল ?

কতক্ষণ দীপা দাঁড়িয়ে ছিল জানে না।

মাকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল দীপা—হ্যাঁ।

—কি বললি ওকে ?

—আড়াল থেকে সবই তো শুনেছো। আই ডোণ্ট লাইক হিম এনি মোর। সব দিক থেকেই ও একটা ন্যাস্টি। যেমন বংশ, তেমনি ওর বাবা ; তেমনি নিজে। অল এলাইক।

চমকে ওঠে মিসেস ব্যানার্জি ; মেয়ের পছন্দ যে এত ঠুনকো তা জানতো না, এ যুগের গহনার মত। একটু আঘাতেই ডিজাইন বদলাতে হয়।

—দীপা ! আপশোষ ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে। এমন সুন্দর লোভনীয় একটি ছেলেকে সে কিনা ঘর থেকে দূর করে দিল !

—জোর করে কিছু করতে চেওনা মা। ওরা বড্ড সেকেলে। ওর বাবা একটা ফৌজদারী মামলার আসামী। খুনী ডাকাতসর্দার। মানবও তেমনি একগুঁয়ে কাঠগোঁয়ার—খেলিস বদলেছে মাত্র। ভিতরে সব এক। তাছাড়া—কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

টুনুবৌদির কথা মনে পড়ে। অসহ্য !

মা বলে—হোক, তবু মানবের মত ছেলে ক'টা আছে ?

—দীপার মত মেয়ে সোসাইটিতে ক'টা আছে মা ? জেনেশুনে একরাশ ভুলকে বইতে আমি পার্বো না। আমিও ফেলনা নই। রূপগুণ কি নেই ?

—ছাই। রূপের কি দাম ! তোর দাম আজ বুঝতে পারবি না দীপা, জোয়ার চলে গেলে ভাঁটায় বুজে আসা নদীর সঞ্চয় কিছু থাকে না।

দীপা নিওন লাইটের নীচে দাঁড়িয়ে ক্লান্তিতে হাই ছাড়ে, বাতাসে উড়ছে ডিপ ব্লু শাড়ী। সিফনের ঘন লাল পেটকাটা ব্লাউজে পড়েছে আলোর আভা, একটা প্রজাপতি যেন ডানা মেলে উড়ে চলেছে। মিসেস ব্যানার্জি স্তব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওই সর্বনাশা মেয়ের দিকে। মনে মনে শিউরে ওঠে।

ধূ ধূ বালুচরে ঝড় উঠেছে। আগুনের মত ঝাঁঝালো গরম বাতাস গায়ে লাগছে। ঝিম ঝিম বাজছে বালুকণা বাতাসে।

তারই মাঝে নদীতে কাজ করছে ওরা। কঠিন কঠোর জীবন। ভীষণ ধ্বংসকে রুখতে গেলে এমনি সর্বনাশা দুঃখভোগের সাধনা করতে হয়। স্বর্গের তেজ যেন অগ্নিকণা হয়ে ঝরছে।

বড় বড় মেসিন, বুলডোজারগুলো কাঁকড়ার মত নড়াচড়া করছে। দমকা হাওয়া বাধা দিতে আসছে ওদের। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। শালবনে ঝড় উঠেছে। কাঁপছে রোদপোড়া তামাটে প্রান্তর।

প্রায় তিন মাইল চওড়া হয়ে এসেছে নদী, দুপাশে শালবন কালো গ্রানাইট পাথরের বেষ্টনীর চাপে ছোট হয়ে হঠাৎ নরম মাটিতে জনপদের সীমানায় এসে বিস্মৃত হয়ে গেছে অনেকখানি। এর তীরেই ভুবনপুর। বাঁধ দিয়ে ঠেকান আছে নইলে নদীর জল ঠেলে ঢুকতো এর বুকে।

গ্রানাইট পাথরের সীমানা থেকে দুপাশে দুটো করে বাঁধ দিয়ে কানেল শেপ করে আনা হচ্ছে নদীটাকে, বিস্তার কমিয়ে এনে মুখে ব্যারেজ করা হবে। সামনের দিকে পাহাড়ে মৃত্তিকার স্বাভাবিক প্রাচীর—বনসীমার নীচে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃত্রিম জলাধার হচ্ছে। ব্যারেজের দুপাশে দুটো যেন ক্যানেল, সমস্ত সঞ্চিত জলরাশি দুপাশের ক্যানেল দিয়ে আর বাকী জল ব্যারেজের স্লুইস গেট দিয়ে নেমে যাবে নদীর খাতে।

ক্ষুরধারা পাগলা নদীকে বাঁধা হচ্ছে। ভুবনপুরের নীলে হাড়ীর মা এখনও বেঁচে আছে। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ। শন-নুড়ির মত একমাথা চুল—বাতাসে ফিরফির করে উড়ছে। বিড় বিড় করে গাল দেয়।

—মরবি, নদীর বানে গাড়া যাবি বিবাক, যমভরাগুলো। দ্যাবতা দামোদরকে বাঁধবি তুরা?

হাসছে বুড়ী হি হি করে, লাল দাঁতপড়া মাড়ি দিয়ে লালা গড়ায়।

—এ বুড়ী মায়ি!

রাস্তার উপরেই কাঠের বোঝাটা নামিয়ে জুড়ী দেখছিল ওদের কাণ্ড-কারখানা—একটা জিপ এসে পিছনে হর্ণ দিচ্ছে, সেদিকে বুড়ীর খেয়াল নেই।

—এ বুড়ী মায়ি!

ফ্যাঁচ করে ওঠে বুড়ী—তোর বাপের রাস্তা নাকি? উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস, জানিস আমি কার মা? তার নামে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল

খেতো, সবই আমার বরাত।

ড্রাইভার বাধ্য হয়ে নেমে এসে কাঠের বোঝাটা একপাশে সরিয়ে গাড়ী নিয়ে বের হয়ে গেল। উড়ছে ধুলোর রাশ, বুড়ীর দম বন্ধ হয়ে আসে।

নদীর বুকে এলাহি কাণ্ড চলেছে। বালির উপরে বসেছে ট্রলি লাইন; টিবিং ওয়াগন বোঝাই রুবল সিমেণ্ট পাথরকুচি চলেছে ওয়ার্কসাইটে; ভারী ক্রেনগুলো 'প্যান. করছে আসমানে লোহার জয়েস্টগুলোকে দাঁতনের মত তুলে নিয়ে।

বনের বুকে রাস্তা গড়ে উঠছে। ইটখোলা গজিয়ে উঠছে অনেক। বনের আদিম অন্তরে মানুষ ঢুকেছে। কৃপাল সিং সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। আবার পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। এবার যেন ফুলে উঠেছে সে। পাথরের কোয়ারী ঠিকে নিয়েছে বাঁকুড়ার ওদিকে; কালো প্রথম শ্রেণীর এলুভিয়ান মেটামরফিক পাথর এনে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে জমা করছে। চুনের জল ছিটিয়ে স্তূপের নিশান করা—উচ্চতা আর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দেখে দাম স্থির হবে মালের।

মামড়ার জঙ্গলেও পাথর খুঁড়ছে সে। রাস্তা তৈরী হচ্ছে শাহী সড়ক পর্যন্ত তাছাড়া বনের অন্ত-প্রত্যতে অনেক রাস্তা বেরুচ্ছে। এতদিন ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরেছে কৃপাল সিং। নোতুন ছোকরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কাজের লোক; জিপ থেকে নেমে লোক দিয়ে গাদা ভাঙ্গিয়ে পাথর দেখে নেয়। রাস্তার মাটির কাজের মাপ নিতে আসে দু'চার দিন পর মাটির ফাঁপ মরলে।

কৃপাল সিং সেদিন মামড়ার জঙ্গলে গভীর সুঁদে পাথর তুলছে; রাস্তা যাবে এর পাশ দিয়েই। খাদটাকে বোজান দরকার। ডিনামাইট চার্জ করেও পাথর ওড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। ছোট সুঁদের ভিতর কেউ ঢুকতে চায় না। কে জানে পুরোনো সাপ নাহয় চিতা বাঘের বাচ্চাই বের হয়ে পড়বে।

মানব এসেছে কালীপুরে ব্যারেজের সুপারইনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। নোতুন জীবনের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। সবদিক থেকে জীবন বঞ্চনা করেছে তাকে। নিজের মনের দৃঢ়তা-দৃষ্টিকোণ তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে গতানুগতিক জীবনযাত্রা থেকে। বাবা-মায়ের স্নেহের আস্বাদ সে পায়নি। বাড়ী থেকেও বাঁধন নেই কোন; দীপা! একটি সুগভীর বেদনাময় স্মৃতি। দীপা তার নিষ্ঠুর বিবর্তনশীল আদর্শকে মেনে নিতে পারেনি; তাই দীপাও ফিরে গেছে তার জীবন থেকে। আজ মানব একা। নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিয়েছে কাজের মধ্যে। সারাদিন কাঠফাটা রোদে জিপ নিয়ে

ঘোরাঘুরি করে। নদীর মধ্যে দুপুরবেলা টেম্পারেচার গিয়ে ১১২° কোঠায় ঠেকে, দাঁড়ানো যায় না। বালি তেলে ফাল হয়ে উঠেছে—মাথার উপর আগুনজ্বালা সূর্য—তার মাঝে শতশত লোক কাজ করছে। শোনহাট মাথায় সাহেবকে দেখে এগিয়ে আসে ট্রাকটর ড্রাইভার রামকিশন।

—গুডমর্ণিং স্যার।

—গুডমর্ণিং। রোদের মাঝে চেয়ে থাকে নদীর দিকে। বর্ষা এগিয়ে আসছে। তার আগেই দুটো কাস্টিং শেষ করতে হবে। বহু মেসিনারী পড়ে রয়েছে নদীতে। হড়পা বানে যেন ডুবে না যায়।

হড়পা বানের আতঙ্ক এ নদীতে চিরকালই রয়েছে। বেশ শুকনো নদী, হেঁটে গরুর গাড়ীতে পার হচ্ছে লোকজন। হঠাৎ নদীর বুকে প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়—সোঁ সোঁ শব্দ।

হাজারো হাতের করতালি দিয়ে কারা যেন ছুটে আসছে; পর্বত থেকে গড়ানি জল নেমেছে, অতর্কিতে রুদ্রভৈরব হানা দিয়েছে গ্রামসীমায়।

পথিক গাড়ী-গরু সব ভেসে গেল কোন্ দিগন্তে; তবে এখন সে ভয় নেই।

রামকিষণ বলে ওঠে—জরুর। ওতো ছোট বাত সাব; অব্ তো টেলিগেরাফ হো গিয়া, একদম কোনার তিলাইয়াসে খবর আয়েগা, হমলোগ্ ভি তৈয়ার হ্যায়।

বালি ঠেলে পর্বতপ্রমাণ উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘিরে রেখেছে যন্ত্রপাতিগুলোকে যেন 'ওয়াটার ওয়ে' কনক্রিট হচ্ছে দিনরাত্রি ধরে।

সেখান থেকে গিয়ে উঠলো এমব্যাঙ্কমেণ্ট টিমের লোকদের কাছে। বড় বড় বুলডোজাগুলো মাটি কেটে ফেলেছে বাঁধের গায়ে। নীচে জমান হচ্ছে কালো পাথরের চাঁই, যেন বাঁধের পিছনে আরও একটা বাড়তি বাঁধ দিয়ে যাচ্ছে তারা; দুটো বাঁধের মধ্যে গড়ে উঠছে প্রকাণ্ড জলাশয়; মাছের চাষ হবে। পাশ দিয়ে কাটাই হচ্ছে মেইন ক্যানেই। একটা ছোট পাহাড়ী নদীর জলপ্রবাহ পড়েছে ওর পথে, আড়াআড়ি দুটো ধারাকে পার করতে হবে—সাইফন সিস্টেমের কথা ভাবছে মানব। ব্লু প্রিণ্টটা পোর্টেবল তেপায়ায় রেখে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওভারসিয়ারদিকে নির্দেশ দিচ্ছে।

থিয়োডোলাইটের সামনে চোখ রেখে ওভারসিয়ার ঘাড় নাড়ে।

—ইয়েস স্যার।

—লাঞ্চ সাব। বেয়ারা সেই রোদেই এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

সাহেবী চালচলন রেখেছে ওইটুকু মাত্র। সারাদিন কাজ করতে ওই

রীতিটাই সুবিধাজনক। সকালে ব্রেকফাস্ট করে কাজে বের হয়, সারাদিন বাইরে-বাইরে থাকে। সঙ্গেই কিছু সাণ্ডউইচ, ডিমসিদ্ধ, ফ্ল্যাস্কে চা, আর কিছু ফল। এই তার লাঞ্চ—ওটা পথেই সারা হয়।

—নিয়ে এসো।

এ জীবন মন্দ নয়। পাহাড়ী ঝর্ণার জল কালো পাথরে ঠক খেয়ে বয়ে চলেছে; দুপাশের ছায়াবন বিষকরমচা পলাশ গাছের ঘন ছায়া রোদপোড়া তামাটে প্রান্তরের মাঝে শান্তির ইসারা আনে। ক্লান্ত মধ্যাহ্নে পাখী ডাকছে। হিম কাঁচধার জলে দু'একটা মাছ উজানে বয়ে যায়।

একটা পাথরে বসে লাঞ্চ করছে মানব। ওদিকে কুলিরাও বসেছে—ছাতুর ড্যালা পাকিয়ে লঙ্কা দিয়ে খাচ্ছে; কেউ বা এনেছে পান্তাভাত।

মুক্ত উদার প্রকৃতির বুকে সহজ জীবনযাত্রায় মিশে গেছে মানব। সভ্য জগতের নিষ্ঠুর কৃত্রিমতাকে আজ ভুলতে চায়।

ওরা যেন একটু সঙ্কুচিত হয় সাহবকে এইখানেই বসে খেতে দেখে।

ওভাসিয়ার বলে ওঠে—তাঁবুতেই চলুন স্যার।

—এর থেকে তাঁবু কি ভাল হবে? বেশ ছায়া রয়েছে, এইখানেই ভাল।

কুলিকামিন শ্রমিকদের সঙ্গে আর কোন সাহেব এত সহজভাবে মেশেনি। সহকর্মী মহলে মানব তাই দূরে থেকে গেল—এদের কাছে পেয়েছে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

ভুবনপুরের বাড়ীতে থাকবার ইচ্ছা তার হয়েছিল, কিন্তু মাকে কথাটা বলতে গিয়েও পারেনি। বাসন্তী শুনেছে মানবে চাকরির কথা। এখানে থাকতেও তবু বলোনি।

অগত্যা নিজের বাংলোতেই উঠেছে মানব। কন্দর্পবাবুও বলেনি কিছু।

ছেলের চাকরির সংবাদে খুশীও হয়নি, প্রতিবাদও করেনি। মাকে বলে মানব,

—একদিন যাবে না তোমরা আমার নোতুন বাসায়?

বাসন্তী কথাটা শোনে; আজ ছেলে সত্যিই যেন তাদের ছেড়ে সরে গেছে।

—যাবো বৈকি বাবা। হ্যাঁরে—দীপা কেমন আছে?

দীপাকে এখানে আনবার মূল উদ্দেশ্য জেনেছিল বাসন্তী, তার অমতও ছিল না। দীপাকে ভাল লেগেছিল, ওদের মত মেয়েকে সংসারের রোজকার কাজে লাগানো যায় না। ওরা ফুলদানীতে সাজানো মৌসুমী ফুল। তবু ছেলে যদি ওকে নিয়ে সুখী হয়—হোক। তাতে বাধা দিত না বাসন্তী।

—সে আর আসবে না মা।

—কেন রে? মানবের দিকে চেয়ে থাকে বাসন্তী।

—সে অনেক কথা, পরে বলবো একদিন

মানব এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা।

ভুবনপুরের লোকজন উঠে যাচ্ছে এখান থেকে। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে কেউ চলে গেল স্ত্রী ছেলেপুলের হাত ধরে কলিয়ারীর দিকে, কেউ যাচ্ছে কলকাতায়—সামান্য কেরানীগিরি, তাকেই অবলম্বন করে। চাষীদের উপর নোটিশ হয়েছে এই বর্ষায় গ্রামের জমি কেউ চাষ দিতে পারবে না; সমস্ত জমির মালিক এখন সরকার। ভরা ফসলে ওই জমি জলে ডুবে যাবে—ওর বুক ফেড়ে কাটা হচ্ছে মেইন ক্যানেল। হুগলী নদীতে গিয়ে মিশেছে; তিনশো ফুট চওড়া—তেমনি গভীর। বারোমাস জল থাকবে—লঞ্চ চলবার মত।

—সবই হবে বাবা, উৎখাত হবো শুধু আমরা।

নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব দেয় মানব,—উপায় কি মা; বৃহৎ মঙ্গল করতে গেলে ছোটখাট সর্বনাশ ঘটবেই। কালীপুরের স্টেশনের পাশেই বাড়ী করবো ভাবছি। এ সবতো যাবে।

মানবের কথায় বাসন্তী সাড়া দেয় না। এই বাড়ীতে বৌ হয়ে এসেছে সে—কত স্মৃতি, কতদিনের কত তুচ্ছ ঘটনা আজ মনের সামনে ভেসে ওঠে। মানবের বহু দিনও মিশে আছে এই বাড়ীর ধূলিকণায়।

সে সব হয়তো মানব ভুলে গেছে। নিজের ঘরেও সে পরবাসী।

—বাবাকে বলে দেখো। ওদিকের ব্যবস্থা সব করি।

ভাগাড়ে মরা গরু পড়তে না পড়তে শিয়াল শকুনি এসে হাজির হয় নখ দাঁত শানিয়ে। ভুবনপুর—মানাবন—বরসো গাঁয়েও ভিড় জমিয়েছে গরুর পাইকেররা। খড় বাঁশ ঘরের সাজ কেনবার জন্য লোক এসেছে, অন্য গ্রাম থেকে চাষীরা এসেছে লাঙল গরুর গাড়ী কেনবার মতলবে। দাওয়ায় রকে গাছতলায় দেখা যায় ওই দৃশ্য। গোঁজে বাঁধা গরু হাড় পিঠেন টিপে কসাইরা দর করছে।

—ই যে সবই হাড্ডি, গোস্ত কুথা গো?

চাষীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হালের বলদগুলো; দীর্ঘ কয়েক বৎসর একসঙ্গে কেটেছে তাদের বৃষ্টিভরা মাঠে—নাহয় সোনাফসলের স্বপ্নভরা দিনে। আজ সব স্মৃতির সমাপ্তি ঘটে আসছে। মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কিছু টাকায়। পাইকেররা যেন দয়া করছে।

—নাও। বেশী দিলাম কিন্তুক। আর রা কেড়ো না।

হাতে গুণে দেয় ক'খানা দোমড়ান দোলামোচা করা নোট।

রাত্রি নিভৃতে ঝরে কত অসহায় অশ্রু, কালীপুর রাজ্যের ইতিহাসে তার লেখাজোখা রইল না। একে একে তারা হারিয়ে গেল বিশাল পৃথিবীর পথে।

দত্তমশার -পাড়ুই—দাসরা উঠে যাচ্ছে। মানবের বুকে যেন একটা ব্যথা বাজে। ধ্বংসপ্রায়—নীরব ছায়াবন গাঁ; কারা বাগানে ফলন্ত গাছটা কাটছে। কে বলে।

—ফুলে ফলে ভরা গাছ কাটিস না। থাকুক ওগুলো—

—হ্যাঃ, নিজেরাই যাচ্ছি আবার ফুলে ফলে ভরা গাছ থাকবে? দে সাবাড় করে যত পারিস।

ওরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে।

মানব ওই জগৎ থেকে এগিয়ে আসে বাংলোর দিকে।

গভীর গহন জঙ্গল। দুপাশে কালো লাল পাথরের স্তূপ ও পালল শিলা, আগ্নেয় সমারোহ। বিন্ধ্য পর্বতসীমার শেষ সীমানা-রেখা; ডিনামাইটের বিস্ফোরণে বেশ দীর্ঘ খানিকটা জায়গা ধ্বসেছে—গাছ সমেত পাথরগুলো গড়িয়ে পড়েছে এ ঘাড়ে। তারই নীচে বের হয়েছে সুড়ঙ্গটা! একটা মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে—ভিতরে গিয়ে বেশ খানিকটা চওড়া হয়ে গেছে সেটা। তারই মধ্যে পাওয়া গেছে কঙ্কাল ক'টা, কিছু মালপত্র, কয়েক গাঁট কাপড় তখনও সাফ করতে পারেনি। ওদিকে পড়ে আছে একটা কঙ্কাল,—হাতে পায়ে তখনও তার দড়িটা বাঁধা রয়েছে। এ জীবন থেকে অন্য জীবনে গিয়েও তার বন্ধনমুক্তি হয়নি।

আরও হাড়গোড় ছিটিয়ে আছে ওদিকে। কয়েকটা শিয়াল আপাতত বাস করছিল সেখানে; গোলমাল দেখে তারাও সরে গেছে—বাচ্চা দুটো পড়ে আছে, কুঁত কুঁত করছে; আশেপাশেই রয়েছে ধাড়ী শিয়ালটা, ওদের নিয়ে পালাবার সুযোগ খুঁজছে।

ব্লাস্ট করে বনের ভিতর নোতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছিল—সুঁদের মধ্যে থেকে কালীপুরের অতীত একটা দিন বের হয়েছে। শিউরে ওঠে মানব।

—ডাকাতের আড্ডা বোধ হয়।

থানা অফিসার বলেন—প্রায়ই এসব হতো এই মুলুকে, কতলোকের সর্বনাশ যে করেছিল ওরা কে জানে!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মানব দারোগার দিকে; দারোগাবাবু বলে ওঠেন—ওই কন্দর্পবাবুর দলবল স্যার। শিয়ালের চেয়ে ধূর্ত, কোন দিকেই ধরা-ছোঁয়ার পথ রাখেনি।

মানব কথা বললো না, দারোগাবাবু বোধহয় পরিচয়টা জানেননি। দারোগাবাবু বলেন হতাশভাবে।

—দিন নদীর জলে ফেলে। কি হবে ওসব হাতগোড় নিয়ে।

মুকুন্দ সাঁপুই-এর ভাইপো কাকার পয়সায় ফুলে উঠেছে। মুকুন্দ সেই যে তীর্থমাত্রা করেছে আর ফেরেনি। হঠাৎ খবর পেয়ে ভাইপো এসে ছুটেছে। কৃপাল সিং এর সঙ্গে সেও "প্রপ্" সাপ্লাই দেবার ব্যবসা জুড়েছে। কৃপাল সিং-এর জিপ থেকে নেমে এগিয়ে এসে এদিক ওদিক দেখে বলে ওঠে।

—মনে হচ্ছে এটা আমার কাকা।

মানব দারোগাবাবু আরও সকলেই অবাক হয়ে যায়; ঝড়ের আগে কুটো ওড়ে, খবর পেয়ে টগর আগে থেকেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেও বলে ওঠে।

—মাইরী সাঁপুই মশায়! জ্যান্তে কাকার মুখদর্শন করোনি, মরার হাড়গোড দেখে চিনে ফেলালা? বাহাদুর বটে মাইরী তুমি।

ফ্যাচ্ করে ওঠে ভাইপো—থাম দিকি! তুই এখানে কি করতে এলি?

হাসছে টগর,—মজা দেখতে। তা কাকার সম্পত্তি ওই কাপড়ের গাঁট দুটোও লিয়ে যাও। সবইতো হরে হম্মে লিয়েছো—ওগুলোই বা থাকে কেনে?

জোঁকের চুন পড়েছে। সাঁপুইনন্দন সুড় সুড় করে সরে গেল।

জিপে বসে ছিল কৃপাল সিং, দাড়ি চুমরিয়ে বলে ওঠে—

—যাও না, দারোগাকে সব কথা খুলে বল। এনকোয়ারি হোতে হোবে?

মানব অবাক হয়ে টগরের দিকে চেয়ে রয়েছে। একটি বৈকালে দেখা সেই কচি চলচলে মেয়েটি আজ বদলে গেছে। মুখচোখে কথার তুবড়ি ছোটে। জীবনের বহু অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে ওর মুখে।

সাঁপুইনন্দন ঘাবড়ে গেছে—ওসব পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ নেই সিংজী, চলো বনকাটাই হচ্ছে সেইখানেই যাবো, রোলা গুনতে হবে।

—তুম্ কামকা আদমী নেহি। কৃপাল সিং-এর আপশোধ হয়। এমন চমৎকার একটা নৌকা মিলিয়ে দিল কন্দর্পবাবুকে বেঁধে ফেলবার কিন্তু প্রমাণ এবং দাবীদার কিছু না থাকার জন্যই সব ভেস্তে গেল! কন্দর্পবাবুকে ফাঁদে ফেলা গেল না এত সুযোগ পেয়েও। টগর ফোঁস করে ওঠে।

—মরবি কুনদিন দেড়েল রামছাগল কোথাকার! বড্ড লোভ তুর।

কৃপাল সিং অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখেছে। কালীপুর মৌজার দাবীদার দাঁড়িছে সে। সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। সাবেকী কাছারিতে

সাবডেপুটি কালেক্টর ভদ্রলোক এসেছেন—সঙ্গে দুজন মুহুরী একজন ক্যাশিয়ার। কাগজপত্র পড়চা—রোকড়-জমাবন্দী হিসাব করে ফরম ভর্তি করা হচ্ছে। ইতিপূর্বেই তিনটে নোটিস হয়ে গেছে প্রজাদের উপর যদি কোন আপত্তি থাকে জানাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপরই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের। সাতপুরুষের জমি বাড়ী বাগান পুকুর সব ন'কড়া ছ'কড়ায় দিয়ে উঠে যেতে হবে তাদের।

পাঁচ সাতখানা গাঁয়ের লোক এসেছে। গাছের ছায়ায় ছাতা গুটিয়ে বসেছে ওরা -বুড়ো যোয়ান বিধবা মেয়েমানুষও আছে। আশেপাশে ঘুরছে সনাক্তদাররা। তারাও দুপয়সা কামিয়ে নিতে চায়। বলে—

—সই দোব, জানি চিনি দোব; কিন্তু শতকরা পাঁচ টাকা দিতে হবেক। এত টাকার ঝক্কি লিচ্ছি যে গো।

মিত্তিরদের বিধবা বৌ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—কড়কড়ে পাঁচ টাকা কুথা পাবো?

কেনে, হাজার নেছো তুমি!

—টাকা। মেয়েটির বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বের হয়; সঙ্গে এসেছে ছোট বাপমরা ছেলেটা। মিত্তিরবৌ বলে ওঠে।

—টাকা লয়, উ বুকের মাড়ি বাবা। নাবালকের সম্পত্তি।

—তবে তো বিশ বাঁও জলে ঠাকরুণ। জজের সার্টিফিকেট লাগবে—কারো কোর্টঘর।

ওদিকে নাম ডাকা হচ্ছে। কৃপাল সিংও এসেছে জমাবন্দীর কাগজ নিয়ে; বন্দোবস্ত নিয়েছিল কন্দর্প আচাই-এর কাছ থেকে কিন্তু ওই পর্যন্তই। তবু আজ দখল দেখাতে এসেছে। বাইরে জিপ রেখে ভিতরে এসে একটা চেয়ার খুঁজছে বসবার জন্য। রোদে ঘামে ভেজা দাড়িতে দই-এর বোটকা গন্ধ—পিয়াজের আঁশ্‌টে বদবুতে ওর নিঃশ্বাস ভরে উঠেছে।

—কন্দর্পবাবু নমস্তে।

কন্দর্পবাবু আজ পায়ে হেঁটেই এসেছে। পাল্কী ভেঙ্গে গেছে—বেহারাও নেই। কতক মরে গেছে—কেউবা ফেরার। বাকী দু'চার জন যা আছে তারাও বাঁধে নাহয় পাথরকাটা ঠিকেদারদের ওখানে দৈনিক দু'টাকা হারে কাজ পেয়েছে। জমিদারবাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ তাদের নেই।

ছাতা হাতে গোমস্তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কন্দর্প আচাই, তার বগলেই লালখেরো বাঁধানো জাবেদা খাতা—রোকড়পত্র।

ওকে দেখে দাওয়া থেকে শশব্যস্তে উঠে ঘরের ভিতর ঢুকে অফিসারের হাতে

কাগজগুলো দেয় কৃপাল সিং—হামার কাগজটা লিন্ বাবুসাব্।

গড়গড় করে বলে চলেছে কৃপাল সিং—পিতা, পালোয়ানসিং, সাকিম জলন্ধর, পাঞ্জাব ; হাল-সাকিম—কালীপুর। পেশা—চাষবাষাদি।

সাবডেপুটি কালেক্টরের হাতে কাগজগুলো তুলে দিয়ে এগিয়ে দেয় স্টেট-এক্সপ্রেসের গোটা একটা টিন—লিন, সিগ্রেট পিন্।

সারা ঘরের সমস্ত লোক, বাইরের উঠানে ভিড় করে দাঁড়ান লোকেরা অনেকেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। সিংজী নামকরা লোক। হাকিম সাহেবের সঙ্গেই এত দহরম মহরম।

—ধন্যবাদ। সিগারেট আমি খাই না।

ওর কাগজগুলো দেখতে থাকেন। কন্দর্পবাবুও তাঁর দিকে কাগজপত্র বাড়িয়ে দেয়।

—ওসব বতিল কাগজপত্র ; বাকীকরের মামলায় ও প্রজা ফৌত হয়ে গেছে হুজুর। ওসব জমি আমার খাস।

— তাই নাকি ? একটু অবাক হন হাকিম সাহেব।

কিঁউ ? ই ক্যা বাত ? কৃপাল সিং লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—জমিদারকে খাজনা না দিলে সে জমি আবার জমিদারেরই খাস হয়ে যায় সিংজী। বাকীকরের মামলা জানো ?

হাকিমই আইনটা ব্যাখ্যা করে শোনান তাকে। তাজ্জব বনে যায় কৃপাল সিং।

—সব ঝুট বাত আছে।

—কোর্টে গিয়ে বুঝে এসোগে। তোমার মোটা মাথায় এসব ঢুকবে না। কন্দর্পবাবু শ্লেষভরেই কথাটা বলে ওঠে।

বেশখ্। রেগেমেগে কাগজপত্র গুটিয়ে বের হয়ে এল সিংজী। সাঁপুইনন্দনও এসেছে—তার জমির ক্ষতিপূরণ নিতে। এ অবস্থায় সিংজীর সামনে গেল না—এড়িয়ে গেল তাকে।

কালীপুর—মানাবন—আরও বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা আজ দাসখৎ লিখে দিলো, এ জমিতে আর তাদের কোন সর্ত নেই। মাটি সোনাফলা মাটি বৎসর বৎসর তাদের মুখে অন্ন জুগিয়ে এসেছে—আজ সেই মাতৃসম মৃত্তিকা থেকে উৎখাত হল তারা মাত্র কতকগুলো দলামোচা ময়লা কাগজের বদলে।

আপনার ওই মৌজার টাকা আপাততঃ পাবেন না। একটা আপত্তি পড়েছে যখন। অন্য মৌজার টাকা নিয়ে যান। হাকিম বলে ওঠেন

কন্দর্পবাবুকে।

চমকে ওঠে কন্দর্পবাবু—মানে? আমার বাড়ী জমি বাগানবাড়ী—সবই নাকি ওর?

—তা কেন হবে? ওদ্রে যে যে দাগ বন্দোবস্ত দিয়েছেন—বাকী থাকবে মাত্র সেইটুকু; আর সব পাবেন।

—ক্ষতিপূরণ নিতে হয় ও মৌজার সবই নোব—নাহয় কিছুই নোব না। পরে সুদসমেত আদায় দিতে হবে জানবেন।

হাকিম ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—মিছে রাগ করছেন। আমি নিরুপায়।

কথা বাড়ালো না কন্দর্পবাবু; রাগে অপমানে কথা বন্ধ হয়ে আসে। সামান্য একটা মাটিকাটা ঠিকাদার এসে তার 'হকে'র টাকা পাওয়া আটকে দিয়ে গেল—এ যেন তারই অপমান!

—বেশ! গজরাচ্ছে কন্দর্পবাবু, মনে মনে কি যেন কর্তব্য স্থির করে ফেলে।

—বেশ, টাকা আমি নিলাম না, মনে থাকে যেন ও সম্পত্তি এখনও আমার। সরকারকে হস্তান্তর করিনি। চল পাঁচু।

গোমস্তাকে নিয়ে বের হয়ে এল কন্দর্প আচাই। রাগে অপমানে সারা শরীর কাঁপছে। আজ সব গেছে তার—রৌদ্রতপ্ত তামাটে ডাঙ্গার বুক চিরে আগুন-জ্বালা রোদে গ্রামের দিকে এগিয়ে আছে। জনহীন পরিত্যক্ত গ্রাম; অতীতের জীবন্ত জনপদ, আজ মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমেছে ভাঙ্গা ঘর বাড়ীগুলোতে।

—অ্যাই! কি দেখে তাড়া দিতে থাকে পাঁচু। সদর পথের উপরই দাঁড়িয়ে আছে এক জোড়া শিয়াল দুপুরের রোদে; দত্তদের দোকানের সামনে। একদিন ওখানে এসময় জমত লোকজন—কারবারী পাইকের; গরুর গাড়ী আসতো মালপত্র নিতে—আজ সেখানে শিয়াল বাসা বেঁধেছে। বন থেকে তাড়া খেয়ে এসে ঢুকেছে পরিত্যক্ত ছায়াঘন গাঁয়ের ভাঙ্গা বাড়ীতে—নারায়ণ! নারায়ণ! পাঁচু ভয় পেয়ে গেছে; বলে ওঠে।

—মহা অমঙ্গলের চিহ্ন বড়বাবু; এ গেরাম ছেড়ে যাওয়াই মঙ্গল।

—হুঁ! কথা কইল না কন্দর্পবাবু। মনের ভিতব আগুন জ্বলছে। সব গেছে। আজ দু'হাত তার ভাঙ্গা। অভা—পরমা—কেউ নেই। অর্থসম্পদও ফুরিয়ে আসছে। লোকবলও উবে গেছে, নইলে ওইখানেই জোর করে কৃপাল সিংকে ধরে 'না' বলিয়ে ছাড়তো; কোর্টঘর কেন—সেইখানে সরে-জমিনেই এ তদন্তের শেষ করে আসতো। কিন্তু সেসব দিন হারিয়ে গেছে। তবু কি যেন ভাবতে থাকে কন্দর্পবাবু।

পড়ন্ত রোদে তেতে পুড়ে জনহীন বাড়ীটায় ঢুকলো কন্দর্প আচাই। সারা বাড়ীটায় কোন সাড়াশব্দ নেই—নিষ্প্রাণ পুরী।

খক্ খক্। কাশির শব্দ কানে আসতে থমকে দাঁড়াল। দেখতে পায় কাছারি বাড়ীর ভিতরের রকে একটা জীর্ণ কম্বল বিছিয়ে বসে আছে উচাটনানন্দ—গলায় একরাশ তাবিজ কবচ রুদ্রাক্ষের মালা। ডানহাতে নানা লতার শিকড় বাঁধা, তার থেকে ঝুলছে কয়েকটা কড়ি।

ধ্বংসপ্রায় বাড়ীটায় ওকে ধ্বংসদূত বলেই মনে হয়। কাপছে—শীর্ণ প্যাকাটির মত দেহ, গলার শিরা দুটো ফুলে ওঠে, যে কোন মুহূর্তেই যেন ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যাবে। জীর্ণ ক্লান্ত অসহায় মানুষটির দিকে চেয়ে আজ সারা সাধনার উপর তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মেছে।

তন্ত্রমন্ত্রে কোন ফলই হয়নি। দীর্ঘ জীবন ধরে সেও ওই শক্তিসাধনার তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল। কিন্তু কি হয়েছে? গুরুদেব উচাটনানন্দকে দেখে মনে হয় সারাজীবন ভুল পথেই চলেছে—আজ সেই প্রায়শ্চিত্ত করছে অকথ্য পাপের।

উচাটনানন্দও বিস্মিত হয়—কন্দর্প তাকে প্রণামও করে না, স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। বলে ওঠে উচাটনানন্দ,

—আজ অমাবস্যায় ষট্‌চক্রসাধন করবো ভাবছি কন্দর্প।

—ষট্‌চক্রসাধন।

কন্দর্পের জীবনে আজ ওর সবকিছুই অর্থহীন বলে মনে হয়। কি পেয়েছে সে এতদিন সাধনা করে? একে একে সব শক্তিসামর্থ্য তার নিঃশেষ হয়ে আসছে। পরাজিত বিপর্যস্ত সে। ভুলপথেই জীবনের বহুদিনের সাধনা ব্যর্থ করেছে তিলে তিলে।

—আয়োজন করো কন্দর্প। কুমারী—

মাথা নাড়ে কন্দর্প—নাঃ, ওসবে আর আস্থা নেই।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লালচোখ মেলে চাইল ওর দিকে উচাটনানন্দ। ঠিক যেন ওর কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে,

—কি যা তা বলছ? তোমার কি মতিভ্রম হয়েছে?

—এতদিন হয়েছিল। আজ ভুল বুঝতে পেরেছি।

উঠে দাঁড়িয়েছে তান্ত্রিক সাধু, শীর্ণ দেহখানা সোজা করে দাঁড়িয়েছে। গাঁজার ধোঁয়ায় কোটরাগত চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

—এতদিন কি তাহলে ভস্মে ঘি ঢেলেছি মাত্র? মূর্খ।

কন্দর্পের রোদতাতা শরীর জ্বলে ওঠে; কৃপাল সিং-এর মত একটা পশুর চেয়ে আজ শক্তিহীন সে। চারিদিক থেকে একটা আঁধারঘন যবনিকা নেমে আসছে।

বেশ বুঝছে কন্দর্প সেই কালের কঠিন পরাজয় থেকে মুক্তি পাবার পথ নেই। তন্ত্র যোগ-যাগ এই দুর্বার স্রোতের মুখে নিঃশেষ হয়ে যাবে। মুক্তির—কৃতিত্বের পথ এ নয়।

উচাটনানন্দের কথায় রাগ করে না আজ—ওকে দেখে করুণা হয়, সহানুভূতি আসে। স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় কন্দর্প—থাকতে চান থাকুন এখানে। হোম যজ্ঞে আমার আর প্রবৃত্তি নেই।

তান্ত্রিক সাধু নিমেষের মধ্যেই তার ঝুলিখানা তুলে নিয়েছে কাঁধে; চীৎকার করে—নিপাত যাবে তুমি। ধ্বংস হবে;

হাসছে কন্দর্প। তন্ত্রসার সাধকের সাধনবিভূতি আজ ভস্মে পরিণত হয়েছে। নিজের ভাগ্যলিপি পড়তে পেরেছে কন্দর্প।

উচাটনানন্দ বের হয়ে গেল। একা জনহীন ঠাঁইটায় দাঁড়িয়ে আছে কন্দর্প আচাই—অসহায়, একক একটি মানুষ।

মনে হয় বহুদিন পর আজ উচাটনানন্দ একটি সত্য বাক্য উচ্চারণ করে গেছে ধ্বংস হবে তুমি!

কে জেতে কে হারে! ওদের যন্ত্রের গর্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে। দ্বন্দ্ব চলেছে প্রকৃতি আর মানুষে। নদীই যেন জিতেছে! বর্ষা নেমেছে আকাশে আকাশে। নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে; যন্ত্রপাতি সবই উঠে গেছে উপরে,—দামোদর আবার নিজমূর্তি ধরেছে। নীলে হাড়ীর মা মাঠের খালে কাঁকড়া ধরে বেড়াচ্ছে। গর্তের ভিতর হাতখানা নির্ভয়ে ঢুকিয়ে দেয়—শক্ত দাড়া বের করে কাঁকড়াগুলো কামড়ায়, আঁচড়ায়—শীর্ণ প্যাকাটির মত আঙ্গুল দিয়ে তাদের ধরে বের করে কোমরে সঙ্গে ঝুলান খালুইটাতে পোরে। জলকাদায় হাতগুলোয় হাজা লেগেছে—থিক্ থিক্ করছে। পিচুটি ভর্তি চোখে পিটপিট করে চায়। আবার গর্তে হাত পোরে।

এ বুড়ী মা! গর্তে সাপ থাকবে যে। পথ চলতি কোন কুলী সাবধান করে ওঠে।

—তোকে কামড়াক রে মুখপোড়া! যা নদীতে গিয়ে ভট ভট করগা ইবার। কেমন? দিয়েছে তো তেড়ে দূর করে। ওই নদী বাঁধবি তুরা? বাবা দামোদর জাগ্রত দ্যাবতা।

শাপমণ্যি কাড়তে থাকে বুড়ী।

হো হো গৈরিক জলস্রোত বয়ে চলেছে। নদীর বুক থেকে ওদের জোর করে তাড়িয়ে উতলা নদী আবার নিজের রাজ্য জয় করেছে। জলের বুকে এপ্রান্ত থেকে

ওপ্রান্ত পর্যন্ত মাথা তুলে আছে কয়েকটা পিলার ; ওইটুকু ছাড়া ওদের প্রতাপের আর কোন চিহ্ন সেখানে নেই। এপারের চড়াই-এর বাংলোগুলো বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে—ওপারে পাথরের অসংখ্য স্তূপ ছোট ছোছ পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে। মাঝে বিশাল নদী।

নীচে শ্যামপুরের ঘাটে আবার সেই আদিম নৌকা ফেরি করছে—বিশাল নদীতে দুধারা বইছে। একখানা নৌকা এক নালি পার করে যাত্রীদিকে পৌঁছে দিচ্ছে মানাচরে—খানিকটা জল ভেঙ্গে হেঁটে—চোরাবালির খপ্পর থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আবার যাত্রীদল গিয়ে উঠছে অন্য নৌকায়। বারমেসে স্রোত পার হয়ে তবে অন্য তীর। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে এসেছে যেন এই অন্ধকার সভ্যতার স্পর্শহারা দেশের প্রান্তসীমায়।

মানবের এখন কাজকর্ম অনেক কমে গেছে। ক'মাস বাড়তি মজুররা চলে গেছে ; ঠিকেদারদের কাজকর্মও কম। রাস্তার মাটি কাটা, ক্যানেল কাটার কাজ না হয় রাস্তা তৈরী করে চলেছে তারা , মামড়ার আদিম অরণ্যে আবার জলপ্লাবন শুরু হয়েছে। সুঁদ বালিয়াড়িতে নেমেছে বুনো ঢল। গাড়ী যাবার পথও আটকে গেছে।

ক্যাটারপিলার ট্রাকটারগুলো তারই মধ্যে চালু রয়েছে। পাথর মাটি ঠেলে এনে জমা করছে ঠেলাঠেলি করে ; তাদের ব্লেডের ধারে বট, কেঁদ, শাল গাছের গুঁড়ি শিকড় উপড়ে ওঠে পড় পড় শব্দে ; মাঝে মাঝে ওঠে কলরব।

—ওই—উধার যাতা হ্যায়। হুঁশিয়ার।

ড্রাইভার রামকিষণ চীৎকার করে ওঠে—গর্তের নীচে একজোড়া মিশকালো পুরানো কেউটে বাসা বেঁধেছিল, তাড়া খেয়ে বের হয়ে এসেছে—ফণা তুলে গর্জাচ্ছে হিস্ হিস্ শব্দে ল্যাজের উপর ভর দিয়ে—ছোবল মারে বুলডোজারের ব্লেডে। ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠছে ওর উদ্ধত ফণায়। সাপটা রেগে এক একবার পিছিয়ে যাচ্ছে আবার সজোরে এসে আছড়ে পড়ছে ব্লেডের উপর।

—দে না শেষ করে দুটোকে ? জোড়ে বেশ ছিল আরামে।

গর্ত থেকে বের হয়ে আসে একথগা সাদা ডিম ; রামকিষণ স্টার্ট দিয়ে একটু এগিয়ে দেয় ব্লেডটাকে, ধারাল বঁটির ডগে মূলো মত কাটার মত কচ্ করে দু'আধখানা হয়ে গেল সাপদুটো।

আদিম বন্যজীবনকে তছনছ করে দিয়েছে তারা। বৃষ্টিধোয়া আঁটাড়িবনের আড়াল থেকে খরগোস চেয়ে দেখছে ভীরু চকিত চাহনিতে—তাদের রাজ্যে এ যেন কোন্ সর্বনাশা দূত এসেছে।

—ভাগতা হ্যায়! কে চীৎকার করে ওঠে। তার আগেই লাফ দিয়ে বনের ভিতরে পত্রাবরণে অন্তর্হিত হয়ে গেছে তারা।

বৃষ্টি নেমেছে অঝোরধারে, মর্মর জাগে কাঁচা শালপাতায় ঢাকা বনে বনান্তরে।

শন শন নেমেছে শালবনে বৃষ্টি। আকাশ ছাওয়া বৃষ্টি। লাল মাটি—বন ধুয়ে চলেছে লাল মাটি দামোদরের দিকে। ঝর ঝর শব্দ কানে আসে; নরম মাটি ফেটে বের হয়ে আসে কাডান কুড়কি ছাতুর দল; বৎসরান্তে বনভূমিকে দেখতে আসে এই বাদলঝরা দিনে।

জিপে বসে ভিজছে মানব; বর্ষাতি মানে না এ বুনো বৃষ্টি। আকাশ ঝরে—গাছের পাতার জল ঝরে একত্রে। কাড়ান নেমেছে।

অফিসার্স ক্লাবে গিয়ে হাজির হয় সেই ভিজে অবস্থাতেই। মিঃ সেন বলে ওঠেন।

—এই বর্ষায় এক পেগ চলুক হে, ঠাণ্ডায় জলে হিম হয়ে যাবে যে। সে দেশে তো চলেছে।

মানব বড একটা ওসবের ভক্ত নয়, মাঝে সাঝে এক আধটু চলে মাত্র।

বৈকাল হবার আগে হতেই অন্ধকার নেমেছে বনভূমিতে। বট অশথ আর মহাশাল ঘেরা বনভূমিতে সন্ধ্যা এগিয়ে আসে। পাতার আড়ালে কোথায় পিউকাঁহা ডাকে—ভিজে বাতাস বনকুর্চি ফুলের গন্ধে মৌ মৌ, করছে।

আজ কাজশূন্য এই স্তব্ধ সন্ধ্যায় মানবের মনে পড়ে হারানো কালীপুরের অতীত দিনের একটি মেয়ে মাধুরীকে। যৌবনে প্রথম তাকে কাছে পেয়েছিল, মাত্র ক'দিন; চেনা বোঝা হয়নি। তবু প্রথম স্মৃতির আকাশ তারই রঙ্গে রাঙ্গানো ক্ষীণতম আভায়। মনে পড়ে দীপাকে। তাকে মধুর স্মৃতি বলে মেনে নিতে পারেনি মানব। দীপার কাছে পরাজিতই হয়েছে সে।

চাকার গতিবেগে ছিটকে উঠছে লাল কাদা জল—হেডলাইটের ম্লান আলোয় দেখা যায় বৃষ্টির অস্পষ্ট যবনিকা।

আর একটি মুখ বার বার মনে পড়ে। স্মৃতির আকাশে উজ্জ্বল একটি তারকা। ওদের মত মাটির বুকে নেমে আসেনি—স্পর্শের নাগাল হতে বহুদূরে রয়েছে। ক্লান্ত মানব ফিরছে বাংলার দিকে সারাদিনের কাজের পর।

আবার জোরে বৃষ্টি নেমেছে। নামুক। ঝম ঝম—বৃষ্টি। শিরায় শিরায় বিদেশী পানীয়টা তখনও একটা উষ্ণতা জাগিয়ে রেখেছে। কেমন হালকা লাগে সবকিছু।

—বৌদি!

বাংলোতে উঠে এসে বসবার ঘরের পর্দা সরিয়ে টুনুবৌদিকে দেখে অবাক হয়ে যায়। হালকা আশমানী রংএর একখানা শাড়ী—গলায় সরু হার, নিটোল মোম রং হাতে দুটো বালা। একটা বই পড়ছিল, ওর ডাকে চাইল চোখ তুলে।

—ওমা! এসো। এসো।

মানব ভিজে বর্ষাতি পোষাক ছাড়তে ভিতরে চলে গেল।

জানালার সার্সি গড়িয়ে জলের ধারা বইছে—বাতাসে ভেসে ওঠে বাগান থেকে রজনীগন্ধার সৌরভ; বুনো মাটি ফুলে ফসলে ভরে উঠেছে। মানব একটা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে এসে বসলো—ইতিমধ্যে বেয়ারা চা খাবার এনে হাজির করেছে।

নাও। ভেবেছিলাম এই দুর্যোগে বাড়ীতে থাকবে তাই এলাম।

মানব চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে—থাকবার উপায় কই! কোথায় রাস্তা ভাঙ্গলো—সাঁকো ফাটল—ঘর পড়লো—এই নিয়েই তো কাজ।

—মা আসেননি? টুনুবৌদির প্রশ্নে মানব ধীরভাবে উত্তর দেয়।

—না, তাঁরা আসবেন না।

—হুঁ। বৌদি চুপ করে চায়ে চুমুক দিয়ে চলেছে।

—আর দীপা?

মানব থেমে গেল। একটা ব্যর্থ ইতিহাস—নিষ্ফল প্রতীক্ষা।

—সে আসবে না। আমার বংশপরিচয়—বাবার কুখ্যাতি, আমার এক-গুঁয়েমিকে মেনে নিতে পারবে না। তাই জবাব দিয়েছে।

মানবের দিকে টুনুবৌদি চেয়ে রয়েছে সন্ধানী দৃষ্টিতে। বাইরে স্তব্ধতা ভেদ করে আসে ঝিমঝিম বাদলধারার সুর।

—শুধু কি তাই?

মানব কথা কইল না—টুনুবৌদির দিকে চাইল। গভীর সে চাহনি টুনু-বৌদি কি যেন সন্ধান করছে ওই দৃষ্টিতে। অতীতের একটি কিশোর—দীর্ঘ বারোবৎসর তাকে নিবিড়ভাবে চিনেছে—জেনেছে। আজ এক বর্ষামুখর সন্ধ্যায় কেমন অচেনা বলে মনে হয় তাকে। ওর চোখেমুখে কী এক কামনার জোয়ার—দুর্মদ। বাঁধভাঙ্গা সে পৌরুষ।

নীচে মেইন লাইন কাঁপিয়ে একটা ট্রেন বের হয়ে গেল—আঁধার ফাটিয়ে দেয় ওর তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলোয়, মাটি আকাশ কাঁপছে ওর গতিবেগে। কাঁপছে টুনুবৌদির বুক।

—সে কথা নাইবা শুনলে।

—ওসব কথা আমার ঢের শোনা হয়ে গেছে মানব। ওরা সবাই বলে।

টুনুবৌদির টকটকে ফর্সা মুখ—ডাগর চোখে সেই বেদনা অপমানের ছোঁয়া।

—এদিকে আমি একা আদর্শ আঁকড়ে পড়ে আদি ওদের দয়াতে।

—বোম্বেতে স্বামীর কাছে যাও না কেন?

—না। পরিচিত এক ভদ্রলোকের কাছে আশ্রয়ের জন্য মাথা নীচু করে যাওয়ার চেয়ে অপরিচিত কোথাও মাথা উঁচু করে যাওয়ার সমর্থন করি আমি।

মানব ওর দিকে চাইল—বাইরের আকাশের মত থমথমে বৃষ্টিঝরা সে চোখ! কি যেন বলতে যাবে মানব, বাধা দিয়ে ওঠে বৌদি।

—তুমি আর নীতিবাক্য শুনিয়ো না মানব। যে কথাগুলো বলবে ওগুলো বহুবার শোনা—পুরোনো।

মানব নীরবে সিগারেট টানতে থাকে। মৃদু আলো দরজার বাইরে ছিটকে পড়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

—বাড়ী ফিরতে হবে তো?

—না। ছোট্ট একটু জবাব দেয় বৌদি দৃঢ়স্বরে—তোমার কি ভয় করছে আমাকে?

অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে মানব—না—না।

বৃষ্টি নেমেছে আবার। চারিদিকে বৃষ্টির আঁধার যবনিকা। বাতাসে জাগে নদীর উতরোল গর্জন! কেমনতারা হারিয়ে গেছে কোন অতল অন্ধকারে। মানব ওর কথায় অবাক হয়ে গেছে, এ যেন অন্যকোন মানুষ!

হাসে টুনুবৌদি—আমার কিন্তু একটুও করেনি। তোমাকে চিনেছি মানব, দীপা কেন ফিরে গেছে তাও জানি।

চমকে ওঠে মানব তীব্র আঘাতে মুখে একটা বেদনার ছায়া।

—কেন?

টুনুবৌদি কথাগুলো স্পষ্ট করেই বলে।

—তুমি একটি কাপুরুষ। নিজের দাবী জানাতে কোথাও এগিয়ে যাওনি। যেতে পারোনি!

কি যেন বলতে চায় টুনু; মানব ওর অপরূপ দেহের দিকে চেয়ে থাকে। রূপ যেন আজও উপচে পড়ছে বর্ষার দামোদরের মত। অমনি দুর্বার উচ্ছলতার গতিবেগ। বাঁধন মানেনি। কোথায় অন্তরে গভীর বেদনা তার প্রকাশপত্র খুঁজবার জন্য উতরোল কল্লোল তুলেছে কূলে কূলে।

হাসিতে কেটে পড়ে বৌদি—না, আজই যেতে হবে ফিরে। নইলে আমার আদর্শের একটা চূড়া ওদের চোখের উপর খসে পড়বে যে। তোমার গাড়ীখানা

বের করো !

মানব রহস্যময়ীর দিকে চেয়ে থাকে—ঠিক চিনতে পারেনি আজও। গাড়ীর আবছা আলোয় দেখে বৌদি নিবিড়ভাবে তার দিকে চেয়ে আছে পলকহারা চাহনিতে—মানবকে চাইতে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। দমকা জলো বাতাসে মিলিয়ে গেল একটি সকরুণ নিঃশ্বাস। ফিরে গেল বৌদি সেই রাত্রেই।

বৃষ্টির তোড় তখনও কমেনি। দুদিন থেকে বৃষ্টি চলছে। গলে ধুয়ে যাচ্ছে নোতুন রাস্তার মাটি, ইলেকট্রিক কেবলের ড্রামগুলো জলে ডুবছে, ছিচকাঁদুনে আকাশ কেঁদেই চলেছে দুষ্টু মেয়ের মত। এক একবার দম নিতে থামছে—আবার পুরোদমে শুরু হয় কান্না। নদীর জল ফেঁপে ফুলে উঠেছে। খেয়া বন্ধ।

সকালে আনমনে বসে ভাবছে মানব গত রাত্রির কথা। টুনুবৌদিকে একটা রহস্য বলে মনে হয়। কাল কি যেন বলতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। ঝড়ের মত এসেছিল—ঝড়ের রাতেই ফিরে গেছে রহস্যের মত। বার বার সেই কান্নাভেজা চোখ—অপরূপ রূপবতী কেশবতী কন্যার স্বপ্ন মনে পড়ে। মানবের কাছে কি বলতে এসেও পারেনি—ফিরে গেছে শূন্য হাতে।

বৃষ্টিনামা দিনে মেঘে মেঘে এমনি করে চাওয়া মিশে আছে—মিশে আছে কার স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসবায়ু রজনীগন্ধার সৌরভে।

হটাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে—বাজছে একনাগাড়ে। উঠে গিয়ে ধরল।

হাসপাতালের একদিককার শেড উড়ে গেছে ঝড়ে। এখুনিই ব্যবস্থা করতে হবে।

—যাচ্ছি। হ্যাঁ শীগগীর।

…ওয়ার্কশপে খবর দিয়ে নিজেও বেরুবার জন্য তৈরী হয়। বসে থাকতে মন মানে না—তবুও ঘুরে আসা হবে। চিন্তার ঝড় থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় সে।

জনমানবহীন অঞ্চল। গ্রামের বাইরে—নদীর মাথায় টিলার উপর নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীখানা ; সামনে ছোট একটু বাগান—কয়েকটা শিশু সেগুন গাছ উঠছে। সূর্যমুখী গাছগুলো ভেঙ্গে পড়েছে ঝাপটায় ; নদীর সোঁ সোঁ শব্দ মনে আতঙ্ক আনে।

দু'শো ফুট গ্রানাইটের স্তরের নীচে তীরবেগে গেরুয়া স্রোত বয়ে চলেছে, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল জল আর জল। বাতাসে ফুঁপিয়ে উঠেছে থৈ থৈ নদী।

ঝড়ে একদিককার টিন উড়ে পড়েছে। ডাক্তার নার্স বয়রা জিনিসপত্র ফার্নিচার খাট ওষুধপত্র টানাটানি করছে। মানবকে আসতে দেখে, এগিয়ে আসে

সি. এম. ও।

—দেখুন, অ্যাকসিডেন্ট হতে বেঁচে গেছি।

লোকজনও এসে পড়েছে পিছনে ট্রাকে করে। মানব জলকাদার মধ্যেই হাঁটাহাঁট করে ওদের কাজ দেখছে।

—পিছল হয়ে গেছে টিনগুলো, সাবধানে ওঠা-নামা কর মিস্ত্রী।

—কী হুজুর। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সামনে পূর্ণবেগে নিপুণভাবে কাজ করে চলেছে দলবল নিয়ে। বৃষ্টির ধারাল ফলা বিঁধছে পট্‌পট্‌ করে মুখে—তারই মাঝে মিস্ত্রীদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মানব। ওরা যদি দমকা বাতাসে চালের উপর থাকতে পারে, সেইবা নীচে পারবে না কেন? বাড়ীর ভিত দেওয়ালগুলো পরীক্ষা করছে—কে জানে যদি ধ্বসে পড়ে বর্ষায়।

গামবুট বর্ষাতি ভিজে উঠেছে। ভিজে হাওয়া কাঁপন ধরাচ্ছে হাড়ে।

—একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি।

চিফ মেডিক্যাল অফিসারের ডাকে ফিরে চাইল মানব।

—চায়ের সত্যি দরকার—চলুন।

বৃষ্টি থেকে বারান্দায় উঠলো মানব। ওদিকে মেরামতি কাজ শেষ হয়ে আসছে। টুক টাক শব্দে টিন বসিয়ে নাট মুন্ট ঠুকে চলেছে মিস্ত্রীরা।

—আগে রিপোর্ট করে লোক আসতে দুদিন কেটে যেতো, এখন ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে এল। ডাক্তারবাবু মন্তব্য করেন।

—হওয়া উচিত। মানব চায়ে চুমুক দিতে দিতে জবাব দেয়।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে চমকে ওঠে—একটি মুহূর্ত। বাইরের আকাশভাঙ্গা বৃষ্টিধারা নদীর বুকে শত নূপুরের সুর তুলেছে। অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে মানব।

—আমাদের নোতুন ডাক্তার—মাধুরী চ্যাটার্জি। পরিচয় করিয়ে দেন সি. এম ও।

—নমস্কার! কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল মাধুরী। হাত তুলে ছোট একটি নমস্কার করলো—ব্যস!

আর কোন পরিচয়ের চিহ্নই ফুটে উঠলো না তার কর্তব্যকঠিন ভাবলেশহীন মুখে। অন্য কাজে মন দিল বের হয়ে গিয়ে।

মানব অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। এক মুহূর্তে মনের মাঝে বাইরের ঝড়ের ছোঁয়া লাগে। মাধুরী—কালীপুরের কত স্মৃতিমুখর অতীত দিনগুলো স্তব্ধ নির্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। মাধুরী বদলে গেছে। হয়তো ভুলেই গেছে তাকে।

মানবের উপছে পড়া মন আবার সংযত হয়ে ওঠে। চায়ের পেয়ালা শেষ করে ওঠে।

—দেখি কতদূর এগোল কাজ। এ স্ট্রাকচার বদলে ফেলে সামনের ফাইন্যাল বাজেটে নোতুন বাড়ী করবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

সি. এম. ও জবাব দেন—তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। দয়া করে কেসটা একটু দেখবেন।

বাইরে এসে দাঁড়াল মানব। তখনও বৃষ্টি থামেনি।

মাধুরীকে আর পাওয়া গেল না। মানব চুপ করে বের হয়ে এল একাই।

মাধুরীও চমকে উঠেছিল প্রথম ওকে দেখেই। ভুল করেনি তার চোখ। বহুদিনের চেনা জানা। অতীত জীবনের কত মধুস্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওই মুখ—ওই যুবক। সেদিন প্রথম মাধুরীর মনে সেই এনেছিল রঙ্গীন স্বপ্ন। জীবনের বহুপথ পরিক্রমা সেরেছে দুজনেই তবুও সেই রং আজও ফিকে হয়নি। চকমকি পাথর—পাঁকের তলে পড়ে থাকুক, এনে ঘষলেই আগুনের ফুলকি বের হয়। জীবনের বহুজন হয়তো তেমনি ধারারই, ভুলেও ভোলা যায় না। রাতের তারার মত, দিনের আলোয় ক্ষণিকের জন্য মিলিয়ে থাকে।

…কি দুঃসহ লজ্জায়—বেদনায় সরে এসেছিল সে। বৃষ্টিধোয়া মাঠে সবুজের স্পর্শ। মনের কোণেও অমনি বর্ণসুষমা। তবু দূরেই থাকতে চায় নিজেকে লুকিয়ে।

দূর থেকে দেখা যায় মানবের গাড়ীখানা বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

—সাতনম্বর বেডে একটা গ্লুকোজ দিতে হবে।

—ও হ্যাঁ! নার্সের ডাকে ফিরে চাইল মাধুরী জানলা থেকে।

বন্ধ্যা পড়ে আছে ভুবনপুরের সোনাফলা উপত্যকা। আগে এই উপত্যকায় বনগড়ানি ঢল নামতো—চন্দনের মত পলি। লকলকে করে উঠতো হাঁটুভোর ধানচারা; আজ চাষ দেবার লোকজন কেউ নেই; নীরব বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্ণ বেলায় পাংশু আকাশের নীচে নিঃস্ব মৃত্তিকা রোদনভরা ব্যর্থতায় মুখবুজে পড়ে আছে। এখানে ওখানে তার গভীর ক্ষত; বুলডোজারগুলো মেইন ক্যানেল কাটছে। এগিয়ে আসছে ভুবনপুর গ্রামসীমার দিকে; বর্ষার শেষে আবার নদীতে নামবার আগে এই পর্যন্ত তারা কেটে রাখবে।

ভুবনবাবু কিছুদিন আগেই দেহ রেখেছেন।

জনহীন ভুবনপুরের দিকে এগিয়ে আসছে বুলডোজার ট্রার্কঠাঁর বাহিনী। সদর

থেকে ডেপুটি কালেক্টর নিজে এসেছেন, কন্দর্পবাবুকে বোঝাতে।

—ডিসপিউট পড়েছে, এসময় আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আইনে বাধে, আপনি সরে আসুন বাড়ী ছেড়ে; আমরা যতশীগ্রী পারি ব্যবস্থা করবো!

কন্দর্পবাবুর মত টলানো যায় না!

—ভেবে দেখি। উদাস কণ্ঠে জবাব দেয় কন্দর্প।

—নইলে জোর করে আপনাকে সরাতে বাধ্য হবো।

চমকে ওঠে কন্দর্প আচাই। জোর করে সরাবার কাজটা এতদিন এ অঞ্চলে কন্দর্পবাবুরই একচেটিয়া ছিল, আজ সে ক্ষমতা তার নেই। সামান্য একজন কর্মচারী আজ কন্দর্পবাবুর মুখের উপর সেই শাসানি দেখাতে এসেছে। দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল মনের আগুন।

—সেই চেষ্টা করেই দেখুন তাহলে।

রাত্রি নেমে এসেছে প্রাণহীন গ্রামসীমায়; রাতের আঁধারে ঘুরে বেড়ায় শিয়াল-গুলো। ঘনকালো গাবগাছের ভুতুড়ে কালো ছায়ায় ডাকে কালপেঁচা। ভুবন-পুরের জীবনে শেষপ্রহর ঘোষণা করছে ওরা নিঃস্ব তমসার গভীর থেকে। চোখের উপর ভেসে ওঠে ছবিটা।

মুকুন্দ সাঁপুই মরছে। ছটফট করছে মৃত্যু-যন্ত্রণায়! হাত পা বাঁধা অবস্থায় মামড়ার জঙ্গলে সুঁদের অন্ধকারে পড়ে আছে সে; বুকের উপর মড়মড়ি পাথরের চাঁই।

নাকমুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে একসুতো রক্তরেখা; আর্তনাদ করছে।

—বড়বাবু দুটি পায়ে পড়ি আপনার।

—বড় বেড়েছিলে মুকুন্দ; মুখুয্যেদের সঙ্গে, ও শয়তানের বাচ্চা সিংজীর সঙ্গে খুব ভাব করে আমাকে জালে ফেলতে চেয়েছিলে? এখন দেখ!

—দেশ ছেড়ে চলে যাবো। দোহাই আপনার—পয়সা আমার চাই না, শুধু বাঁচতে দিন। শক্ত পাথরে ঠুই ঠুই করে মাথা খুঁড়ছে মুকুন্দ।

তেষ্টায় জিভ শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে, স্বর বের হচ্ছে না, চোখ ঠেলে উঠেছে কপালে। চিঁ চিঁ আর্তনাদ করছে।

মুকুন্দ পাথরপ্রাচীরের নীচে—অতল অন্ধকারে; টোপ টোপ করে ঝরণার জল ঝরঝে; বাঁধন সমেত গড়িয়ে গিয়ে জলে জিব লাগাবার চেষ্টা করছে। তিন দিন তিনরাত্রি পড়ে আছে। বুকের পাথর জেঁকে বসেছে; ওটা ঠেলে যাবার ক্ষমতা নেই। চোখের তারা দুটো ঠ্যালার মত ঠেলে বের হয়েছে।

চমকে ওঠে কন্দর্পবাবু! ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়,

—জল! জল দাও একটু।

বাসন্তীর রাতের ঘুম মুছে গেছে। স্বামীর ডাকে উঠে বসলো। কন্দর্পের সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে; বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে;

—কি যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

নিস্তব্ধ পোড়ো ভিটেপুরী গ্রাম; শিয়াল ডাকছে। বাড়ীর অন্তপ্রত্যন্তে কার কান্নার স্বর শোনা যায়। বাসন্তী আতঙ্কে শিউরে ওঠে; ভূতের গাঁ! সবাই চলে গেছে। কন্দর্পবাবু অন্য এক দেহহীন জগতের স্বপ্নচারী—ওই মানুষটির সঙ্গে পড়ে আছে বাসন্তী এই মৃত্যুপুরীতে।

হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে বাসন্তী, বর্ষার জল পেয়ে মাঠ পড়োবাড়ী সব ডুবে গেছে। জেগে আছে ভুবনপুরে মাত্র ওদের টুকুই। শেওলাপড়া দেওয়ালের গা বেয়ে উঠছে একটা কালো গোখরো—আশ্রয়ের সন্ধানে।

—সাপ!

লকলক করছে ওর ধারালো তীক্ষ্ণ জিবটা; মাঝে মাঝে ফণা মেলবার চেষ্টা করে হিস্ হিস্ শব্দে। মৃত্যু—জীবন্ত মৃত্যু বাড়ীটাকে ঘিরে রেখেছে।

শিউরে ওঠে বাসন্তী; সাপটা বারান্দার গা বেয়ে একটা ফাটলে ঢুকে গেল, ওঁত পেতে রইল মৃত্যু—জীবনের সন্ধানে।

কন্দর্প আচাই দেখছে—স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ওইটাকে। বাঘের ঘরে আজ ঘোগ বাসা করেছে।

দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে তখনও আতঙ্কজড়িত চাহনিতে কাঁপছে বাসন্তী। এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে। চোখেমুখে তার দৃঢ় প্রতিবাদের কাঠিন্য।

প্রতিটি রাত্রি বাসন্তীর মনে সুগভীর রেখাপাত করে চলেছে। একলা পরিত্যক্ত পাষাণপুরীতে বন্দিনী সে। কন্দর্পবাবু ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে উঠে বসে বিছানায়, আতঙ্কবিস্ফারিত সেই দৃষ্টি। আজ বাসন্তী প্রত্যক্ষ করেছে সেই মৃত্যুদূতকে। আর সহ্য করতে পারছে না সে। বাসন্তী বলে ওঠে—

—এখান থেকে যেতে হবে তোমায়।

চুপ করে বসে আছে কন্দর্প আচাই। কোন বিকার তার মুখেচোখে নেই।

রাতের আঁধারে মাটি কাঁপছে। ডিনামাইট চার্জ করে পাথর ফাটাচ্ছে অদূরে। জানালাগুলো সশব্দে আছড়ে পড়ে। রাতের আঁধারে পরিত্যক্ত জনপদে ঘুরে বেড়ায় চাপাকান্নাজড়িত কণ্ঠে অতীতের শত গ্রামবাসীর অতৃপ্ত আত্মা। হিংস্র প্রাণীর দল। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই পরিবেশ বাসন্তীর কাছে।

—আমি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হবো বলে দিচ্ছি।

—বাসন্তী! চমকে ওঠে কন্দর্প।

—হ্যাঁ; পঁয়ত্রিশ বছর এই অত্যাচার সয়ে আছি—আর পারছি না। আমাকে মুক্তি দাও তুমি।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বাসন্তী। বাঁধন ছিঁড়ে আজ জীবনের সব জ্বালা চুকিয়ে দিতে চায় সে। অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে কন্দর্প। অন্য সময় হলে নিষ্ঠুরভাবে ওর সব কান্না থামিয়ে দিতে পারতো—আজ অত্যন্ত অসহায় সে।

একে একে সবাই গেছে; মানব! মানব তাকে পরিত্যাগ করেছে, একমাত্র বাসন্তীই তার কথায় প্রতিবাদ করে নি। আজ সেও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

কান্নাভেজা কণ্ঠে বলছে সে—কি দিয়েছো তুমি আমায়? একমাত্র ছেলেকে নিয়ে সুখী হতে দাওনি! দাসীবাঁদীর মত তোমার হুকুমই মেনে এসেছি। কিন্তু আজ দেখছি সব গেছে আমার। এমনি করে মরতে আমি পারবো না।

ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার থমথম করছে। কন্দর্প বসে আছে স্তব্ধ হয়ে, সারা জীবনের উপর আজ বিতৃষ্ণা এসেছে। কিসের জন্য সংগ্রাম করেছে এতকাল! শেষ নির্ভরটুকুও আজ যেতে বসেছে।

—ভয় পেয়েছো? বেশ। তোমার কথাই থাকুক। চল কোথায় যাবে!

—যাবে? চল মানবের ওখানে। মায়ের মন স্বপ্ন দেখে শান্তিপূর্ণ সংসারের।

গম্ভীর কণ্ঠে প্রতিবাদ করে কন্দর্প—না। ওর বাসায় যেতে পারব না। কোন মতেই না।

—তবে কাছারি বাড়ীতে?

এ বাড়ী ছাড়বার স্পৃহামাত্র তার নেই। বাসন্তীর কথায় কি ভাবছে কন্দর্প। রাতের আঁধারে মানব ফিরছে ওয়ার্কসাইট থেকে; হঠাৎ হাসপাতালের ওদিক থেকে কাকে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হল। এই রাতে কে যেন শাড়ী পরে চলেছে নির্জন পথে। কি যেন কৌতুহল বশেই দাঁড়াল মূর্তিটা কাছে আসতেই অবাক হয় মানব।

—আপনি?

দীর্ঘ দিনের অদেখার পর প্রথম অপরিচিতের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। মাধুরী এগিয়ে এল। দূরে রাস্তার এক ঝিলিক আলোয় তাকে দেখছে মানব।

—আপনাকে দেখেই এলাম।

—যাক, চিনতে পেরেছো তাহলে? কথাটায় একটা শ্লেষ ফুটে ওঠে।

মুখ তুলে চাইল মাধুরী—একজন সামান্য মেয়েডাক্তার ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার

সাহেবের পরিচিত এটা কি খুব সুখের হত আপনার পক্ষে? হয়তো রেগেই উঠতেন—তাই চেপে গেলাম ওই কথা।

হাসতে হাসতে বলে মানব—

—এখন যদি কেউ দেখে? এত নির্জন রাত্রে—

মাধুরীর চোখেমুখে কি যেন একটা পাণ্ডুর ছায়া; একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বলে ওঠে সে—আমিই বরং যাই।

বলে ওঠে মানব—ভয় পেয়ে গেলে নাকি? এই গভীর বনের পাশ দিয়ে একা কোয়ার্টারের দিকে চলেছিলে এত সাহস তোমার; অথচ লোক দেখেই পালাবার পথ খুঁজছো!

মাধুরী কি যেন বলবার চেষ্টা করছে; মানব বলে ওঠে—চল, ফেরবার পথে তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই; এত রাত্রে একলা এ পথে বের হোয়ো না, এত নিরাপদ এখনও হয়নি এ বনরাজ্য।

গাড়ীতে এসে চুপ করে বসলো মাধুরী; মানব ওর স্তব্ধমূর্তির দিকে চেয়ে অতীতের দিনগুলোর সন্ধান করে।

—কতদিন একসঙ্গে এপথে এসেছি মনে পড়ে?

চমকে উঠল মাধুরী; সে যেন স্মৃতির পাথারে কি এক হারানো মাণিকের সন্ধান করছে। আজ কত দিন বদলে গেছে। কত জল বয়ে গেছে দামোদরের বুকে। লজ্জায় ওর দু'চোখের দৃষ্টি নুইয়ে আসে। উষর নির্জন প্রান্তরও বদলে গেছে, বদলেছে তারা দুজনেও।

—এই আমার কোয়ার্টার; এইখানেই নামবো।

শূন্য নির্জন পথ; গাছের ছায়ায় সব হারিয়ে গেছে। গাড়ীখানা থেকে নামতে গিয়ে চমকে দাঁড়াল মাধুরী। নিবিড় নিস্পন্দ চাহনিতে চেয়ে রয়েছে মানব—একখানা হাত ওর হাতে। কাঁপছে মাধুরী ওই সামান্য স্পর্শে। সারা শরীরে কি এক অভূতপূর্ব শিহরণ; এতদিনের বঞ্চিত জীবন আজ ক্ষণিকের সামান্যতম পাওয়ার স্বপ্নে সার্থক হয়ে ওঠে।

—মাধুরী!

মানব নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সেও শূন্যতা পূর্ণ করতে চায়।

—ছাড়ো। কাঁপছে মাধুরীর কণ্ঠস্বর।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে বারান্দায় উঠলো। মানব চলে গেল।

একাই বসে আছে মাধুরী—বাতাসে কাঁপছে পর্দাগুলো। মনের অতলে দীর্ঘ অতীতের স্মৃতি রূপরস বর্ণধারায় রঞ্জিত হয়ে উঠছে। এমনি নির্জনে বোধহয় একক মানুষ নিজের সত্তাকে দুখণ্ড করে দেখতে চায়। মনে পড়ে

কোন এক কিশোরীকে—ঘাসে ঢাকা নির্জন মাঠ—তাম্রাভ প্রান্তরে বনসীমায় ঘুরে বেড়াত দুজনে।

আবার বহু পথ—বহু দিন পরে সেইখানে এসে মিলছে দুজনে, কিন্তু পরিবেশ বদলে গেছে।

দীপার কোথায় হিসাবে একটা ভুল হয়ে গেছে। নারীপ্রকৃতির ভিতর একটা চাঞ্চল্য আছে সত্যি কিন্তু তা সংযমের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা। কোন ভুলচুকের স্পর্শেই সেই সংযমের বাঁধ আলগা হয়ে যায়; স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নিজেকেই অকূল সর্বনাশের দিকে।

মানবের সঙ্গে ওর কথা মিঃ ব্যানার্জি সব শুনেছিলেন, কিছুই বলেননি দীপাকে; বলেছিলে স্ত্রীকে,

—মস্ত ভুল করলো ও, পরে বুঝবে।

বাবার কথা দীপা শোনেনি। আপশোষ করবার অবকাশ তার নেই, আবার কলেজে ফিরে গেছে, ফিরে পেয়েছে সেই বন্ধুবান্ধব। গাড়ীর পেট্রল খরচা—রকমারি শাড়ী গহনা আর পিকনিক খরচ বেড়েছে বহুগুণে।

রাত্রি হয়ে গেছে ফিরতে; মিঃ পাকড়াশী গাড়ী চালাচ্ছেন; তরুণ ডাক্তার; দীপা তাঁর পাশে বসে আছে। সারাদিন পিকনিকের হৈচৈ-এ ক্লান্তি নেমে এসেছে শরীরে; তন্দ্রার ঘোরে ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে দীপা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়; নিবিড়ভাবে তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন পাকড়াশী, গাড়ীটা থেমে গেছে রাস্তার ধারে; নির্জন অন্ধকারে ওঁর দিকে চেয়ে থাকে দীপা।

—প্লিজ!

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে, মনের ভিতর দীপার কোন অসহায় নারীত্ব যেন অস্ফুট আর্তনাদ করছে। রাতের তারা ওঠে শিউরে।

চোখমুখে ক্লান্তির ছায়া, চুলগুলো উড়ছে বাতাসে; ভাঁজভাঙ্গা শাড়ীখানা ব্লাউজটা কুঁকড়ে গেছে। মা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে; বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেছে।

—কোথায় গিয়েছিলি?

—পিকনিক করতে; মীরা—লিলি—গীতা সবাই ছিল।

মিথ্যা কথা বলার আনন্দ বুঝেছে সে। মা যেন কথাটা ঠিক বিশ্বাস করে না। মেয়ের দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

—কাল থেকে গাড়ী আর পাবে যা বাছা।

—কেন?

—তোমার বাবা রিটায়ার করেছেন, মাপা টাকা এইবার। এত ঢালাও খরচ চলবে না, বুঝলে। ও গাড়ী বিক্রী করে দিচ্ছেন উনি।

মায়ের দিকে চাইল দীপা। মাও যেন ঠিক আর আগেকার মত নেই; কারণ জানে সেও। মানবকে স্বীকার করেনি; মা-বাবার মতে বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে। কথা বললো না সে—উপরে উঠে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ ব্যানার্জি—নীরবে পাইপ টানছেন তিনি। মেয়ের জন্যই বোধহয় এতরাত্রি অবধি জেগে ছিলেন।

বাড়ীর সকলেই তাকে সন্দেহ করে অগ্রাহ্য করেছে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারে দীপা। সেও মনে মনে ফুঁসছে বাধা পাওয়া নদীর মত।

পরীক্ষা দিতে গিয়ে কঠিন সত্যকে অনুভব করে সে। তার মনের শান্তি বুদ্ধির দীপ্তিতে দৈন্য এসেছে। নিজের অজ্ঞাতেই চিন্তার বীজ ঢুকেছে তার মনে অবচেতন মনের সব শ্রীকে পোকার মত কুরে কুরে খেয়েছে। কলেজে যাতায়াতই করেছে, কিন্তু কাজের কাজ সে কিছুই করেনি। একটিকে ভুলতে গিয়ে শতজালে জড়িয়ে ফেলেছে নিজের মনকে।

মিঃ পাকড়াশী, কুণাল সামন্ত, বিনয় বোস—অনেকেই তার মনের সাগরে তুফান তুলেছে। কর্তৃত্ব প্রাধান্য নিজের অসীম প্রতিপত্তি স্বাধীন সত্তাকে বাঁচাতে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল মানবকে, ঘৃণা করেছিল তার বাবাকে। কিন্তু এ কোন্ জালে জড়িয়ে পড়েছে সে—তা এই মনের অসীম একার সান্নিধ্যে এসে উপলব্ধি করে শিউরে ওঠে। মাকড়সার মত জাল বুনেছে তার চারিপাশে; এর থেকে কেটে বেরুবার পথ তার জানা নেই।

কেমন দিলি পরীক্ষা? হল থেকে বের হয়ে আসতে প্রশ্ন করে মীরা।

ওর কথার জবাব দিয়ে ওঠে দীপা—জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাতেই আমি ফেল করেছি মীরা, এ তো সামান্য পরীক্ষা।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না মীরা।

মিঃ ব্যানার্জি হঠাৎ মারা গেলেন করোনারী থ্রম্বোসিস্ রোগে। শান্তিতেই গেছেন তিনি। সকালের দিকে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। দীপা বাবার প্রাণহীন দেহের দিকে চেয়ে থাকে—জীবনে এতবড় সর্বনাশ তার ঘটেনি। এই নিঃস্ব সব-হারানো দিনে আজ একজনকে নিবিড়ভাবে মনে পড়ে; সে মানব—তাকে নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে। হয়তো তার

কাছেই প্রকৃত সান্ত্বনা পেতো আজ! কিন্তু সেকথা ভাববার অবকাশ নেই।

মা কাঁদছে। হাহাকার ভরা ও কান্না। দীপা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বসন্তবাবু, বাবার অন্যান্য বন্ধুরা অনেকেই এসেছেন।

—কাকাবাবু। দীপার কণ্ঠস্বর শোকের স্পর্শঘন গ্লানিতে গাঢ় হয়ে উঠেছে।

বসন্তবাবু দীপার দিকে চেয়ে থাকেন—এ সময় ধৈর্য হারিয়ো না মা; তোমাকেই সব ভার নিতে তবে। তুমি বড় ছেলের মত।

কয়েকটা দিন দীপার স্বপ্নের ঘোরে কেটে যায়; বাবার শেষকৃত্য চুকে যাবার পর নোতুন রূপের মুখোমুখী দাঁড়াল এই বিরাট বিশ্বের। দু'হাতে খরচ করে গেছেন মিঃ ব্যানার্জি, যত্র আয় তত্র ব্যয়। দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় বলতে সামান্য কিছু টাকা লাইফ ইন্সিওরেন্স আছে মাত্র, বাকী ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এসে দাঁড়িয়েছে কয়েক শোতে; পেন্সনই সম্বল ছিল তাও বন্ধ হয়ে যাবে এইবার। অভাব যে এমনি নগ্নমূর্তিতে দেখা দেবে তা কোনদিন ভাবতে পারেনি দীপা।

চোখে উপর ভেসে ওঠে অতীতের প্রাচুর্যভরা দিনগুলো; বন্ধুবান্ধব—সোসাইটিতে কর্তৃত্ব করেছে দীপা; রূপ যৌবনের পসরা নিয়ে মক্ষীরাণীর ভূমিকা নিয়েছে আসরে। তার চারিধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অগণিত স্তাবকের দল।

—কি হবে দীপা? মনুর কি হবে? একটিমাত্র ছোট ছেলে—তার ভবিষ্যৎ আছে। মায়ের কণ্ঠে কি একটা আতঙ্কের ছায়া; দীপার চোখের সামনে মোহ কেটে গেছে। কি ভেবেচিন্তে জবাব দেয়,

—কি হবে? বাড়ীর কিছুটা ভাড়া দোব, গাড়ীখানা বেচে দোব আপাততঃ; তারপর দেখি—কি কতদূর করা যায়।

—যা ভাল বুঝিস কর। আমি তো বাছা পথ দেখছি না। মা অসহায় হয়ে পড়েছে।

দীপা আজ বদলে গেছে। আগুনে পোড়া নিখাদ সোনার মত কঠিন হয়ে উঠেছে সে। চোখেমুখে বিলাস ব্যসনের সেই উছল কামনাময় লাস্য আর নেই। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে জীবনকে পরখ করতে চায়। আশপাশ থেকে কোন নির্ভর পাবে কিনা ভাবছে সে।

ডাঃ পাকড়াশীর দুটো ওষুধের কারখানা চলছে; বিনয়বাবুর শিপিং-এর কারবার, অফিস কোয়ার্টারে মস্ত অফিস; কুণাল সামন্ত মস্ত সওদাগরী অফিসের হোম অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া কভেটেড অফিসার. দুটো পি-এ তার নিজের। দীপার মনে এলোমেলো ভাবনার রাশ।

ডাঃ পাকড়াশী কারখানায় দীপাকে আসতে দেখে অবাক হয়ে যান।

—হ্যাল্লো—মাই লভ! টেক ইওর সিট্।

দীপা নীরবে বসে আপিসের চারিপাশ দেখতে থাকে। সাজানো গোছানো ঘর—কয়েকটা ফোন।

—কি খাবে? কফি—না চা? আপ্যায়নে গলে পড়ছে প্রৌঢ় পাকড়াশী। চুলে পাক ধরেছে তাই উঁচু করে কদম ছাঁটা মাথা।

—নাঃ। সেই সহজ সরল ভাব তার মুখ থেকে মুছে গেছে। মুছে গেছে সেই দীপ্তি। ডাঃ পাকড়াশী একটু অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে। সেই লাস্যময়ী কোথায় হারিয়ে গেছে।

—কি ব্যাপার বল দিকি মাই ডিয়ার।

দীপার কথা বন্ধ হয়ে আসে! প্রার্থীরূপে এসেছে সে আজ। তাই বোধহয় সহজ স্বাভাবিকতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে সে।

—একটু কথা ছিল!

—একটু কেন? বেশী কথাই বলো তুমি। আই লাইক ইট ভে-এ-রি মাচ! দীপার সেই একটু কথা শুনেই হাঁ করে চেয়ে থাকেন। প্রথমে ডাঃ পাকড়াশী যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না কথাটা; দীপা এসেছে চাকরির সন্ধানে তাঁরই কাছে।

—রসিকতা করছো? আঙ্গুলগুলো দিয়ে টেবিলে টোকা মারছেন।

এর চেয়ে কঠিন রসিকতা দীপার সঙ্গে আর কেউ করেছে বলে জানে না দীপা। নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। আজ দীপার অত্যন্ত প্রয়োজন। নিজেকে বাঁচতে হবে—ছোট ভাই মন্নুর দায়িত্ব মায়ের দায়িত্ব তার ঘাড়ে। চাকরি তাকে করতেই হবে।

—না; এ ছাড়া আমার পথ নেই। দীপা শুকনো মুখে জবাব দেয়।

মুখের হাসির আভা মিলিয়ে যায় ডাঃ পাকড়াশীর। মুখেচোখে ফুটে ওঠে কঠোর ব্যবসাদারী ছাপ; দীপাকে দিয়ে তাঁর কাজ কতটুকু হবে এ সম্বন্ধে সন্দিহান তিনি। ওদের নিয়ে বিলাস ব্যসনই সম্ভব—কাজের কাজ ওরা করেনি; প্রজাপতিকে দিয়ে মৌচাক বাঁধানো সম্ভব নয়।

পাইপ থেকে আগুন ঝেড়ে জবাব দেন পাকড়াশী।

—বড় বিপদে ফেললে মাই ডিয়ার; কি চান্স তোমায় দিই। আপাততঃ আমার কোনো ভেকেন্সীই নেই। সো সরি। নইলে তুমি চাইবে কি—এ আমারই কর্তব্য। ভেরি সরি—

দীপা চুপ করে বের হয়ে এল। জীবনের একটা দিক সে চেনেনি; এখন

ও চিনছে। চিনছে অনেক মূল্য দিয়ে।

বেলা বেড়ে উঠেছে। এতকাল এই সময় খেয়ে দেয়ে শ্যাম্পুকরা চুল এলিয়ে দিয়ে হালকা নভেল পড়েছে—নাহয় রেডিওর সুরতরঙ্গে ভাসিয়ে দিত নিজেকে। আজ ঝলসে ওঠা রোদে গরমে ট্রামে বাসে যাতায়াত করছে সামান্য চাকরির সন্ধানে। কপালের ঘাম মুছে পাফ্‌টা আলতো ভাবে বুলিয়ে নিয়ে কুণাল সামন্তের অফিসেই ঢুকলো; কয়েকবারই এসেছে এখানে। দারোয়ান লিপ্‌টম্যান সেলাম করে এগিয়ে নিয়ে যেতো; আজ তার রোদপোড়া ঘামভেজা মূর্তির দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় তারা। চেহারায় নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু কালো ছোপ পড়েছে চিন্তায়।

এগিয়ে গেল দীপা কুণালের গ্লেইড গ্লাসঘেরা চেম্বারে; এয়ারকন্‌ডিশন্‌ড করা ঘর—ফ্লোরেসেইন্ট আলোর মৃদু আভা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে।

—এসো!

কুণাল সামন্তের স্টেনো ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখছে।

—একটু কথা ছিল!

পি-এ, স্টেনো দুজনেই এপথের হালচাল জানে। সাহেবদের সঙ্গে এমন কথা বলবার অনেক মেয়েই আসে।

ওরা বাইরে চলে গেল চুপ করে—যেন ওকে দেখতেই পায়নি।

— রোদ লেগে পদ্ম যে শুকিয়ে গেছে দীপা; বল কি বলবে?

কথাটা বলবার চেষ্টা করে দীপা ভণিতা না করেই।

দীপার মুখ থেকে সব রক্ত মুড়ে গেছে। কুণাল সামন্ত এমন স্পষ্টভাবে কথা বলতে জানে তা ভাবেনি। এতকাল জানতো কুণাল বোকা-সোকা মানুষ, সোজা প্রেমের কথাটা বলতে সে রাত্রে উঠেছিল। মনে পড়ে দীপার—কুণাল তারা প্রথম উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শে কেঁপে উঠেছিল ঝড়ে কাঁপা পাতার মত।

আজ সেই কুণালই বলে ওঠে কোম্পানীর আইন-কানুনের কথা। পাইপটা দাঁতে কামড়ে ধরে বিলেতী কায়দায় ঠোঁট নাড়ছে!

—আমার কোন হাতই নেই; যা কোটা ছিল তা ফিলডআপ্‌ করে নিয়েছি! লণ্ডন অফিস থেকে হুকুম না পেলে আই অ্যাম হেল্পলেস মিস ব্যানার্জি।

—থ্যাঙ্ক উ।

দীপা সহজ হবার চেষ্টা করে। ওদের কাছে প্রজাপতির যে খাদ্যের

প্রয়োজন সে ধারণাই নেই—যেমন মর্ত্যের মানুষের ধারণা নেই উর্বশীর বয়স সম্বন্ধে।

—আজ পার্টিতে আসছো তো? কুণাল যেন বিদ্রূপ করছে দীপাকে। যে দীপা আজ সামান্য চাকরির জন্য পথে নেমেছে তাকে দামী ক্যাডিলাক্ পাঠিয়ে পার্টিতে ডেকে এনে স্ফূর্তি করার আশাও বিসর্জন দেয়নি ওরা। ওর কথার জবাব দিল না দীপা, নীরবে বের হয়ে এল সে। মনে মনে হাসছে হয়ত কুণাল; একজন কেমন মন্থর গতিতে নীচের তলে নামছে সেই দৃশ্য কল্পনা করে নিজের ভাগ্যগৌরবে উৎফুল্ল হাসি হাসছে কুণাল। ওরা হাসে—হাসাই ওদের স্বভাব।

এরপর আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। বিচিত্র রূপ রস বর্ণভরা জগতের সম্বন্ধে যে ধারণা এতদিন গড়ে উঠেছিল তার, যাদের উপর চরম বিশ্বাস করতো—বন্ধু বলে স্বপ্ন দেখতো, আজ কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে—রামধনুর সাতরং মিলিয়ে গেছে নিষ্করুণ সূর্যের নিঃস্ব কঠোর বহ্নিমালায়।

—সারাদিন কোথায় ছিলি দীপা?

মা এগিয়ে আসে। হঠাৎ দীপার রোদে লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে চেয়ে থেমে যায় সে। সেই অতীত রাতের অভিসারিকা নারী এ নয়, বিপর্যস্ত ভাগ্যের মুখোমুখি নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য যুদ্ধ করার দৃঢ়তা এর মুখচোখে পরিস্ফুট। মা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলে ওঠে,

—ঘেমে নেয়ে উঠেছিস, মুখচোখ রাঙ্গা হয়ে গেছে। যা জিরিয়ে নে বাছা।

মায়ের দিকে চাইতে পারে না দীপা; শুধুমাত্র রোদেই লাল হয়ে ওঠেনি দীপার মুখ। ঘৃণা অপমানে বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে অন্তর—মুখে তারই প্রকাশ। মায়ের নজরে পড়ে না দীপার এই পরাজয়ের গ্লানি। নীরবে উপরে চলে গেল দীপা চোখ ফেটে কান্না আসে তার।

মানব প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। শুকদেব ডাক্তার মুখুয্যে-বাড়ীর ছেলে তারই মামাবাড়ীর দিক থেকে আত্মীয় সেই বাংলোতে এসে হাজির হয়েছে সংবাদ নিয়ে। নিবারণবাবু মুষড়ে পড়েছেন। সারা পরিবারের এতবড় লজ্জাকর ঘটনায়। মানব স্তব্ধ হয়ে শুনছে; কাজে বের হচ্ছিল, হঠাৎ ওকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। সংবাদটা শুনে বলে ওঠে মানব।

—না—না! দেবুদা এ আমি বিশ্বাস করি না। টুনুবৌদির পক্ষে এ কাজ কখনই সম্ভব নয়।

শুকদেব বলে ওঠে—সবই সম্ভব মানব! টুনুবৌদি ওই প্রফেসরকে আগে

হতেই চিনতো। কলকাতার বাড়ীতে উনি ছেলেদের পড়াতেন। ওঁর জন্যেই কলকাতা থেকে দেশের বাড়ীতে সরে এসেছিল টুনুবৌদি।

মানব স্তব্ধ হয়েছে শুনছে শুকদেবের কথাগুলো। টুনুবৌদি আর এখানে নেই, কোন সম্বন্ধ নেই ওদের সঙ্গে। কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে পাটনায় চলে গেছে। ভদ্রলোক কোথাকার অধ্যাপক—টুনুবৌদিও সেখানে মাস্টারি করছে! বিলাস ব্যসন ছেড়ে গিয়ে পরিশ্রমের মধ্যেও শান্তির সন্ধান খুঁজে পেয়েছে।

…কিন্তু স্বামী থাকতে ওর মত মেয়ে এমনি কাজ করবে এটা কল্পনা করতেও শিউরে উঠে। মনে পড়ে সেই রাত্রের কথা। সেদিন এমনিই কি যেন ইঙ্গিত করেছিল টুনুবৌদি।

দশবছরের পরিচয়, সংসার, শ্রদ্ধাভক্তি ফেলে চলে যেতে পারে এক-মুহূর্তে মেয়েরাই বোধ হয়! ওরা তাই অচেনা—রহস্যময়ী—প্রহেলিকা।

ডিউটিতে এসেও ওর কথা ভোলেনি মানব। ক্রমশঃ অনুভব করে বৌদি তার মনে গভীরে কি এক আসন পেতে বসেছিল। আজ শূন্যতা আর হাহাকার করে ওঠে মন, বৌদিও হারিয়ে গেল।

ব্লু-প্রিণ্টখানা হাতে খোলা—মাথায় একটা হ্যাট। ব্রিজের স্ট্রাকচার থেকে থেকে নীচের দুর্মদ জলধারার দিকে চেয়ে আছে আনমনে।

রহস্যময়ী দামোদর। বুকে ওর তীক্ষ্ণ বিদ্রোহের জ্বালা। খলখল করে সব সংস্কার—সব বাঁধন ভেঙ্গে হয়ে চলেছে অন্তহীন মহাজীবনের সমুদ্রসঙ্গমের দিকে।

ওর দুর্বার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে কাজে লাগাবার—মঙ্গলযজ্ঞে নিয়োজিত করবার স্বপ্ন দেখে মানুষ। টুনুবৌদি অমনি দুর্বার কোন জীবনীশক্তির একটি খরস্রোত—বাঁধ ভেঙ্গে দুকূল ভাসিয়ে চলবে সে; তাকে ঘরের বাঁধনে বেঁধে মঙ্গলস্বপ্ন দেখা কি অবান্তর!

…কিন্তু তবু চলে গেছে বৌদি। তাকে অবহেলা অবজ্ঞা করে চলে গেছে। সব সম্পর্ক শেষ করেই ফিরে গেছে—হারিয়ে গেছে।

গুরুগুরু কাঁপছে ব্রিজের স্ট্রাকচারগুলো। নদী জল কমে গেছে—পিলারগুলোয় লেগেছে গেরুয়া রংএর ছোপ! আবার কাজ শুরু হয়েছে। ব্যারেজের উপর রাস্তা ঢালাই হচ্ছে—চব্বিশ ফুট চওড়া রাস্তা। দুই জেলার মধ্যে সেই হাহাকার ভরা নিঃস্বতা আর থাকবে না। মাথার উপর দিয়ে লাইন গড়ে উঠছে—হাইটেনশন লাইন বাঁকুড়া পর্যন্ত চলেছে। বহু অন্ধকার দূর হবে ও আলোয়। নোতুন জীবন গড়ে উঠবে—আলোয় ভরা জীবন।

ক্যানেল-ছুটোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। মুখে পড়েছে ভুবনপুরের সামান্যতম অংশ, সেটুকু ব্লাস্ট করতে পারলেই নদীর মুখে এসে পড়বে। ব্যারেজ আর থারমাল স্টেশনের কাজ এগিয়ে চলেছে। এরপর আছে ওভেন কনস্ট্রাকশন। স্টীলপ্ল্যাণ্টের কাজও শুরু হয়েছে—নোতুন টাউনশিপ গড়ে উঠছে বনের মধ্যে, অবসর নেই।

·· কাজ আর কাজ। সামনে সেই পাহাড়স্তূপ কাজ। কোথাও কোন শ্যাম বর্ণ নেই।···বৌদি—টুনুবৌদি চলে গেছে, তাকে একবার জানিয়েও যায়নি। বারবার সেই বৃষ্টিঝরা রাতের কথা মনে পড়ে, টুনুবৌদির কাজল-কালো ডাগর চোখের পাতাভেজা চাহনি।

—তুমি কাপুরুষ—ভীরু মানব। দীপা কেন, সবাই তোমাকে ছেড়ে যাবে।

একটি মুহূর্ত। পায়ের নীচে—বহুনীচে গার্ডারের তল দিয়ে চলেছে জলধারা—উন্মাদ বেগে বয়ে চলেছে সর্বনাশা নদী।

সুইচ টিপে স্লুইসগুলো পরীক্ষা করছে—গুমগুম শব্দে কেঁপে ওঠে আকাশ বাতাস। বৌদি চলে গেছে—ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। নিজের উপরই রাগ হয়। রাগ হয় বৌদির উপর।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে—আকাশ বাতাস ওয়েল্ডিং গানের বিকট শব্দে ভরপুর—আগুনের ফুলকি উঠছে ফুলঝুরির মত লোহার গায়ের তীব্র ঝককে।

কন্দর্প আচাই-এর কাঠামোখানা তুলে এনেছে বাসন্তী জোর করে। মনটা আজও বোধহয় যাযাবরের মত অতীতের সেই গৌরবময় দিনের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কালীপুর মৌজার বনের ধারেই বিঘে পঁচিশ জায়গা জুড়ে মস্ত বাগান—পুকুরের ধারে বাড়ীখানা। বনের সবুজ শ্যামলিমা ঘিরে রেখেছে রুক্ষতাকে। পাখীডাকা বৈকালে বকুলগন্ধে উদাস বাতাসে কি রিক্ত বেদনা আনে।

বাগানবাড়ীরও ভগ্নদশা এসেছে। গাছগুলো শুকিয়ে আসছে, সখ করে লাগানো ফুলগাছগুলো অযত্নে কুঁকড়ে গেছে—জলসেচ হয়নি কতকাল; নরম মাটি আবার বুনো কাঁকুরে হয়ে উঠছে। ওই ভগ্নদশার সঙ্গে কন্দর্পবাবুর অবস্থাও মিশেছে একাকার হয়ে। চাঁপাগাছে আজও ফুল ফোটে—চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের ফুলভরা বসন্ত বেলা, কামনাদির কত রাত কেটেছে এইখানে!

বাসন্তী স্বামীর জীর্ণ স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে থাকে, জোর করে ওকে ভুবনপুর থেকে এনেছে—বন থেকে পাখীকে এনে খাঁচায় বন্দী করেছে।

কন্দর্পের চোখে চাঁপাফুল ফোটা গাছটা—বাতাসে তারই মদির সৌরভ! কানে বাজে হীরা বাঈজীর মাতালকরা গানের সুর

পিয়া সনে মিলন কি আশা সখিরে—

কিরানা ঘরওয়ানার আমেজী খুবসুরৎ বাঈজী। এইখানেই প্রথম মুজরো করায় তার। দুধে আলতার গোলা রং, চোখের কোলে সুর্মার আবছা দাগ—যেন হরিণের চোখের চাহনি। পাতলা রেশমী কাঁচুলির আবরণে উছল যৌবনভার ফুটে উঠেছে। চাঁপাকলির মত আঙ্গুলে হীরার আংটি ঝিকমিক করে তানপুরার সুরে আগুন ধরায়—যোগিয়ার করুণ সে-তান—

দিনে দিনে বাড়ত মেরি সাগর যৌবনায়।

যৌবনের ব্যাকুল বসন্তবেলায় অমনি ডাক শুনেছিল কন্দর্প হীরার গানে!

—সেলাম রাজাবাবু!

নুইয়ে পড়া সলজ্জভঙ্গী আজও ভোলেনি কন্দর্প। প্রথম মাতনধরা যৌবনরক্ত। সেদিন ওর হাত হতেই প্রথম তুলে নিয়েছিল পেয়ালা, উপভোগের স্বপ্নসন্ধান পেয়েছিল সেই রাত্রেই। বাতাসে ভেসে আসে বন থেকে শালফুলের উদাসী মায়া—মহুয়ার নেশা। ভ্রমরের গুনগুনানিতে শোনে আজও হারিয়ে যাওয়া ব্যর্থ জীবন-যৌবনের কান্না—

পিয়া সনে মিলন কি আশ সখিরে।

·· সেই আশা পূর্ণ হবার পথই খুঁজতে গিয়ে বার বার ভুল করেছে। শক্তি-মদমত্ততার দর্প আর প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্যই ধাপে ধাপে নেমে ভুল পথে—নরকে।

—শুনছো!

মুখ তুলে চাইল কন্দর্প শূন্য দৃষ্টিতে; বাসন্তী বলে ওঠে,

—একটু এনে দোব। অনেকদিন ওসব খাওনি—যদি শরীরটা একটু সুস্থ হয়।

আজ বাসন্তী তাকে এগিয়ে দিতে চায় পানীয়; তরল সেই মৃত্যুনীল বিষ। এত দয়া—করুণা করে সবাই পঙ্গু দুর্বল কন্দর্পকে।

—না। দরকার হলে নিজেই নোব।

ব্যঙ্গ। বঞ্চনার মন বিষিয়ে উঠে। রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে কৃপাল-সিং-এর গাড়ী—ধুলোতে ভরে ওঠে ওর নাক মুখ চোখ। চমকে উঠলো কন্দর্প।

—অ্যাই উল্লু!

কেউ হুকুম তামিল করবার আর নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল।

—কোথায় যাচ্ছো?

বাসন্তীর কথার ফিরে চাইল—জবাব দিল না। আবার এগিয়ে চলল পথের দিকে কন্দর্প আচাই—কালীপুর মৌজার ভূতপূর্ব জমিদার।

—হাজারো রেখায় তাণ্ডব নাচছে রৌদ্ররেখা তাম্রাভ প্রান্তরে। দু'একটা ট্রাক ছুটে চলেছে। বড় বড় বুলডোজারগুলো প্রচণ্ড শব্দে গাছপালাগুলোকে টেনে ফেলছে। বাগানের ফুল ফলে ভরাগুলো; ভুবনপুরের বুক থেকে আর্তনাদ উঠছে। কাঁপছে মাটি—আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ছে ওরা। ভুবনপুরের শেষ বংশধরের দল ওই ফুলে ফলে ভরা গাছগুলো।

—রাজাবাবু!

কড়ারোদে বিসর্পিল রেখায় কাঁপছে উধর প্রান্তরে। কোথাও ফসলের চিহ্ন নেই—বিশাল খালটা গভীর ক্ষতের মত বুক চিরে চলেছে। তারই একদিকে চারা বটগাছের নীচে ঘর বেঁধেছে গোবিন্দ কেওট। সামনে মাঠটুকু বেড়া দিয়ে চাষ করেছে। কুমড়ো লতার সবুজ লকলকে গাছে হলুদ ফুলের রাশ—বাতাসে মাথা নাড়ছে কয়েকটা কলাগাছের ঝোঁপ। ছায়াঘন ঠাঁইটা পাখীর ডাকে ভরে উঠেছে।

থমকে দাঁড়িয়েছে কন্দর্প আচাই। গোবিন্দ মোড়াটা এগিয়ে দেয়।

—বসেন হুজুর।

ঘোমটা দিয়ে দূরে একটি মেয়ে প্রণাম করলো। সঙ্গে একটি ছেলে।

—নোতুন গরুর দুধ আছে ঘরে—একটু সেবা করবেন হুজুর?

কন্দর্প মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে আছে।

ঘরবাড়ী হারিয়ে আবার নোতুন মাটির বুকে গড়ে তুলছে স্নেহপ্রীতির স্পর্শভরা একটি নীড়। রুক্ষ প্রকৃতি—বন্ধ্যা মৃত্তিকা ওদের প্রীতির স্পর্শে সুফলা সুজলা হয়ে উঠেছে। আশার আলো ওর দৃষ্টিতে।

—বাঃ, বেশ ঘর তুলেছিস। জমি-জারাতও করেছিস।

—সবই আপনার আশীর্বাদে হুজুর! হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে গোবিন্দ।

দূর আকাশে ক্ষীণ শব্দ তুলে পাক দিচ্ছে একটা চিল। হঠাৎ যেন চমকে ওঠে কন্দর্প আচাই।

কৃতী পুত্র—স্ত্রী—বিষয়সম্পত্তি তারও না থাকা নেই। কিন্তু কই! জীবনে এমনি কোন নিঃশেষ প্রীতির স্বাদ তো পায়নি সে; কি অসহ্য জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরেছে সে! সবুজ শ্যামল মৃত্তিকা—জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

উঠে পড়ে কন্দর্প।

—হুজুর! এই রোদের তাতে যাবেন!

কথা বলে না কন্দর্প, হন্ হন্ করে চলতে থাকে সামনের দিকে। বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে গোবিন্দর সেই ছায়াঘন ছোট্ট ঘরটুকু—ওর স্ত্রী-ছেলের

মুখগুলো। হাসি আর আনন্দে তারা আবার নোতুন জীবন গড়েছে সৃষ্টিছাড়া ভাঙ্গনের মুখে। কোথাও এতটুকু ভয়-ক্ষতির আশঙ্কা ওদের নেই।

তার জীবনে কোথায় নিষ্ঠুর অপূরণীয় একটা ক্ষতি আজ প্রকট হয়ে ওঠে।

কাঠফাটা রোদে কাঁপছে মাটি—দীর্ঘশ্বাস উঠছে ধরিত্রীর বুক থেকে, দমকা বাতাসে মিশেছে হু হু কান্নার বেগ।

শক্ত পাথর দিয়ে তৈরী সাবেকী দোতালা বাড়ী, সাবল-গাঁইতির চোটের মুখে আগুনের ফুলকি বের হয়ে আসে। ক'দিন চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে তারা।

মানব দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছে। পিতৃপিতামহের বাসভূমি ধ্বংস করবার ভার পড়েছে তার উপর। ক'দিনের চেষ্টায় মাত্র খানিকটা পাঁচিল—একদিকের দেওয়াল খুলতে পেরেছে তারা। ওদিকে ট্রাকটার—বুলডোজার—এত কুলি বসে আছে। কোন কাজই এগোচ্ছে না?

চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ওয়ার্কসাইটে এসে ঘুরে ফিরে দেখে হতাশ হন। মানবের মনে একটা বেদনা জেগে ওঠে বার বার। নিজের বাড়ী—তার বংশের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে তাকে।

—প্লিজ ফিনিশ ইট।

মানব দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। অতীতের নোংরা ইতিহাস—কত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস মাখা ওই শেওলাধরা বিশাল বাড়ীটা। দীপা ফিসে গেছে—টুনুবৌদি মুখের উপর বলে গেছে তাকে কাপুরুষ। পুরানো সংস্কার আর চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে সে। টুনুবৌদির কথা মিথ্যে! সে মূর্তিমান নিষ্ঠুর ধ্বংস। তার এ রূপ টুনুবৌদি দেখেনি।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কথায় মানব বলে ওঠে।

—আই শ্যাল ইউজ ডিনামাইট।

দৃঢ় মনে কাজ শেষ করার ব্যবস্থা করেছে সে। মিথ্যা দুর্বলতাকে ঠাঁই দেবে না!

চার্জ করে বাড়ী ধ্বসিয়ে চুরমার করে দেবে—চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়তো ওর জন্য বেদনা বোধ করেন। মানবের দৃঢ়তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ফিউজ স্কোয়াডের লোকজন এসে বাড়ীর এখানে ওখানে—ছাদে, উপরের ঘরে, পাঁচিলে ডিনামাইট সাজাচ্ছে; সরু সরু তারগুলো জুড়ে চলেছে তারা ফিউজ ওয়ারের সঙ্গে।

দূরে চৌমাথায় দত্তদের ধ্বংসেপড়া বাড়ীর সামনে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মানব! চৈত্রশেষের বাতাসে বইছে বকুলগন্ধ। অতীতের তীর হতে ভেসে আসে কত স্মৃতি, কত হারানো কৈশোর বেলার স্বপ্ন। দীনু, মা-বাবা অভা, পরমাডোম

—আরও কত মুখ। নোতুন কাপড় পরে পূজোর সময় কাশফুলে ভরা নদীতে ঘট আনতে যেতো—সেই ঢাক ঢোল কাঁসর ঘন্টার শব্দ আজ মুছে গেছে! নিঃশেষ হয়ে গেল ভুবনপুর—তার শৈশবের কত স্বপ্নভরা দিন। বাবা-মাকে বাড়ী থেকে উৎখাত করে আজ সেই বংশেরই সন্তান এসেছে তার সাতপুরুষের ভিটেকে ধ্বংস – নিশ্চিহ্ন করতে।

দাদুর কথা মনে পড়ে—সব গুঁড়িয়ে যাবে দাদুভাই; এ দেশজোড়া বদলের মুখে ধুলো উড়ে যাবে মিথ্যে গৌরব।

আজ দাদু নেই – তাঁর কথা সত্যি হয়েছে। যাক্—সব মুছে যাক্। ভুবনপুরের অতীত ঘৃণ্য দর্পী পরিচয় নিঃশেষ হোক। কি পেয়েছে সে এই পরিচয়ে? দাদুর আত্মা তাকে অভিশাপ দেবে না। স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করবে।

পিতৃস্নেহ, মায়ের ভালবাসা, দীপার স্পর্শ—সব কিছু হতে বঞ্চিত হয়েছে সে। মন জুড়ে কি এক বিতৃষ্ণা তাকে পুরানো খাত ছেড়ে নোতুন আদর্শকে স্বীকৃতি দিতে শিখিয়েছে। তারই খেসারত দিয়েছে জীবনে ওই স্পর্শগুলোকে বিসর্জন করে। এ ছাড়া তার পথ নেই।

মেইন ফিউজ বসানো হয়ে গেছে। ওরা তৈরি। এত বছরের প্রাসাদ এক-মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে তাসের ঘরের মত।

—সরে যান স্যার; ইট পাথর এদিকে ছুটে আসতে পারে। চারিদিকে লোকজন সরাচ্ছে তারা।

সরে এলো মানব। দৃঢ় মনে দাঁড়িয়ে আছে—পুঞ্জীভূত গ্লানির শেষ মুক্তির আনন্দকল্লোল গর্জন শুনতে।

দুপুরের খররোদে বাগানের গাছের ছায়ার আড়ালে ডাকছে পাখী; উদাস হয়ে ওঠে ঘুঘুডাকা মধ্যাহ্ন; এমনি ক্লান্ত অলস বেলায় বাজতো রাখালের বাঁশী। একটি মুহূর্ত পরে ভুবনপুরের জীবনের সামান্য মাত্র চিহ্নটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একটি মুহূর্ত—শেষ পাখী ডাকছে ভুবনপুরের ছায়াঘেরা গাঁয়ে।

কেঁপে ওঠে মাটি; থর থর কাঁপছে ভুবনপুরের শেষ জীবনীশক্তি। মৃত্যুর স্তব্ধতা নামবার আগে শেষবারের মত আর্তনাদ করে নড়ে উঠল সে! আকাশ ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে।

মানবের চোখের সামনে ধ্বসে পড়েছে ইট-কাঠ-পাথরের তৈরী ভুবনপুর প্যালেস। দেউড়ির থাম দুটো ছিটকে পড়লো, মাথায় সিংহটা চুরমার হয়ে গেলো; একটা দীর্ঘ দেহ শেষবারের মত দেখা দিয়ে পাথরের স্তূপখসা ধুলোর জালে মিলিয়ে গেল।

ভেসে ওঠে একটা আকাশ-ফাটা আর্তনাদ!...কে মৃত্যুর আগে শেষবারের মত

নিজের দৃপ্ত প্রতিবাদ ঘোষণা করে গেল ওই বাড়ীর প্রাকার থেকে।

চীৎকার করে ওঠে মানব। কি যেন নেশার ঘোরে ছুটে চলেছে সে সামনের দিকে।

ওভারসিয়ার ধরে ফেলে।

—বাড়ী ধ্বসে পড়ছে স্যার! যাবেন না—যাবেন না।

—কিন্তু কে যেন চীৎকার করে উঠলো!

হাঁপাচ্ছে মানব। চেনা—কণ্ঠস্বর—অতি চেনা।

গুরু গুরু শব্দে কেঁপে কেঁপে নামছে দোমহলার পাথর প্রাচীর; ছিটকে পড়ছে দরজা জানলা; ধুলোগুঁড়ো হয়ে পড়ল প্রাসাদ। ঢেকে গেল ক্ষীণ সেই; চীৎকার!

-- ওর আর্তনাদ আর শোনা যায় না--পাথরে চাপে পিষে নিঃশেষ হয়ে গেছে তার দেহাবশেষ।

ওই চীৎকারের কণ্ঠ অতি পরিচিত মানবের!

সে যেন স্বপ্ন দেখছে। কন্দর্প আচাইকে ওরা তাড়াতে পারেনি বাড়ী থেকে—ওই পাষাণভিত্তির নীচে জীবনের শেষ সমাধি রচনা করে গেল উন্মাদ কন্দর্প আচাই—পঙ্গু জীর্ণ বিকৃত অতীতের শেষ অন্তরাত্মা মানবের চোখের সামনে বিদ্রূপ করে গেল এই সৃষ্টিযজ্ঞভরা সভ্যতাকে।

নীরব দর্শকের মত দেখছে মানব শূন্যদৃষ্টিতে। ওরা চারিদিকে ছুটাছুটি করছে; শেষবারের মত ওই স্তূপের উপর তাকে দেখা গিয়েছিল! সেইখানে ওরা পাথর সরাচ্ছে

কালীপুর থেকেও কৌতুহলী জনতা ছুটে আসছে? বিদ্যুদ্‌বেগে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে—চারিদিকে।

ছুটে এসেছে পুলিশ—হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স; লোক হটাচ্ছে সিকিউরিটি বিভাগের কর্মচারীরা!

—এইখানে; সামাল!

পাথরের স্তূপ থেকে একটা সাপ লাফ দিয়ে ওঠে; জনতার মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। একপাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানব। শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওইদিক পানে। কন্দর্প আচাই-এর মৃতদেহটা তোলবার চেষ্টা করছে ওরা; পাথরের চাপে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে দলেপিষে গেছে—নিজের হাতে গড়া প্রাসাদ ছেড়ে সে যায়নি। ওইখানেই শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে। হয়তো ব্যর্থ অনুসন্ধান করছিল তার শান্তিময় সংসারের—স্বপ্নের।

মানবের চোখে এখনও ভেসে ওঠে সেই রক্তাম্বরপরা মূর্তি—তুমি ইচ্ছে হলে

অন্যত্র যেতে পার মানব। তোমার আমার পথ আলাদা।

কে যেন ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে।

—তুমি!

মাধুরী এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে নাড়া দেয়—মানব শূন্যদৃষ্টিতে চাইল।

—এখানে থেকে লাভ নেই।

—মাধুরী ওকে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুললো।

—ডেডবডিটা? প্রশ্ন করে মানব।

—ওটা নিয়ে যাচ্ছে।

মাধুরীর দিকে চেয়ে থাকে মানব অসহায় শূন্যদৃষ্টিতে। মাধুরীর মন কেঁদে ওঠে। মানব বলে চলেছে।

—জানো, আমিই দায়ী।

মাধুরী জবাব দিল না।

বাসন্তী আজ দীর্ঘ জীবনের কথা স্মরণ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। স্বামী যে এভাবে নিজেকে ধ্বংস করবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। ভুবনপুরকে কন্দর্প আচাই ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারেনি তার অতীতের গৌরবময় দিনগুলো; হুকুম করতেই তাদের জন্ম—কারো হুকুম তামিল করতে তারা নারাজ! আগামী গণচেতনার দিনে তার মত লোক বাঁচতে পারবে না—জেনেই নিজেকে নিঃশেষ করে গেছে। বাসন্তীর চোখের সামনে সেই কথাগুলোই বার বার ফিরে আসে, কত বিনিদ্রিত রাতে শিউরে বিছানাতে উঠে বসেছিল কন্দর্পবাবু, পরাজয় হতাশার গভীর কালো ছায়া মাখানো সেই দৃষ্টিতে। শেষ আঘাত হেনেছিল বাসন্তী তার দৃঢ় প্রতিবাদে। এটা বোধহয় কন্দর্প সহ্য করতে পারেনি; নীরবে তারই প্রতিবাদ করে গেল নিজের প্রাণ দিয়ে।

মানবের বাংলোতে এসে উঠেছে বাসন্তী, কিন্তু এ যেন সেই বাসন্তী নয়, তার অন্য কোন সত্তা।

ইনজেকশন দিয়ে হাতটা ম্যাসেজ করছে মাধুরী; বাসন্ত নিরবে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

—আজ কেমন আছেন? মাধুরীর ডাক্তারী সুলভ কণ্ঠস্বর এ নয়, গভীর সমবেদনার সুর ফুটে ওঠে তাতে।

—আর কেমন আছি? কেন যে আছি তাই ভাবছি মাধুরী।

বুকচিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে বাসন্তীর; মাধুরী অভয় দেয়,

—সব ঠিক হয়ে যাবে মা; সব সইয়ে নিতে হবে।

—হ্যাঁ, যে সয় সেই-ই রয়। তিনি এসব সইতে পারেননি তাই-ই বোধহয় চলে গেলেন।

নিঃশেষ শূন্যতা নেমে এসেছে মানবের সারা দেহমনে। কেউ কোথাও নেই; কাগজে কাগজে বের হয়েছে মানবের পরিচয়—দুর্ঘটনার সংবাদ। নিজের অতীত জীবনের গতিপরিবর্তনের ইঙ্গিত—পুরোনো জীর্ণ দিনগুলোকে ডিনামাইটের ঘায়ে উড়িয়ে দিয়ে চুরমার করে দিয়েছে সে।

দীপা যদি শোনে শিউরে উঠবে। আর একজন শুনলে অবাক হবে; সে টুনুবৌদি—যে বলেছিল তাকে ভীরু-কাপুরুষ।

বাবার মৃত্যুর পর সকলেই এসেছিল সমবেদনা জানাতে! চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মিঃ রমণ এসেছিলেন—এসেছিলেন সি. এম্. ও., স্টীলটাউনের ইঞ্জিনিয়াররা। ওর যেন বিদ্রূপ করতে চেয়েছিল মানবকে।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে বারান্দায়; মাধুরী এসেছে, ভিতরে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে।

— কাজে বেরুবেন না?

—কাজে? মানব মুখ তুলে চাইল—কাজ। হুঁ যাবো বৈকি।

এছাড়া আর নিজেকে ভোলবার পথ কই। হঠাৎ চিঠিখানা হাতে পেয়ে একটু কৌতূহল বশেই খুলল। মাধুরী তুলে নেয় ওর হাতে—সকালে এসেছিল—দেখেননি?

নীল হালকা রংএর খামখানা—খুলেই অবাক হয়ে যায়। পড়বে কিনা ভাবছে—একটা হাসিভরা সুন্দর মুখ। নিটোল হাতে ওর উছলে পড়ে দুগাছি মকরমুখো বালা, নীল আকাশে হারিয়ে যাওয়া কোন কেশবতী কন্যা। একটা দুঃসহ বেদনায় মন ভরে ওঠে—তার উপরই রাগ হয়। সেই আজও অলক্ষ্য থেকে যেন তীব্র ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে সাড়া দেয়।

তুমি ভীরু কাপুরুষ।

পাটনা থেকে লিখছে টুনুবৌদি। পরিষ্কার মুক্তোর মত হাতের লেখা—নিজের দেহের মতই সুন্দর সুগঠিত লেখাগুলো।

—নিজের কৃতকর্মের স্বপক্ষে জবাব দেবার কিছুই নেই মানব; হয়তো তুমিও আজ আমার এই অপরাধ ক্ষমা করবে না। সকলের চোখেই আমি দোষী।

তুমিই বলতে—যাতেই হাত দাও বৌদি তাই তুমি সুন্দর করে তোল; তাই একবার চেষ্টা করছি আমার ব্যর্থজীবন সুন্দর করে তুলতে পারি কিনা। পারো তবে তুমি আমায় অন্ততঃ ভুল বুঝো না।

কাগজে দেখলাম তোমার দুর্ভাগ্যের সংবাদ—দূর থেকে সমবেদনা

জানালাম।

...আরও কি সব লিখেছে। চিঠিখানা গুটিয়ে দলা পাকিয়ে ফেললো মানব। মাধুরী ওর দিকে চেয়ে আছে। মুখচোখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সারা মুখে ফুটে উঠেছে ওর ঋজু কাঠিন্য। কি যেন বঞ্চনা আর ব্যর্থতা একাকার হয়ে পরিস্ফুট।

—কোন খারাপ খবর? মাধুরী প্রশ্ন করে।

—না।

প্রসঙ্গটা চেপে গেল সে, উঠে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। দূরে বাতাস কাঁপিয়ে শব্দ আসছে—ব্রিজের গার্ডারগুলো ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে—ভুবনপুর নিঃশেষ হয়ে গেছে, চকচক করছে জল আর মাঝে মাঝে উঠে আছে দু'একটা ঢিবি—আচাই প্যালেসের শেষ চিহ্ন—তাও আর থাকবে না।

গ্যারেজ থেকে গাড়ীখানা বের করে—তৈরী হয়ে নেয়।

—বেরুচ্ছেন যে!

—হ্যাঁ; ক'দিন যাইনি, একটু ঘুরে আসি।

মাধুরীর জবাবের অপেক্ষা না করে চলে গেল। রাগ হয়, পুঞ্জীভূত রাগ—টুনুবৌদি দূর থেকে যেন ব্যঙ্গ করেছে তাকে নিজের সুখ-সম্পদ-পূর্ণতার সংবাদ দিয়ে।

রঙ্গিণী টগর; দামোদরের ঢলনামা বন্যার মত আজ দুর্মদ—দুর্দাম সে। কূলে কূলে ভাঙ্গন ধরিয়ে নিজের পথে চলে আপন গতিতে। নীলে হাড়ী, পরমা, মুকুন্দ সাঁপুই, বনোয়ারী—সবাই কোন্ অজানায় হারিয়ে গেছে। আজকের কালীপুর, নিশ্চিহ্ন ভুবনপুরে তাদের নাম একটি দুঃস্বপ্ন; কন্দর্প আচাই-এর মত বাধার মৈনাককে সে চূর্ণ করেছিল। কন্দর্পবাবু আজ মৃত; টগরের নিঃশ্বাস যাকেই একবার স্পর্শ করেছে সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কৃপাল সিং জ্বলছে; তুষের আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলছে।

কারবারপত্র মন্দা; প্রথমে কালীপুরে এসে সে যে ব্যবসা শুরু করেছিল কন্দর্পবাবুর সঙ্গে সেই ওয়াগন লুটকরার মত লাভজনক ব্যবসা এদের কোনটাই নয়। টেণ্ডার ধর—খোসামুদি করে খেটেখুটে বিল বানাও, অফিসে সাহেব-সুবো থেকে কেরানীবাবুদের তোয়াজ করো—তবে কাটছাঁট করে মিলবে টাকা। অনেক হাঙ্গামা, বহু হ্যাঁপা।

তারপর সাহেবদের ধমক—এভাবে কাজ করলে টেণ্ডার ক্যানসেল করে দোব, সিংজী।

—দুটো গাড়ী ব্রেক ডাউন সাব। কৃপাল সিং মানবের সামনে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে। বাবাকে তিন তুড়ীতে হারিয়েছিল—ছেলেকে পারা দায়।

— আমাদের কাজ তার জন্য বন্ধ থাকবে না, মানব স্রেফ জবাব দেয়।

চুপ করে শুনে চলেছে সিংজী, আরও বহু কোম্পানী কলকাতা আসানসোল থেকে এসেছে—দশবিশখানা গাড়ী চালায় তারা, কৃপাল সিং-এর গাড়ী পাঁচ-খানাতে এসে থেমে গেছে। আর যোগান নেই; রাতের রসদ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন চলেছে খরচের অঙ্কে; কলসী থেকে গড়ানো জলের মত, তোড় কমে আসছে। নোতুন গাড়ী তো দূরের কথা—গাড়ীর স্পেয়ার পার্টস্ কেনবার টাকাও সবসময় জোটে না।

কৃপাল সিং যেন অনুনয় করছে।

—আপনার বাবার আমলের লোক সাব; বিলগুলো যদি পাস করিয়ে দেন এসব গোলমাল আর হবে না।

মানব কথা কইল না, একটু বিস্মিতদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে; মনে মনে কি যেন ভাবছে। বাবা জেল হাজতে বাস করেছিল; সেইদিনকার মূর্তিটাও চোখের উপর ভেসে ওঠে মানবের; একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—দুচোখের দৃষ্টিতে কি এক দুঃসহ অপমানের জ্বালা। সেই আঘাতের পর থেকেই বদলে গিয়েছিলো কন্দর্প আচাই। ফাটল ধরেছিল তার মনুষ্যত্বের দৃঢ় সতেজ কাঠামোতে। ধীর কণ্ঠে জবাব দেয় মানব।

—কাজ ইন্‌স্পেকশনের অর্ডার দিচ্ছি।

অর্থাৎ আরও গোলমাল। এতবড় কাজ হচ্ছে—এমন সামান্য ব্যাপারেও এত নিখুঁত নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি আগেকার সাহেবরা। যে যেমন মাল পেরেছে দিয়েছে, একটু এপাশ ওপাশ—এহাত ওহাত করে দিয়েছে ঠিকাদাররা; আপিসে বসেই বিল চেক্‌ড এবং পেইড হয়ে গেছে। কাজ দেখতে গেলেই বিপদ। তিনফুট নীচে মাপের মুখে দুফুটেও দাঁড়াবে না। পাথর বলতে বেলে মাটির চাঁই। সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। চিন্তায় পড়ে সিংজী।

মানব কাজ করে চলেছে। হঠাৎ মুখতুলে দেখে কৃপাল সিং তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—আর কিছু বলবেন? ইতস্ততঃ করে কৃপাল সিং। কথাটা বলতে সাহস হয় না।

বাকী কথাটা ওর মত কাঠখোট্টা ইঞ্জিনিয়ারকে জানান যায় না। সেলাম করে নীরবে বের হয়ে এল কৃপাল সিং। চিন্তায় পড়ে গেছে। তুখোড় ছেলে—যেমনি

কাজের; তেমনি কড়া—এর কাছে সুঁচ গলবে না।

নোতুন শহরে টগরের প্রতাপ প্রতিপত্তি যেন বেড়েই উঠেছে। রূপ-যৌবন নিয়ে উঠছে টগর, গুণের দিক থেকে মানব; পুরোনো ভুবনপুরের শেষ চিহ্ন তারাই। দুষ্ট লোক বলে টগরই কৃপাল সিং-এর সবকিছু হাত করেছে।

সিংজীর অবস্থা কিছুটা টের পেয়েছে সে। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে গেছে। সিংজী শেষ আশ্রয় হিসাবে ধরেছে টগরকে।

—সাহেবকে তুমি বলে দাও না বিবি; একই গাঁয়ের বাসিন্দা তোমরা তোমার বাতভি রাখবে।

টগরের মনে পড়ে নির্জন বাগানে পাখীডাকা একটি অপরাহ্ণ বেলা, প্রথম যৌবনের উপবনে পাখীর সেই একটি সুর। অতীতের একটি মধুর অপরাহ্ণবেলা। আজ! আজ কোথায় তা নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

এ যেন অন্যকোন ঠাঁই। পুরোনো কালীপুরের জীর্ণ কাঠামোখানার ছাঁদন-বাঁধন খুলে নোতুন করে গড়ে তুলেছে। নির্জন পথ আজ গাড়ীর শব্দে মুখর; ধুলোরাস্তায় পড়েছে পিচের আবরণ। ঝকঝকে গাড়ী স্টেশন ওয়াগন—নোতুন ডিজেল যাত্রীবাহী বাসগুলো ছুটে চলেছে। পথের দুধারে সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে দু'চারটে সাবেকী তাল তেঁতুল গাছ। কালীপুর গ্রামের মাটির দেওয়ালের বাড়ীগুলো আজকের এই অগ্রগতির বেগে যেন ছিটকে পিছিয়ে পড়েছে। কেউ কেউবা মাটির কোঠার গায়ে পাঁচইঞ্চি ইট-পলেস্তারা ধরিয়ে আধুনিক হবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। তার গায়ে কে আবার সেঁটে দিয়ে গেছে টাউনশিপে নোতুন তৈরী সিনেমা হাউসের সজীব হিন্দীছবির কুৎসিত পোস্টার।

রাস্তার দুপাশে গড়ে উঠেছে ছোটবড় দোকান। জমির মালিকরা কোন-রকমে বাড়ী তৈরী করেই ভাড়া নিয়ে খুশী হতে চেয়েছে—দোকান দিয়েছে গুজরাটী-পাঞ্জাবী-মাড়োয়ারীর দল।

একটু এগিয়েই দেখা যায় সাইনবোর্ডটা।

আল্‌স্‌ হোটেল কন্টিনেন্টাল ডিশেস সার্ভ্‌ড।

টগরের জীবনে এ একটা কীর্তিই বলা যায়। কালীপুর বাজারে সেরা হোটেল গড়ে তুলেছে সে—নিজেকেও যেমন করে হোক বদলে ফেলেছে!

রাস্তার ধারে উঠেছে নোতুন দোতালা বাড়ীটা—থাকবার ব্যবস্থা আর পানীয়ের ব্যবস্থাও আছে। কন্টিনেন্টাল ডিশেস না ড্রিঙ্ক ঠিক বোঝা যায় না—কোন্‌টা পরিবেশন করা হয়। উচ্চগ্রামে রেডিওতে বাজছে বিদেশী সুরের মূর্ছনা। টগরের রূপও বদলে গেছে—স্নান সেরে হালকা রংয়ের শাড়ীর

আবরণে দেহখানাকে ঢাকবার চেষ্টা করে—ঘাসের চটি পায়ে তদারক করছে চারিদিক।

বড় বড় ঠিকাদারের প্রতিনিধি, মালিকরা আরও হোমরা চোমরাবৃন্দ আসে—এ ওকে আপ্যায়িত করে কাজ কাজ গুছোবার জন্য। উপকরণ হিসাবে মদ্য পানীয় তাছাড়া আরও থাকে অনেক কিছু—যার নীরব সাক্ষী ওই টগর। বিদেশী সাহেবদের—বর্তমান বাঘা বাঘা প্রতিনিধিদের জন্যই দুটো ঘরে এয়ার কুলার বসাবার ব্যবস্থা করছে। অভিজাত চালু হোটেল।

ওকে হিংসা করে অনেকেই—মেলেচ্ছ কাণ্ড শুরু হয়েছে। মধুচক্র। ছিঃ ছিঃ! হাড়ীডোমের হোটেলে যায় কি করে? জাত—

কে যেন জবাব দেয়—জাত-ফাত আর কালীপুরে নেই দাদা, দামোদরের বানে সবধুয়ে গেছে। এ এখন শ্রীক্ষেত্র—বুকলা।

কালীপুরে প্লাবন নেমেছ। সব অতীত দিন আর জীর্ণ সংস্কার যেন মুছে গেছে কোন্ দিকে।

সশব্দে হর্ন বাজিয়ে কার বিরাট ঝকঝকে গাড়ীখানা ছুটে গেল! এ রাস্তায় পুরোনো ঝরঝরে গাড়ী প্রাইভেট কার বিশেষ যায় না! নোতুন শহর—নোতুন জীবন—নোতুন গাড়ী এর বুকে!

বাসন্তী ক্রমশঃ সেরে উঠছে, মাধুরীর চিকিৎসার গুণেই বোধহয়। রোজ বৈকালে বাংলোর সামনে ডেক চেয়ারে বসে চেয়ে থাকে সামনের দিকে—মাধুরীও ঠিক এই সময়েই আসে। রীতিমত একটা দাবী ফুটে ওঠে মাধুরীর কণ্ঠে,

—কই আজ ওষুধটা দুবার খাননি?

—ভাল হয়ে গেছি মা।

—না না। এখনও ওষুধ খান। দেখি হাতটা।

মাধুরী নাড়ী দেখতে থাকে—না ঠিক আছে।

বৈকালের চা টা এখানেই খেয়ে নেয় মাধুরী, কোন কোনদিন মানবও এসে উপস্থিত হয়। আজ কাজের চাপ কম—মানবও এসে জুটেছে।

চা খেতে খেতে হাল্কা কথাবার্তাও হয়।

মানব সেদিন বলে ওঠে।

—ওই নালার পাশে একদিন একটা খরগোশের বাচ্চা ধরেছিলাম মনে আছে?

মাঝে মাঝে মাধুরীও হারানো সেই দিনগুলোকে খুঁজে পায়—নিঃসঙ্গ একক জীবন। রিক্ততাকে ভোলবার অবকাশ পেয়েছে। বাবা মারা যাবার পর বহু

কষ্টে ডাক্তারি পড়েছিল, ভেবেছিল জীবনে একটু ঠাঁই মিলবে কিন্তু কাজের মধ্যে নেমে আর অবকাশ খুঁজে পায়নি।

হঠাৎ পথের বাঁকে জীবন তার জন্য বোধ হয় এমনি কোন মাধুর্যের সঞ্চয় রেখেছিল। মাধুরী চুপকরে কি ভাবছে! সন্ধ্যা নামছে ঠাঁই ঠাঁই সবুজের রিক্তস্পর্শ লাগা বন এখনও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে ওঠে মানব।

– সেদিন তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারোনি মাধুরী, জানতে তোমার বাবার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে?

মাধুরী কথা কয় না—নীরবে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

ভোঁ বাজছে ওয়ার্কশপে—সেদিনের কালীপুরে কোথাও কোন কর্ম-ব্যস্ততা ছিল না। বলে ওঠে মাধুরী অন্যমনে।

—জানতাম, তবু বলিনি। আপনি তার কোন প্রতিকারই করতে পারতেন না! তাই চুপ করেই গিয়েছিলাম।

মানব চমকে ওঠে—হ্যাঁ। টুনুবৌদিও বলেছে তাকে কথাটা—তার করবার কিছুই ছিল না। আজ মাধুরীও সেই কথাই শোনাল!

—কিন্তু বলেও দেখোনি মাধুরী।

মাধুরী জবাব দিল।—যাক সেকথা তুলে কোন লাভ নেই; ঠকিনি তাই নিয়ে।

মানব উঠে পড়েছে। মনে একটা চাঞ্চল্য। অসহায় সে! সমস্ত কাজের মাত্র উপলক্ষ্য সে, করবার তার কোথাও যেন কিছু নেই। টুনুবৌদি নিদারুণ কঠিন সত্য কথাটাই বলে গেছে বোধ হয়। মাধুরী সেই পরিচয় পেয়েছে অনেক আগেই।

পরমুহূর্তের সমস্ত মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। টেবিলের উপর একগাদা ব্লুপ্রিন্ট পড়ে আছে—তাই মেলে ধরে লাল পেন্সিল বোলাতে থাকে। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে ধরে—হ্যালো ওয়ার্কশপ প্লিজ।

বাইরে নেমেছে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। কালো ধোঁয়ার রাশি উড়িয়ে বের হয়ে গেল পশ্চিমগামী মেইল ট্রেনখানা—গর্জের ভিতর দিয়ে গাড়ীখানা ছুটছে. বাংলোর সার্সিগুলো ঝনঝন করে ওঠে—কাঁপছে মাটি—শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে বনের পাতায় পাতায়।

এ যেন অন্য মানুষ—হ্যাঁ,সাতাশ ইঞ্চি বোর—ওদিকে তিন মিলিমিটার কাটথ্রেড, কালই—দুশো চাই-ই! বাই টুমরো—থ্যাঙ্ক উ।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে বাইরে যাবার জন্য তৈরী হয়। জরুরী কাজ রয়েছে। সেইখানেই ফুটে ওঠে তার কঠিন ব্যক্তিত্ব!

টুনুবৌদি—মাধুরী সবাই তাকে যে পরিচয়ে জানে তার থেকে এখানে সে স্বতন্ত্র মানুষ ;

হাফশার্ট আর ফুলপ্যান্ট পরনে ; হাতে একটা পাঁচ-সেল টর্চ—ক্রেপসোল জুতো পরে নিঃশব্দ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যায়, মানব গাড়ীর দিকে।

—ঠাণ্ডা লাগিয়োনা মা, ভিতরে যাও।

—যাই বাবা। মাধুরীও যাচ্ছে নাকি ?

জবাব দেয় মাধুরী—হ্যাঁ, আমারও হাসপাতালে যেতে হবে, একবার রাউণ্ড দেওয়া দরকার।

বাসন্তী বলে।

—ডিউটি আর ডিউটি ; মেয়েমানুষও কি কলকব্জা হয়ে উঠলো বাবা,

মাধুরী হাসে—এই কাজই যে বেছে নিয়েছি মাসীমা। এখন আপশোষ করলে আর চলবে কেন !

বাসন্তী ওর দিকে চেয়ে থাকে, অন্তরভরা প্রেম-প্রীতি, দেহভরা যৌবন নিয়েও ব্যর্থ হয়ে রয়েছে ! যে ফুলে ফল ফলে না সে ফুলের যতই সৌন্দর্য থাক না কেন তার পরমায়ু ক'দিন ! নিঃশেষে কেঁদে ফিরে যাবে।

·· মানব চুপ করে গাড়ী চালাচ্ছে, কঠোর কাঠিন্য ফুটে ওঠে তার মুখে মাধুরী যেন ওর বহু দূরে সরে গেছে—কোথাও সান্নিধ্যের সহজ ছোঁয়া নেই।

মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম রাখবার জন্যই টাউন প্ল্যানিং কমিটি বনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করেনি। মাঝে মাঝে বিঘে কয়েক জায়গা জুড়ে বাড়ী বাংলো ইত্যাদি, ওদিকেই আবার রাস্তাটা গভীর বনে ঢুকে গেছে। দুপাশে পুরোনো বনস্পতির প্রহরা, লাল পাথুরে টিলার উপর দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ বট কেঁদ গাছ আটাড়ি লতার সবুজ পত্রাবরণে সাদা ফুলের সমারোহ। দুপাশ কেটে পথ তৈরী করতে হয়েছে, এখনও মোটা মোটা শিকড়গুলো সাপের মত বের হয়ে আছে, পথের বাঁক ঢেকে গেছে বনে ; পথের ও-বাঁকেই আবার শহর ; সাদা সাদা বাড়ীগুলো. টিনের শেড দেওয়া কাঁটাতার ঘেরা গুদাম, অফিস ! আবার উৎরাই—ঘন বন ; মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে আদিম ছায়াঘন পাহাড়ী নদী, নুড়িতে নুড়িতে বেজে ওঠে স্রোতের চঞ্চল সুর।

নোতুন কালীপুরে বহুদিন পর আবার এসেছে দীপা। প্রথম এসে শিউরে উঠেছিল। সেই কালীপুর স্টেশন। কয়েক বৎসর আগেও এসেছিল একদিন এই পথে ; পথটা ঘুমটির কাছে লাইন পার হয়ে নদীর দিকে চলে গেছে ; দূরে

দেখা যায় নদীর বুকে জলের বিস্তৃত সীমানা; দুচোখ মেলে খোঁজে ভুবনপুরের পথটা; নোতুন কোয়ার্টার এর ভিড়ে কোয়ায় হারিয়ে গেছে আজ। ভুবনপুরের নাম পর্যন্ত মুছে গেছে ওই সীমাহীন জলধারার অতলে।

কাউকে জানায়নি সে। বসন্তবাবুকেও না। চাকরিটা পেয়ে যেন অকূলে কূল পেয়েছে সে। দীপা ব্যানার্জি আজ মাত্র আড়াইশো টাকার জন্য কলকাতা ছেড়ে বনবাসী হলো—এই কথা নিজেও সে বিশ্বাস করতে পারে না অথচ এই দীপাই একদিনে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড়াইশো টাকা খরচ করেছে আজ তার সারা মাসের পরিশ্রমের মূল্য মাত্র ওই টাকা।

স্টেশন থেকে বাস সার্ভিস রয়েছে, দীপাও উঠে বসলো বাসে। আজ সকলের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই।

রাত্রি নেমেছে। মানব বাংলোয় ফিরেও বাইরের দিকে চেয়ে আছে। নিথররাত্রি নীল হালকা শাড়ির গস্‌খস্‌ শব্দ। হাতের কাঁকন বাজে রিনিরিনি—বাতাস ফুলের গন্ধে উদাস; চাঁপা—কাঠগোলাপ ফুলগুলো বাতাসে নির্লজ্জভাবে আত্ম-নিবেদন করেছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানে না, হঠাৎ কি যেন স্বপ্ন দেখছে;

কণ্ঠতালু শুকনো হয়ে আসে মানবের, একি নিবিড় বুকভরা তৃষ্ণা এতকাল বুকের অতলে সঞ্চিত ছিল—আজ নির্মম ব্যাকুলতায় ফেটে পড়ে।

নরম উষ্ণ স্পর্শ। ওর চুলের মিঠে সৌরভে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে মানব। মুঠো মুঠো করে ছিনিয়ে নিতে চায় ওর শ্রী—যৌবনমদির পেলবতা; কালো ডাগর চোখ দুটো আবেশে বুজে আসে;

একটি মুহূর্ত! অন্তহীন অতলে যেন ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে সে। ধড়মড় করে উঠে বসল। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ট্রেন একখানা ছুটে চলেছে—ঝন ঝন শব্দ করছে সার্সিগুলো—আলোটা দেওয়ালে ঝলসে উঠেই সরে গেল চকিতের মধ্যে।

কোথাও কেউ নেই। স্বপ্ন দেখছিল সে। কি এক দুঃস্বপ্ন! অবচেতন মনের গহনে এ কোন্‌ দুরাশা দুঃসাহস সঙ্গোপনে তার নিজের অজ্ঞাতসারেই লুকিয়ে ছিল জানে না। আজ চমকে ওঠে সেই স্বরূপ প্রকাশ পেতে।

টুনুবৌদি। টুনুবৌদিকে কি এক রূপে সে দেখেছিল আজও জানে না। সারা মনে ঝড় উঠেছে। সে বর্ষামুখর রাতের কথা আজও ভোলেনি—ব্যর্থ কান্নার রাত। বুক জ্বালানো রাত! প্যাডপেপারটা টেনে নিয়ে লিখতে থাকে মানব। সুপ্তমনের হু হু ঝড় থামে নি।

—তোমাকে ক্ষমা করতে পারিনি—কোনদিনই পারবো না।

বাইরে এসে দাঁড়াল—তারাজ্বলা স্তব্ধ রাত্রি। চড়াই-এর মাথায় কেমন আলোটা মিট মিট করছে বাতাসে নদীর মৃদু আর্তনাদ।

তার মনের সব প্রশান্তিকে কুরে কুরে খেতে দেবে না মানব। ওদের ভুলতে চায়। নিজেকে বর্তমানের মধ্যে ফিরে পেতে চায়।

অন্ধকার রাত্রির অন্তহীন আঁধার সাগরে দ্বীপের মত জ্বলছে এক একটা আলো। মাধুরী—দীপা—টুনু—মানব—সবাই ওমনি মুক্ত সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া এক একটি দ্বীপ। কোথাও রঙ্গীন প্রবালের স্বপ্ন, কোথাও শুক্তির কর্কশ আবরণে মুক্তার জন্ম—কোথাও কর্কশ লাভাপ্রবাহপূর্ণ কবোষ্ণ উপত্যকা।

স্বাভাবিক চপলতা, খুশির হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার জন্মগত অভ্যাস—বাবা মারা যাবার পর দীপার মন থেকে চলে গিয়েছিল। অবস্থা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সহজাত প্রকৃতিগুলো ফিরে আসছে। বনঢাকা কালীপুর স্টীল-কোক টাউনে দীপা ব্যানার্জি একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠছে। কোথায় তার হার মানার দুর্বলতা একটা রয়ে গেছে—তাকে চাপবার জন্যই দীপা যেন এই মূর্তিতে নোতুন হয়ে জন্ম নিতে চায়। ছোট ভাইকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারলেই পারিবারিক দায়মুক্ত হয় সে, তার জন্যও এই পরিস্থিতি প্রয়োজন।

অফিসারস্ ক্লাবে থিয়েটারের রিহার্সেল চলেছে। দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই আসেন; সকলেই কুলীন; মোটা মাইনের অফিসার নাহয় ইঞ্জিনিয়ার নাহয় বিদেশী বড় ঠিকাদার ফার্মের তাবড় কর্মচারী। গাড়ী হাঁকিয়ে কেউ পাঁচ মাইল দশ মাইল বনপাহাড়ী ভেঙ্গে ব্যারেজের পাশ থেকে নাহয় ওয়ারিয়ার কাছ থেকে আসে। রাত্রি পর্যন্ত হৈ চৈ চলে; সঙ্গে পান-ভোজন। ওদিকের ঘরে রিহার্সেল চলেছে। কলকাতা থেকে ভাড়াটে অভিনেত্রীরা আসবে, পুরুষ রোল করছে তরুণ অফিসাররা।

দীপাও দলে ভিড়ে গেছে—ওরাও ওকে পেয়ে খুশী। গানের সুর নিয়েই ব্যস্ত। আলতোভাবে পিয়ানোর সুর তুলছে; আশেপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'একজন অফিসার। হঠাৎ কার গাড়ীর শব্দ শুনে সকলেই এগিয়ে যায়; কোন্ দুহাজারী মনসবদার সাহেব এসেছেন।

দীপার চারিপাশের স্তাবক দল উধাও হয়ে গিয়ে জমা হয়েছে 'স্যারের' গাড়ীর চারিদিকে; কে আগে গাড়ীর দরজাটা খুলে দেবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। মিঃ রমণ গাড়ী থেকে নামছেন হাঁসফাঁস করে।

সবাই ইতিমধ্যে তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কে যে কি বলছে তা কি—অর্থ তাও জানবার দরকার নেই। তবু হাসছে আর, বলছে নানা কথা।

—কে বলে ওঠে।

—বড্ড গরম স্যার; পাথুরে দেশ কিনা।

—ভেরি হট্ স্যার।

দীপা বারান্দা থেকে চেয়ে থাকে ভদ্রলোকের দিকে; কালো মোষের মত চেহারা; একস্তূপ মাংসের উপর একটা পাকা তালের মধ্যে যেন দুটো রসগোল্লা বসিয়ে দিয়েছে। হাফশার্টটা ভুঁড়ির চাপে ফাটবার উপক্রম, সিঁড়িতে উঠতেই হাঁপিয়ে ওঠেন মিঃ রমণ।

—হ্যাল্লো বয়েজ!

দীপার দিকে চোখ পড়তেই ধমকে দাঁড়ালেন; কে একজন এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমাদের ড্রামার মিউজিক ডিরেকশন দিচ্ছেন মিস্ দীপা ব্যানার্জি।

দীপা হাত তুলে নমস্কার করলো; মিঃ রমণ যেন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তার দিকে;

—প্লিজ্‌ড টু মিউ ইউ। লেট আস্ হ্যাভ সাম ফাইন মিউজিক। ইউ নো—উই আর মিউজিক লাভিং পিপ্‌ল।

রাজা যত বলে পারিষদবলে বলে তার শতগুণ।

—নিশ্চয় স্যার। ইওর কানট্রী ইজ দি ক্রেডল অব মিউজিক।

কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার ওপাশে দুজন বেয়ারাকে নিয়ে নিজেই পিয়ানোটা টানাটানি শুরু করেছে।

—হোয়ার ইজ আওয়ার ব্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার—ইয়ং আচারিয়া?

—হি ইজ অলওয়েজ বিজি স্যার।

—ভেরি এনার্জিটিক অব কোর্স। স্যার কমেণ্ট করেন।

মানবের কথাই বলছে যেন ওরা; ইতিমধ্যে দীপা মানবের পরিচয়টা জেনে নিয়েছে। এখানে এতদিন এসেছে একদিনও তার দেখা পায়নি। ব্যারেজ আর থারমাল ইলেক্‌ট্রিক স্টেশন নিয়েই রয়েছে সে দিনরাত; মাঝে মাঝে মধ্যরাতের তারার মত একটু দূরের রহস্যময় আভাসঢাকা কণ্ঠস্বর শোনে তার। দীপাও ওকে ভুলতে চায়—খবর নিতে ঔৎসুক্য তার নেই! লাভ কি!

তখনই গানের আসর গড়ে ওঠে স্যারের অনুরোধে।

দীপাও তৈরী।

ডায়াসে গান শুরু হয়েছে, নীল আলো জ্বলছে। সুরটা হালকা হাওয়ার মত ভাসছে।

মনে হ'ল
যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ।

স্তব্ধ দৃষ্টিতে বসে আছেন মিঃ রমণ; ওপাশে তন্ময় হয়ে শুনছে ভক্তবৃন্দ। দীপা আজ সবাইকে হাতের মুঠোয় পুরেছে। আবেগে কাঁপছে তার কণ্ঠস্বর; ব্যর্থ আবেগ—না পাওয়ার বেদনাবিধুর প্রেম তার মন জুড়ে কাঁদন এনেছে। দুচোখের দৃষ্টিতে তার স্বপ্নময় কি এক মাদকতা; বাতাসে উড়ছে দু'একগাছি চূর্ণ কুন্তল! হাতে একগাছি কঙ্কণ নিটোল পূর্ণতার প্রতীক হয়ে রয়েছে। হাততালির শব্দ ওঠে। খুশী হয়েছে ওরা সবাই 'স্যার'ও।

ক্লাব থেকে একচেঞ্জে ফিরে আসে ডিউটিতে, ইনচার্জ বলেন—আজ আপনার 'অফ' বাসায় গিয়ে রেস্ট নিন্।

একটু বিস্মিত হয়ে ওঠে দীপা—অফ্!

—হ্যাঁ, আজ ক্লাবে বাজীমাৎ করে এসেছেন শুনলাম। আপনার প্রশংসা তো ওঁদের মুখেমুখে।

বের হয়ে আসছে দীপা।

দরজার কাছে এগিয়ে এসে ইনচার্জ মিঃ বোস বলে ওঠেন,

—দিন না, ডি.ও'র কাছে ব্যাটা সুপারইনটেনডেণ্টের নামে লাগিয়ে; পাকা শয়তান ওটা। টাইট হয়ে যাক ব্যাটা মক্ষিচুস।

—কি বলছেন? দীপা একটু অবাক হয়ে যায়।

—ঠিকই বলছি, আপনি একটু টিপে দিলেই ব্যস! জ্বালিয়ে খেলে ম্যাডাম। আপনার কথাতেই কাজ হবে।

দীপা কথার জবাব দিল না। বেশ বুঝতে পারে রাতারাতিই এখানে তার দাম অনেক বেড়ে গেছে।

আনমনে বাসার দিকে এগিয়ে চলে।

দীপা বাগানের সীমানার ওদিকে তার কোয়ার্টারে এসে ঢুকলো; বুনোমাটির 'তার' এখনও মরেনি, হলদে কাঁকুরে মৃত্তিকার মাঝে মাঝে মাথা তুলে আছে দু'একটা শালচারা। লকলকে পাতাগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে। সারা দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে; ঘামে ভিজে গেছে ব্লাউজটা. বুনো হাওয়ার ঝড় বইছে। দুপুরের সেই বালিতাতা গরম এখনও যায়নি।

গা থেকে সবকিছু খুলে বাথরুমে ঢুকে গায়ে মাথায় জল ঢালতে থাকে দীপা; মনে একটা কিসের সুর জাগে বার বার; এক দিনেই সে যেন চিনে ফেলেছে নিজেকে, তার যোগ্যতা। সুরের ভেলায় পাড়ি জমিয়ে পথ চলবে রূপের পাল তুলে জীবনের সমুদ্রে এমনি করেই বার বার।

টগরকে পাঠিয়েছিল কৃপাল সিং-ই শেষ চেষ্টা হিসেবে বিলটা পাস করাতে মানবের কাছে। হাজার হোক গ্রামের ছেলে—পরিচিত।

কিন্তু টগরকে হতাশ হয়ে ফিরতে দেখে চটে ওঠে কৃপাল সিং,

—তোমার রূপরস শুকিয়ে গেছে বিবি—একটা ছোঁড়াকে কাত করতে পারলে না?

টগর চুপ করে থাকে, হয়তো ওর কথাই সত্যি। টগরের দেহমনে কেমন যেন স্তিমিত ভাব এসেছে; শয়তান সিংজীই তার জন্য দায়ী; কয়েকবারেই ওই শয়তান তার যৌবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে; বাঁদরের নখের ধারে ছিটকে পড়া ফুলের মত? শেষবারের যন্ত্রণা আজও ভোলেনি সে। বাধ্য হয়েই লিডি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল।

—এ জীবন ছেড়ে দাও টগর। এভাবে চললে বাঁচবে না তুমি। ডাক্তার সাবধান করে।

টগরের মাথা সর্বত্রই নীচু করে দিয়েছে ওই শরতান।

যাও, বাড়ী যাও বিবি। সিংহী আজ সার বুঝেছে।

—আমি যাবোই, তোমাকেও এখান থেকে যেতে হবে সিংজী। এ কারবার তোমার চলবে না; চুরি ডাকাতি খুনখারাবি—কি না করেছো?

হা হা করে হাসছে কৃপাল সিং। তার ব্যবসার পথ সে স্থির করে ফেলেছে। তার জন্য জেলা সদরে কিছু টাকাও দাদন দিয়ে এসেছে। আর একাজ সে করবে না।

—ঠিক বাত বলেছো বিবি। দুরসা কাম করবো ইবার।

ছোটবড়···কর্মচারীদের পায়ে তেল দেবে না, খোদ শাসনকারীদিকেই তেল দেবে। দিল্লীতে শিখ সম্প্রদায়ের নেতার কাছ থেকে তদ্বির তদারক করাচ্ছে। বেনামিতে লিমিটেড ফার্ম খোলবার ব্যবস্থা করেছে; রোড পারমিটে ছেয়ে দেবে এ অঞ্চল। নোতুন হাইওয়ে হচ্ছে—পাবলিক কেরিয়ার ট্রাক আর প্যাসেঞ্জার বাস চালাবে সে।

তবু হাসতে হাসতে বলে কৃপাল সিং।

—তোমাকে ছেড়ে যেতেই দিল জখম হয়ে যাবে বিবি।

—মুখপোড়া কোথাকার!

হাসছে সিংজী, নিপুণগতিতে টগরকে কাছে টেনে নিয়ে দাড়ি-গোঁফ সমেত মুখখানা ওর গালে বুলিয়ে দেয় ; টগরও চটে উঠেছে।

—ছাড়ো বলছি বুনো জানোয়ার।

কৃপাল সিং-এর মনে কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই, নিপুণ খেলোয়াড়ের মত সহজ ভাবেই সব কিছু নেয় সে ; মন তার পাথর হয়ে গেছে, নয়তো বা মন বলে কোন পদার্থই নেই। নইলে একবৃত্তি থেকে অন্যবৃত্তি গ্রহণে তার দ্বিধা জড়তা নেই, এক নারীর দেহ উপভোগ করবার সময় মনে মনে কামনা করে অন্যকে ; মিত্র শত্রুতে তার ভেদ নেই, সকলেই তার কাছে শাসন এবং শোষণের জীব।

তবে মনে হয় কন্দর্প আচাই তাকে জব্দ করতে পারেনি, খেয়েছে তারই ওই নওজোয়ান ছেলেটা। কে জানে চাকা কখন উপরে ওঠে, কখন নীচে নামে ; গতির এই-ই স্বাভাবিক নিয়ম।

সহজ ভাবেই এটা মেনে নিয়েছে কৃপাল সিং।

বাসন্তী মনের কথাটা একদিন মাধুরীকে বলে বসে। শূন্যজীবনে তার পূর্ণতার আজ ওই একমাত্র পথ। মানবকে সংসারী দেখে যেতে চায় সে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মানবের মনে কোথায় ভাঙ্গন ধরেছে। আগেকার মত নিবিড়ভাবে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে না নিজেকে ; তার আদর্শের মূলে কোথায় ফাটল ধরেছে। এই বিজ্ঞান, এ অর্থনৈতিক কাঠামোতে গড়া সমাজে মানুষকে বাস করতে গেলে—তাকেও নমনীয় হতে হবে।

বাবার দৃষ্টান্ত সে ভুলতে পারে না। মানব বলে,—যে আদর্শই সামনে থাকুক তার, সেটাকে নিবিড়ভাবে ধরে থাকলে ধ্বংস তার অনিবার্য।

মাধুরী জবাব দেয়—সেই আদর্শ যদি সত্যির উপর গড়া হয় ?

—তবুও আজ যেটা মনে হয় সত্য—কাল সেটা অবাস্তব। দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে রূপান্তর ঘটে ! এই বিবর্তনের ধারা। এযুগ দ্রুত বদলাচ্ছে।

মাধুরী ওর দিকে চেয়ে থাকে ; কোথায় যেন মানবের মনে একটা বঞ্চনা, ব্যর্থতা জমে আছে যাকে ভোলবার জন্যই মানব কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে নিজেকে। বলে ওঠে মাধুরী,

—কাজকে বড় করে দেখেননি আপনি ; কোন ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই কাজের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মাধুরী ওর মনের অতলের সেই খবর যেন জেনে ফেলেছে। টুনুবৌদি, দীপা এরা কোথায় মানবের অন্তরে গভীর আঘাত করে গেছে। মাধুরী অজান্তে সেই খানেই আঘাত দিয়ে বসেছে।

মানব চমকে ওঠে; মুহূর্তের জন্য বেদনাহত পাংশু হয়ে ওঠে ওর মুখ, চাহনিতে সেই অসহায় ভাব পরিস্ফুট। মাধুরীর কাছে তার এই দুর্বলতা নিষ্ঠুর সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। দীপা টুনুবৌদি—সকলেই তাকে নিদারুণ অবহেলা অবজ্ঞা করে গেছে।

চুপকরে পাইপ টানছে মানব, ওর কথার জবাব দিল না; আবছা অন্ধকারে পাইপের লাল আভা ওর মুখচোখে কি এক রহস্যঢাকা স্তব্ধতা এনেছে।

বাসন্তী ছেলের দিকে চেয়ে থাকে দূর থেকে।

তুমি দেখ বাছা, আমি তো ওকে আজও চিনতে পারিনি। ছেলেবেলা হতেই দূরে দূরে ছিল পড়ার জন্য; আজও সেই দূরেই রয়ে গেল সে।

মাধুরী বেশ বুঝতে পেরেছে মানবের মনে কোথায় ঝড় উঠেছে।

বেকার—ভবঘুরের ভিড় জমেছে কালীপুরে; বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে ট্রেনে-বাসে হেঁটে আসছে তারা চাকরির সন্ধানে। ক'জন তাদের চাকরি পেয়েছে কে জানে, তবু আসার বিরাম নেই। বিভিন্ন কোম্পানী—দেশী বিলাতী ভাটিয়া ফার্মে বাঙালীর নামের চলতি সব পদবীগুলোর লিস্টি আছে, মিলিয়ে দেখে, মিলে গেলেই জবাব আসে—নো ভেকেন্সী।

অনেকেই ফিরে যায়। দু'একজন পড়ে থাকে তবু আশায় ভর করে যদি কোন একটা সুরাহা হয়।

মাধুরী বাড়ী ফিরে দেখে বারান্দায় কে বসে আছে। রাস্তার আলোয় ঠিক চিনতে পারে না। মনে তখনও কি এক মিষ্টি সুর বাজছে—মানবের উদ্দাম মন কোথায় বাঁধনহারা হয়ে গেছে—কোথায় ধরা দিতে দিতে সে সরে যায়। আলোছায়ার লুকোচুরি। জীবনের জটিলতা বাড়ায় সঙ্গে সঙ্গেই মনের প্রকৃতিরই রূপান্তর ঘটেছে মানুষের।

—তুমি!

দাড়িগোঁফ ঢাকা মূর্তিটা এগিয়ে আসে, পোশাক-আশাক ছেঁড়া ময়লা—ক্যাম্বিসের জুতোটার গোড়ালি বসে গেছে পায়ের কাছে। চোখদুটো জল্ জল্ করছে।

—যাক চিনতে পেরেছো তাহলে!

অতীতের একটি দুঃস্বপ্ন। চমকে উঠেছে মাধুরী, মনের সব সুন্দর সুর মিলিয়ে যায়। কঠিন স্বরে বলে ওঠে—আবার কেন এসেছো?

—একটা চাকরির আশায়, শুনলাম এখানে মেলাই চাকরি পাওয়া যাচ্ছে।

মাধুরী একটু বিরক্তি ভরা সুরেই বলে ওঠে।

—একটা তো ছেড়েছো, আবার কেন?

কথা কইলো না নটেশ্বর ; ওর দিকে চেয়ে থাকে অপরাধীর মত দৃষ্টিতে। মাধুরী বলে ওঠে।

—এখানে না থেকে স্টেশনে ওয়েটিং রুমে থাকিলেই ভালো হত।

—থাকাটা অবশ্যি চলতো, কিন্তু এদিকের ব্যবস্থা!

হাত আর মুখের মধ্যে একটা ইসারা করে কঠিন সত্যটাকে প্রকাশ করে।

—খেয়ে দেয়ে চলে যাব [illegible]।

মাধুরী ভিতরে যাচ্ছে—হঠাৎ ওর ডাকে ফিরে চাইল। নটেশ্বর বলে ওঠে।

—যে ক'দিন থাকবো খেয়ে দেয়েই আবার চলে যাবো। তোমাকে বিরক্ত করবো না।

নির্লজ্জ লোকটার অপরিসীম দৈন্যে বিচলিত হয়েছে মাধুরী। বিপদে না পড়লে ও আসতো না। লোকটা ধরা গলায় বলে চলেছে।

—ওরা সবাই মরে গেল, একটি ছেলে মেয়ে পুতুলের মা—সবাই ; একফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি—পথ্যও না।

মাধুরী দাঁড়াল না ওর কাহিনী শুনতে। ভিতরে চলে গেল বারান্দায় বসে আছে সেই লোকটা। অন্ধকারে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

টেলিফোনটা বাজছে—হ্যালো!

মাধুরীর কাঠিন্য মুছে যায় মুখ থেকে। হাসিতে ভরে ওঠে সারা মুখ.

—যেতে বলছো।

মানবের মুখখানা ভেসে ওঠে মাধুরীর মনে। মনের ওর উষ্ণতা এসে স্পর্শ বুলিয়েছে মাধুরীকে।

—আচ্ছা বেশ। কিন্তু বেশী রাত অবধি থাকতে পারবো না। না—মশাই ; ভয় আমার নেই।

টেলিফোন নামিয়ে জানলার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে মাধুরী—একজোড়া চোখ ব্যাকুল বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। মাধুরীকে চাইতে দেখে সরে এল নটেশ্বর।

সারা এলাকা জুড়ে কার্ড পাঠান হয়েছে। বিভিন্ন অফিসস্টাফ; অফিসার সকলকেই। নোতুন গড়া ইন্‌স্টিটিউটের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। কলকাতা থেকে অভিনেত্রীরা আসছে—গাইয়েও দু'চারজন আসছে। হালফিল সিনেমা হাউস হয়েছে কালীপুরে—অন্য একটা গড়ে উঠেছে বনের ভিতর নোতুন গড়ে ওটা স্টীল টাউনে। তারই দৌলতে সিনেমাস্টার—আধুনিক নামকরা প্লেব্যাক গাইয়েদের দর বেড়েছে। তাদের দু'একজনও আসছে।

দীপা এই অনুষ্ঠানের অন্যতমা প্রধান কর্ত্রী। মিঃ রমণ পদাধিকার বলে সভাপতি। তিনিও আজ কোর্টের উপর একটা লাল হলদে ফিতের কুঁচি দিয়ে তৈরী মস্ত কি এক ফুল পরে থলথলে দেহ নিয়ে কৌচে কাত হয়ে পড়ে আছেন; স্তাবকের দল ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে কি যেন পরামর্শ নিয়ে আবার। মিঃ রমণ দীপাকে হাত নেড়ে কি নির্দেশ দিচ্ছেন।

শালবনের চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ মিলোয়নি। ইনিস্টিটিউটের সামনেই কয়েকটা দীর্ঘ শাল কেঁদ পলাশগাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে—অদূরেই শুরু হয়েছে জঙ্গল; লাল কাঁকরের রাস্তাটা ভরে উঠেছে গাড়ীর ভিড়ে। মহুয়া ফুলের সুবাস রাতের বাতাস আনমনা করে দিয়েছে।

মানব এদিকে বড একটা আসে না, মাসিক চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েই খালাস; আজ তাকে এখানে ডাঃ মাধুরী চ্যাটার্জির সঙ্গে আসতে দেখে অনেক অনেক মন্তব্য করে। ব্যারেজ ডিপার্টমেণ্টে রয়েছে বনের বাইরে নোতুন উনেরপ্রান্ত-সীমায়। ওদিকের সংবাদ বিশেষ এরা রাখে না; হঠাৎ দুজনকে দেখে তাই একটু গোপন কানাকানিও ওঠে।

মাধুরী সেটা বুঝতে গেরে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কানে আসে—বেশ মিলেছে ওরা।

স্টীল-কোক টাউনে নারী কর্মচারীর অভাব এখনও রয়েছে, দু'চারজন যারা এসেছে তাদের অনেকেই বিবাহিতা, নয়তো বাগ্‌দত্তা। সুযোগ সুবিধা বিশেষ কারো হয়নি; তাই হয়তো এই আপশোষ।

মাধুরী মনে মনে হাসে, মানব কি যেন ভাবছে।

—এসো মিঃ আচারিয়া। ভালোত?

নমস্কার স্যার। মিঃ রমণকে নমস্কার জানায় মানব।

সাহেব দরজার মুখ আগলে বসেছেন, যাতে সকলেরই সেলাম, নমস্কারটা পান।

হাউসটা ভরে উঠেছে। মানব চেয়ে দেখে।

—এ কোথায় এসেছি বলদিকি?

মাধুরী ওর কথায় মুখ তুলে চাইল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে; মানব বলে ওঠে—

—চারিদিকে দেখো মাদ্রাজী-গুজরাটী-পাঞ্জাবী ইত্যাদিই বেশী; বাংলায় আছি না অন্য কোথাও আছি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কথাটা ঠিকই। বাংলার বুকে গড়ে উঠছে এই স্টীল টাউন, কোকওভেন, ব্যারেজ, ইলেকট্রিক স্টেশন, কিন্তু পদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে নীচে পর্যন্ত খোঁজ করলে দেখা যাবে—বাঙালী আজ জীবনের সকল অন্যায় থেকে নির্বাসন

ভাবে বিতাড়িত হয়েছে। যে কয়জন টিকে আছে, তাদের জীবনও সুস্থ সুন্দর নয়। ওদিকে শেড ফোরম্যান মিঃ দত্তের স্ত্রীর সঙ্গে গুজরাটী ঠিকাদার মিঃ প্যারেখ হেসে গল্প করছে হাত-পা নেড়ে।

রূপের হাট বসেছে। স্টীল টাউনে আগামী জীবনের পরিচয় এর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। বাংলার মাটিই সরস সবুজ নয়—বাংলার সবদিকেই ওদের উদগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি—লালসাভরা সে চাহনি।

নীতিবাদের আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকলে এই যান্ত্রিক যুগে মানুষ বাঁচতে পারে না; মেসিন হয়ে যাবে। তাই এই কামনার জোয়ার তুলে জীবনীশক্তির অপচয় বন্ধ করতে চায় তারই, বেঁচে আছি এই বাটাই জানাতে চায়।

এ সমাজকে চেনে মানব— আজ মনে পড়ে একজনকে। জীবনের সময় রূপ ঐশ্বর্য যারা মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দেয় পথের দুপাশে তাদের একজনকে সে চিনেছিল। পুই দামী শাড়ীপরা—নির্লজ্জ রূপের প্রকাশকে সভ্যতার অঙ্গ বলে মেনে নিয়ে এই সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো সে।

মানবের রক্তে রয়েছে আদিম-মাটির স্পর্শ; তার বংশপরিচয়ে এমন তকমা নেই; মাধুবীও গ্রাম্য পরিবেশেই মানুষ, সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেই তার যৌবন কেটে গেছে! এই মধুময় জীবনের প্রাচুর্যের স্পর্শ সে কখনও পায়নি।

…সুর ভেসে ওঠে, স্বচ্ছ-নীল আলো জ্বলছে মঞ্চে।

মনে হ'ল যেন পেরিয়ে এলাম
অন্তবিহীন পথ।

চমকে উঠে মানব। অতি-পরিচিত আপন করা সেই কণ্ঠ।

দীপা! ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না মানব, দীপা কেন এখানে আসবে! প্রোগ্রামেও ওই নাম রয়েছে।

কেমন যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সে।

অতীতের কয়েকটি সম্ভাবনাময় আশার আলো ঝলমল যৌবনের দিন!… ওই গান একান্তে গাইতো দীপা তাকেই শোনাবার জন্য; স্কটল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পর সেই প্রথম রাত্রির স্বপ্ন আজও ব্যাকুল করে তোলে মানবকে।

মনে হয় জীবনের শূন্যতার কারণ সে খুঁজে পেয়েছিল; মন থেকে যাকে ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নোতুন জীবন গড়বার চেষ্টা করেছিল, অবচেতন মনের সমস্তটুকু জুড়ে সেই-ই এতদিন তার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

—পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যুথীর মালা;
সকরুণ নিবেদনের গন্ধঢালা।

…অন্তরালের কয়েকটি দীর্ঘ বৎসরের ব্যবধানে কোন অধরার মনেও সেই ঝড় উঠেছে। তারই প্রকাশ ওই সুরের আকুতিতে। দূরের দীপার দিকে চেয়ে থাকে —আরও সুন্দর, আরও যৌবনমদির হয়ে উঠেছে। মানব নিজেকে যেন ভুলে গেছে। হাততালির শব্দে চমক ভাঙ্গে তার। মাধুরী মানবের দিকে চেয়ে ছিল; ওর চোখমুখের ওই পরিবর্তন নজর এড়ায় না তার! কি যেন অন্তরের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মানবের গম্ভীর মুখ।

—কোথা যাচ্ছেন?

—একটু বাইরে থেকে আসি।

কয়েক মিনিটের জন্য বের হয়ে এল মানব। সটান গ্রীনরুমের দিকে এগিয়ে চলেছে। মিঃ রমণ ভিতরে একটা কোচে পড়ে আছেন—কুতকুতে চোখমুখ হাসির আভায় ঢেকে গেছে।

—গ্রাণ্ড। কনগ্রাচুলেশনস্।

দীপাকে হ্যাণ্ডশেক্ করছেন মিঃ রমণ। হাসিতে ফেটে পড়ে দীপা, ছোট্ট খুকীর মত বলে ওঠে।

—মাগো, কি বিশ্রী হারমোনিয়ামটা; দুটো স্কেল বাজেই না।

—আগে বলনি কেন? একটা নোতুন হারমোনিয়াম আনা হবে এইবার।

হঠাৎ কাকে দেখে চমকে ওঠে দীপা।

এখানে মানবকে দেখবে ঠিক আশা করেনি। চোখের সামনে ভেসে উঠে অতীতের কথাগুলো; মানবকে নিজেই দূরে ঠেলে দিয়েছে সে, আজ আলেয়ার মোহস্বপ্ন সে দেখে না। একরকম এড়িয়েই গেল দৃপ্ত ভঙ্গীতে। চিফের সামনে বলে ওঠে—দেখি, ভিতরে নেক্স্ট সিন অ্যারেঞ্জ করতে হবে।

—ও ইয়েস। অব কোর্স—গো।

মিঃ রমণের পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেল দীপা, মানবকে যেন দেখেও দেখল না সে। চিফের ভুঁড়িটা ঠেলে উঠেছে।

—হাও ডু ইউ লাইফ হার সং আচারিয়া?

মিঃ রমণের প্রশ্নে জবাব দেয় মানব—ভেরি নাইস।

বের হয়ে এল নীরবে। দীপার এই অবহেলা আজ তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

…মাধুরী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মানবের দিকে। কোথায় যেন কি একটা ঘটে গেছে তার মনে।

—চল বাড়ী ফেরা যাক।

—বেশ গাইলেন কিন্তু ভদ্রমহিলা। শেষ অবধি থাকবেন না?

—না! চল, শরীরটা ভাল লাগছে না।

মাধুরীও বের হয়ে এল অগত্যা। নীরবে গাড়ীতে উঠে বসে মানব; হাসি খুশি কথাবার্তা তার স্তব্ধ হয়ে গেছে। কি যেন ভাবছে সে, রাতের বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ তুলেছে; ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটেছে গাড়ীখানা, কোথাও তাড়া খেয়ে যেন পালাচ্ছে তারা।

বাতাসে মহুয়া ফুলের সৌরভ; বনে ডাকছে ফিকে জোৎস্নায় রাতজাগা পাখী, পলাশের রক্তরংএর ফুলগুলো ছিটিয়ে রয়েছে অ্যাসফাল্টের কালো রাস্তায়; কার অন্তরের ব্যথায় রঙ্গীন হয়ে উঠেছে সারা পথ।

—হঠাৎ কি হল আপনার? মাধুরী প্রশ্ন করে।

—কিছু না।

ছোট্ট জবাব দিয়ে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাঁহাতী পথ ধরে রেল ব্রিজ পার হয়ে তারা ব্যারেজ কলোনীতে ঢুকলো।

নিস্তব্ধ পুরী, জনমানব কেউ জেগে নেই।

মাধুরী আবার ফিরে এল সেই দৈনন্দিন পরিবেশে—মনের সব সুর ছেড়ে গেছে তার। আবার সেই গম্ভীর ডাক্তারটি জেগে উঠেছে চিরন্তন নারীর খোলস ভেদ করে।

বারান্দার এদিক ওদিক চেয়েও নটেশ্বরকে দেখতে পায় না। খেয়ে দেয়েই চলে গেছে সে কোথায় রাত্রিটুকু কটাবার সন্ধানে।

একটি মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। লোকটার করুণ চাহনি ভেসে ওঠে। ঝি দরজা খুলতে খুলতে বলে।

—খেয়ে দেয়েই বাবু চলে গেলো। কি যেন কাজ আছে।

মাধুরী জবাব দিল না। নিজের ঘরে ঢুকে কাপড়-চোপড় ছাড়তে থাকে।

মানব তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে নিজের বাংলোর দিকে। মানবকে আজ কেমন আনমনা দেখে সেও বিস্মিত হয়েছে।

…দীপার প্রতাপ এখন অপরিসীম। মিঃ রমণের নিজের আপিসে বদলি হয়ে এসেছে। কলোনীর সকলেই সমীহ করে; সকাল বেলাতেই ওর বাতাসে এসে হাজির হয় ঝকঝকে নোতুন স্টাফকার; কোন কোন দিন বা আসে মিঃ রমণের নোতুন প্লিমাউথখানা; হালকা খুশির আভায় উপছে পড়া পেয়ালার মত ডগবগ করছে দীপা।

ওপাশেই মিঃ নায়ারের বাংলো; ওর স্ত্রী সাবেকী মানুষ; কাছা দিয়ে রঙ্গীন শাড়ী পরে অথা নায়ার চেয়ে থাকে দীপার উছল দেহের দিকে, হিংসায় ফেটে পড়ে মনে মনে। সাধে কি আর ওর বাসাতেই মিঃ নায়ার চা

খেতে যান মাঝে মাঝে।

দীপার মাও এসেছেন এইখানেই। মনুও চাকরি পেয়েছে অ্যাকাউন্ট্‌স্‌ ডিপার্টমেন্টে, দীপাই ব্যবস্থা করেছে সবকিছু। কলকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়ে বাইরেই এসেছে তারা। দীপার মায়ের এই জীবন বিষময় ঠেকে। স্বামীর প্রচুর অর্থ দেখেছিলেন তিনি, কর্তৃত্বের অধিকার তাঁর ছিল। দুখানা গাড়ী, বাড়ী, বেয়ারা নিয়ে সংসার করেছেন তিনি। দীপায় দোগ্যতার চেয়ে অনেক পেয়েছে দীপা সত্যি, তবু এ পাওয়ার মূলে কোথায় কি একটা রহস্য রয়েছে? মাঝে মাঝে এই জীবনে ঘৃণা ধরে যায় তাঁর।

—এতরাত্রি অবধি থাকিস কোথায়? মায়ের প্রশ্নে দীপা মুখ তুলে চাইল। দামী শাড়ীখানা কোমরে যেন থাকতে চাইছে না, পিঠেব উপর থেকে খসে পড়ে বারবার—যেন উদগ্র যৌবন প্রকাশ করবার জন্যই এই সাজসজ্জা, কটকী ব্লাউজটা নিটোল সুন্দব হাতেব উপব চেপে বসে কি এক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, একরাশ চুল ছিল সেগুলোকে কেটে নিশ্চিহ্ন করে—বব হেযার করেছে আজকালকার ফ্যাশন মত। কলকাতায থাকতেও এত কেতাদুরস্ত ছিল না দীপা, জঙ্গলের মধ্যে এই নব্য শহরের কুশ্রী কালচার বনেদী কলকাতার বহুকালের গড়ে ওঠা সভ্যতাকে উৎকটতায় হাব মানিযেছে, ব্লাউজটার নীচেব দিকে চাওয়া যায় না, নরম সুগৌর পেটের অনেকখানি অনাবৃত—যৌবনের কি এক নির্লজ্জ প্রকাশ।

মায়ের সন্ধানী দৃষ্টির দিকে চেয়ে দীপা হাসবার চেষ্টা করে।

—কেন বলোত? আপিসের কাজ তারপর ইনিস্টিটিউট সেরে ফিরতে দেরী হয়ে যায়। আমাকে আবার কালচারাল সেক্রেটারী করেছে ওরা।

—কে জানে বাছা, এমনি শরীরের উপর অত্যাচার করলে, শরীর টিকবে ক'দিন?

মনু মায়ের কথায় ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। দিদির দিকে চেয়ে থাকে। মনুও কিছু কিছু শোনে তার ডিপার্টমেন্টে, দিদির কথা। সেদিন দত্ত, মিঃ দাস বলাবলি করছিল—মক্ষিরাণী হে, খাস বড়সাহেবের পেয়ারের পি-এ একদণ্ডও চোখের বাইরে রাখতে চান না।

—বুড়ো বয়সে একখানা জুটেছে, গুছিয়ে নিলে যা হোক মেয়েটাও।

হঠাৎ ওকে দেখে চুপ গেল তারা; সহকর্মীদের মধ্যেও আলোচনা হয়, নানা সরস আলোচনা দীপাকে কেন্দ্র করে। মনুও শুনেছে সেদিন দত্তের মুখেই।

—রাত্রি ৯টার সময় দেখছি সাহেব মেম দুজনে গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছেন

আসানসোলের দিকে ; মেমসাহেবই চালাচ্ছেন গাড়ী !

মনু ইঙ্গিতটা বোঝে—দীপা ইদানিং মেমসাহেব নামেই পরিচিত।

মনুও সেরাত্রে বাড়ী ফিরে দেখে ছিল, কথাটা সত্যি দিদি তখনও ফেরেনি ; বাইরে তার উঁচু মাথা যেন নীচু হয়ে আসছে ; এখানের সহকর্মী বন্ধুদের মাঝেও তাকে অনেকে এড়াবার চেষ্টা করে ; ইউনিয়নেও তাকে এড়িয়ে চলে অনেকে। অফিস বেয়ারা ইলেকশনে কে যেন প্রস্তাব করেছিল ওর নাম, কিন্তু অনেকেই বাধা দেয়।

—ওঁর নানা কাজ ;

মনুও আপত্তি করেছিল ; পরে টের পায় তার সহকর্মীদের অনেকেই আড়ালে এ নিয়ে আলোচনা করেছে। একবাক্যে স্বীকার করেছে তারা, মনু দালাল। কর্তৃপক্ষের চর।

বড়সাহেব মেজসাহেব ইত্যাদি মাঝে মাঝে তাদের বাংলোয় যায়—সুতরাং তাকে ইউনিয়নে রাখা নিরাপদ নয়। খবর বের হয়ে যাবে নির্ঘাৎ।

তিলে তিলে মনুর মনে জমেছে একটা গ্লানি। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে পারেনি ! বেধেছে তার। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে পারেনি। দীপার জন্য গাড়ী আসে ; দীপাই বলে—চল না, এই রোদে সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে দুটো চড়াই বন পার হয়ে যাবি কেন—তোকে নামিয়ে দোব আপিসে।

—না, সাইকেলই ভালো আমার।

এ গাড়ীতে উঠতে চায় না মনু। দীপা কথা বলে না, ওর দিকে চেয়ে থাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে ; কি যেন ভাবছে মনু। ওর ভাবনার কিছুটা অনুমান করতে পারে দীপা। আজ মাকে ওই কথা বলতে দেখে খুশীই হয়েছে মনু। কিন্তু দীপা এসব গায়ে মাখে না। সহজ ভাবেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মা চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। সরে এল মনুও।

এমনি করে তিলে তিলে ওর ছোট্ট সংসারেও বিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠছে। দীপা বিনা বাধায় এগিয়ে চলেছে নিজের পথে। ওর জীবনে আজ খ্যাতি প্রতিপত্তিই বড়। এই জীবনই সে চেয়েছিল।

তারই জন্যই মানবের বাঁধন মানতে রাজী হয়নি ; স্তাবকতার গুঞ্জন আজ ধ্বনিত হয় তার চারিপাশে।

ডি. ও., ডেপুটি ডি. ও., ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকেই আসে তার আপিসে, —সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কার সামান্য সুবিধা দরকার, কেউ কনট্রাকটারকে কিছু পাইয়ে দিতে চায়, কেউ বা চাকরির সুপারিশ নিয়ে আসে চিফের দরবারে। নানা আবেদন নিয়ে তারা আসে এইখানেই। দীপা এইখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

দরজা আগলে এয়ারকনডিশনড্ রুমে বসে আছে তাঁর পি. এ.—দীপা ব্যানার্জি ঝকঝকে টেবিলে ডিকটোফোন ; কয়েকটা রং-বেরংএর ফোন—এটা সেটা অহরহ বাজছে। ওদিকে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক টাইপ করছেন ; দিনের আলোকে বাইরে রেখে ফ্লোরেসেণ্ট আলোর ম্লান আভায় ঘরখানা ভরে উঠেছে। আশেপাশের চেয়ারে বসে দর্শনপ্রার্থীর দল। বেয়ারা দীপার হাত থেকে স্লিপ নিয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। নীরবতা ভেদ করে মাঝে মাঝে বেজে ওঠে কট্ কট্ কট্ 'বাজার' টা, লাল বাল্বটা জ্বলছে। শাড়ীখানা পিঠের পাশে একটু মাত্র টেনে নিয়ে পুরু কার্পেটপাতা মেজেয় নিঃশব্দপায়ে এগিয়ে গিয়ে ভারী দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকলো দীপা।

এ রাজ্যের যেন সাম্রাজ্ঞী।

এর চেয়ে মানব কি তাকে বেশী সম্মান দিতে পারতো ? সেই রাত্রে দেখা না করে ভালোই করেছে দীপা ; নিজের দুর্বলতাকে চেপে অন্ধ খ্যাতির মোহে এগিয়ে চলেছে।

মাঝে মাঝে বের হয় দুজনে বেড়াতে। রাত্রি নামে—নির্জনপথে গাড়ীটা ফেরে তাদের এলাকায়। শনশন হাওয়া ওঠে শালবনে, তারা জ্বলে আকাশে।

মিঃ রমণ গাড়ীর সিটে কাত হয়ে পড়ে আছে, মুখ দিয়ে বের হচ্ছে ভুর-ভুরে গন্ধ; ইউরোপীয়ান ক্লাব আজ নাম বদলে দিশী সাহেবের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মদের বারে জমে দিশী-বিলাতী কয়লাকুঠি—বার্ণপুর—কুলটির কারখানার সাহেবদের ভিড়। মদের ফোয়ারা ছোটে, বলনাচের কুৎসিত অনুকরণও হয় মাঝে মাঝে। মিঃ রমণ লাফঝাঁপ করতে পারে না, টেবিলে বসে এক মনে সিপ্ দেয় গ্লাসে ; পাঁড় মাতাল। চুরচুরে না হলে আমেজ আসে না।

—স্যার !

দীপার ডাকে চমক ভাঙ্গলো ; লাল করমচার মত চোখ মেলে হাসবার চেষ্টা করে এবং সহজ ভাবেই বলে।

—আই অ্যাম অলরাইট ডিয়ারি।

আবার নিজের পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে এগিয়ে দেয় দীপার দিকে।

—নো, থ্যাঙ্কস্।

রাত হয়ে আসছে ; নির্জন পথ দিয়ে আসছে গাড়ীখানা ; মিঃ রমণের থলথলে হাত দুটো দীপার কোমরে চেপে বসেছে, নেশার ঘোরে কাত হয়ে পড়েছেন সাহেব। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে দীপা ; হঠাৎ ওদের গাড়ীর হেডলাইটে সামনের গাড়ীখানা এক ঝলক উলসে পড়ে, মানব একাই ফিরছে ব্যারেজের দিকে ;

আলোর ঝলকানিতে এদের দেখতে পায়না; দীপা চমকে উঠে নিজেকে ওই নেশাতুর লোকটার বাঁধন থেকে মুক্ত করে নেয়।

একটি মুহূর্ত! গাড়ীখানা বের হয়ে গেল। কি যেন একটা কাণ্ড ঘটেছে—তার মানে। মিঃ রমণ নেশার ঘোরেই আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে তাকে; বিজাতীয় ঘৃণায় রি রি করছে দীপার দেহমন।

বাড়ীতে মা তখনও জেগে আছে। দীপার উৎকট প্রসাধনের দিকে চেয়ে আছে মা; মন্নও একবার উঠে আলো জ্বেলে বাথরুম যাবার নাম করে বারান্দা দিয়ে চলে গেল। দীপার সারা গায়ে বের হচ্ছে তীব্র ফরাসী সেন্টের গন্ধ, কাপড়-চোপড় ভাঁজে কুঁচকে উঠেছে।

—এত দেরী হল?

—শহরে যেতে হয়েছিল একটু কাজে।

মা কথা কইল না, মেয়ের আপাদমস্তক সে কি যেন সন্ধান করছে। একটু চুপ করে থেকে নিস্পৃহ নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে।

—যা, হাতমুখ ধুয়ে স্নান করে নে।

দীপা চলে গেল। কি যেন অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মা; জীবনের অতীতের প্রাচুর্য সম্মানভরা দিনগুলো আজ যেন নীরব ভাষায় ব্যঙ্গ করছে তাকে, নিষ্ঠুর এ ব্যঙ্গ! অসহায় কান্নায় চোখ ফেটে জল আসে।

শান্ত অতীত ঘরজ্বালানো সর্বনাসের আগুনের আভায় রঙ্গীন বর্তমানকে দেখে শিউরে উঠেছে। ভয়ে হতাশায় তাই মা কাঁদে।

—মন্ন!

মাকে কাঁদতে দেখে এগিয়ে আসছিল সে; মা তাকে দেখে চোখের জল চাপবার চেষ্টা করে বলে ওঠে।

—যা রাত অনেক হয়েছে শুয়ে পড়গে। কাল আবার সকালেই অফিস বেরুতে হবে।

আজ স্বামীর কথা মনে পড়ে—চোখ ফেটে জল আসে নির্মম হতাশায়। সব সুর তার ছিঁড়ে গেছে।

মা-ও তার কাছে এই অসহায় বেদনা লুকোতে চায়। মা-ছেলে কেউ প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ করতে পারে না, দুজনেরই মনে পুঞ্জীভূত লজ্জার কালো ছায়া জমে ওঠে।

মাধুরী চলতে চলতে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরেই দেখে নটেশ্বর খেতে বসেছে একটা কলাইকরা থালায় ভাত আর সামান্য কি

তরকারী, ডাল একটু আছে কি নেই। থমকে দাঁড়াল মাধুরী।

নটেশ্বর জবাব দেয়—না না, কোন অসুবিধা আমার হয়নি।

—থাম তুমি। ওকে থামিয়ে দিয়ে ঝিকে ডাকল।

নটেশ্বর একটু ঘাবড়ে গেছে, মাথার চুলগুলো এলোমেলো—ধুলোর আবছা দাগ, কাপড়চোপড় আরও কদর্য হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁরে বাসির মা, এই দিয়ে কেউ খেতে পারে? আর কোন তরকারী মাছ নেই?

—দিই দিদিমণি; বললাম ওকে তা উ কি লিবেক?

নটেশ্বরের চোখ দুটো ফিকে হয়ে ওঠে—তোমাকে আবার শশব্যস্ত হতে হবে না। ঝি মাছ দিয়ে গেছে, পরম তৃপ্তি ভরে খাচ্ছে নটেশ্বর, মাধুরী ওর দিকে চেয়ে থাকে যেমন দুঃখও হয়—সমবেদনাও ওর ভাগ্যে।

মাধুরী বলে ওঠে—দুটো জামাকাপড় করিয়ে নাও, নইলে ওই পোশাকে কেউ কাজ দেবে না—পাগল বলে তাড়িয়ে দেবে?

নটেশ্বর লজ্জায় মাথা নামাল দারিদ্র্যের করাল ছায়া ওর সারা মুখে চোখে ফুটে ওঠে! ওই অভিজ্ঞতা বোধহয় ইতিপূর্বেই তার হয়েছে।

…মানব সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকে; ভুলে থাকতে চায় সব কিছু। দীপাকে দেখেছে আজও তেমনি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে সে বর্ষার দামোদরের মত—দুকূল ভাসানো রূপ, তেমনি উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল। চোখে মুখে ধ্বংসের ছায়া। অবহেলা করে গেছে তাকে।

টুনুবৌদি সেই চিঠির জবাব দিয়েছিল—একদিন তোমার ও ভুল ভাঙ্গবে মানব—অন্যায় আমি করিনি।

সরে গেছে বৌদি—দীপাও। মাধুরীকে আজ নিবিড় করে পেতে চায়। টুনুবৌদির কথা বলেছে মাধুরীকে। কোন জবাব দেয়নি মাধুরী।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মানব বসে আছে, মিশকালো আকাশে ফুটে উঠেছে দু'চারটে ছিটিয়ে পড়া তারাফুল—নদীর দিক থেকে ভেসে আসছে কালিতাতা বাতাস, মানব মাধুরীর দিকে চেয়ে আছে, কালো কালো রং টিকলো নাক চোখমুখে বুদ্ধির দীপ্তি, নিটোল পূর্ণতা ঘিরে রয়েছে ওকে!

টুনুবৌদিকে ক্ষমা করতে পারিনি মাধুরী, ও যদি সুহৃদার কাছে বোম্বাইএ ফিরে যেতো দুঃখ করতাম না।

—সেখানে গিয়ে মেমসাহেবের হুকুম মেনে থাকতে পারতেন না—তাই নিজের ব্যবস্থাই করে নিয়েছেন। মেয়েরা ঘর বাঁধবার জন্ত স্বামী চায়!

মানব জবাব দিল না, ওর হাতখানা মানবের হাতে; নরম একগাদা যুঁই ফুল মত স্পর্শ। চোখের কোলে আবছা আভা।

—মাধুরী!

সব স্তব্ধ হয়ে গেছে—মানবের ডাকে শিউরে ওঠে মাধুরী। সারা মনে ঝড় বইছে—সব বাঁধন-সংস্কার হারাবার ঝড়। জীবনের অতীত দিনেও অমনি করে ডেকে ফিরে গেছে। আজও ফিরে ফিরে আসে সেই চাওয়া—সেই আকুল করা ডাক। হাজারোও কাজের মধ্যে মানুষ যে নিঃশেষে মরে যায়নি এ সেই চিরন্তন প্রাণের স্পন্দন ভরা অনুভূতি।

চমকে ওঠে মাধুরী! মানব নিবিড়ভাবে তাকে কাছে টেনে নেয়; উষ্ণ বহু প্রতীক্ষিত সেই স্পর্শ। মাধুরীও নিঃস্বজীবনে একটু পূর্ণতা কি চায় নি!

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কে এগিয়ে আসছে এইদিকে। নিজেকে সামলে নিয়ে সরে বসলো মাধুরী, চোখমুখে কণ্ঠস্বরে সেই উত্তেজনা; মানব উঠে দাঁড়াল।

এগিয়ে আসছিল নটেশ্বর। হঠাৎ সেও মানবকে দেখে দাঁড়িয়েছে। কি ভেবে ওদিক পানে চলে গেল। মাধুরী চমকে ওঠে। কি যেন লজ্জায় ছেয়ে যায় তার দেহমন।

সন্ধ্যার স্তব্ধতা আর আঁধার নেমেছে। ক্ষণিকের জন্য কোন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল তারা।

মানব আর মাধুরী।

নিজের মনের এই দৈন্যতায় বিস্মিত হয়েছে মাধুরী।

মানব চলে গেছে একাই চুপ করে বসে আছে মাধুরী। ঘরের একফালি আলো এসে পড়েছে বারান্দায়।

—আসবো?

নটেশ্বর এগিয়ে এসে জামা-কাপড়গুলো বের করে প্যাকেট থেকে। দেখিয়ে বলে ওঠে।

—নোতুন কিনলাম, তিন টাকা ফেরৎ এসেছে।

টাকাটা বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে; মাধুরী ওর দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে, ওর চোখে কোথায় যেন বেদনার গভীর ছাপ ফুটে ওঠে।

—টাকা রাখ তোমার কাছে। কাজের কিছু হ'ল?

—চেষ্টা করছি। কালও যেতে বলেছে একজন। কাজ ঠিক হলেই চলে যাবো। তোমার অসুবিধা করতে চাই না।

মাধুরীর মুখে একটা যেন চড় কসেছে কেউ। ওর দিকে চেয়ে বলে ওঠে

মাধুরী।

—যে ক'দিন কোন ঠাঁই না জোটে, বাইরের ওই ঘরখানাতেই থাকবে।

আনন্দের আভা ফুটে ওঠে নটেশ্বরের মুখে—ভালোই হল। স্টেশনে যা মশা - শোয় কার সাধ্যি। আর কাঠের বেঞ্চিতে তেমনি ছারপোকা।

নটেশ্বর নোতুন ঘরের সন্ধানে বাগানের ওদিকে চলে গেল, মাধুরী একা কি ভাবছে। একটা গ্লানি তার মন ছেয়ে আসছে।

·· প্রাণসম্পদে ভরপুর—বেপরোয়া ওই নটেশ্বর, আজ জীবন ওর কাছ থেকে সমস্ত শক্তিটুকু নিংড়ে বের করে নিয়ে ছোবড়ার মত দূরে ছুড়ে ফেলেছে ওকে।

স্তব্ধ সুপ্ত উপনিবেশ, কাজ হচ্ছে ব্যারেজে! থার্মলপ্ল্যাণ্ট কনস্ট্রাকশন চলেছে। একটা সদজাগ্রত চেতনার মত মানবের গাড়ীখানা আঁধার ফেড়ে জ্বলন্ত চোখ মেলে চলেছে 'ড্যামসাইটের' দিকে—জেগে আছে মানব।

মানুষের চেষ্টার বাহ্যিক প্রকৃতির অনেক কিছুই ওলট-পালট ঘটেছে কিন্তু প্রকৃতির মূল সূত্রে সে কোথাও হাত দিতে পারেনি ; গাছের ফুল আজও ফোটে—কঠিন মাটির বুকে বৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে আজও তৃণাঙ্কুর জন্মে ওঠে ; ভুল করেও পশ্চিম দিকে সূর্য কোনদিনই ওঠে না ; প্রতিটি দোলন পথ নির্দিষ্ট ; বেড়ে ওঠে ক্রমশঃ একটা পরিমিতিতে এসে আবার ক্রমনিম্ন হয়ে যায় তার গতি। মনের মধ্যে সেই বেঁচে থাকার ভালোবাসার সহজাত প্রকৃতিটাও তেমনি বিজ্ঞানের প্রহরা এড়িয়ে বেঁচে আছে।

তাই বাঁচতে চায় মানব। মাধুরীকে ভালোবাসে। এর মধ্যে দুর্বলতার কি আছে জানেনা। তারা সুখী হতে চায়।

...দীপা থমকে দাঁড়িয়েছে, কালীপুর স্টিল প্রোজেক্টের মিস্ দীপা ব্যানার্জি হঠাৎ চলতে চলতে হোঁচট খেয়েছে প্রচণ্ড ভাবে। সারা মন মুষড়ে পড়েছে তারই আঘাতে আর প্রতিঘাতে। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত রূপ পালটে গেছে তার চোখের উপর। বিশ্বাসই করতে পারেনি এই পরিণতিতে।

মিঃ রমণ সেদিন ওর কথাগুলো শুনে স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন দীপার দিকে ; নিবিড় ঘৃণা কাঠোর কাঠিন্য ফুটে ওঠে তাঁর কুতেকুতে শ্বাপদ-হিংসাভরা দুটো চোখে, পুঞ্জীভূত অবিশ্বাসের ছায়া মাখানো সেই দৃষ্টি।

—নেভার। ইউ ড্যাম লায়ার ; ডোণ্টো বি সিলি—

রাগের চোটে ইংরেজী ভাষাতেও মাতৃভাষার টান এসে যায়।

মেদবহুল থলথলে দেহখানা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। দীপা অবাক হয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনে চিরন্তন সত্য নিষ্ঠুর বিপদ এসে দাঁড়িয়েছে। কোন রক্তবীজের অস্তিত্বে শিউরে উঠেছে দীপা। হাহাকারে মন ভরে ওঠে। যেন আর্তনাদ করছে।

—স্যাব। প্লিজ।

—অসহায়—নিতান্ত-নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে। দীপার উঁচু মাথা নেমে গেছে—চোখে তার জল।

—আমি! হাসছেন হাঃ হাঃ করে চিফ্।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করলেন একখানা রেক্সিনে বাঁধানো যত ডায়েরী বই। মোটা মোটা থ্যাবড়া আঙ্গুল দিয়ে উল্টে পাল্টে কয়েকখানা পাতার পর একটা পাতায় এসে থামলেন:

—হিয়ার ইউ আর।

দীপার দিকে বাড়িয়ে দেন খোলা পৃষ্ঠাটা। চমকে ওঠে দীপা; তার চাল-চলন—কবে কার সঙ্গে দেখা করেছে, কে গেছে তার বাড়ীতে, তাদের অ্যারাই-ভ্যাল, ডিপারচার, সময়—সমস্তই নিখুঁত ভাবে লেখা আছে, কবে মিঃ পাবেথের সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল, কবে কোক ওভেনের মিঃ বসু তাকে আসানসোল নিয়ে যান, কবে কে তাকে লিফ্ট্ দিয়েছিল অপিস পর্যন্ত, আরও কত খুঁটিনাটি ব্যাপার। রীতিমত স্পাই রেখেছিল যেন তার উপর।

দীপা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সাহেব ওকে কোণঠাসা করে বীরদর্পে বলে ওঠে।

—নাও ইউ সি মাই গার্ল, টেল মি হু ইজ দ্যাট ম্যান—দ্যাট পার্টিকুলার লাকি ম্যান্।

বিশ্রী কদর্য ইঙ্গিতে ওর দিকে চেয়ে হাসছেন কুতকুতে চোখ মেলে।

দীপাকে কি সম্মানের চোখে দেখে এসেছে এতদিন ওই পিটপিটে শয়তান আজ দীপা তা বুঝতে পারে। কোনদিনই তাকে উঁচু নজরে দেখেনি, দেখেছে সামান্য একটি মেয়ে হিসাবেই, ফাউ-হিসাবে পেতে চেয়েছে তার যৌবন-সম্ভার। লুট করেছে নিজে—দেউলিয়া আর অপমানিত করেছে তাকে নিষ্ঠুরভাবে।

নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব চেয়েছিল দীপা, চেয়েছিল কর্তৃত্ব করতে; সেই সামান্য পাওয়ার বিনিময়ে যে বিকিয়ে দিয়েছে তার আত্মসম্মান, নারীত্বের মানমর্যাদা। আজ অনুভব করে যে সভ্যতার বড়াই করেছিল, যার জন্য মানবকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাকে নিঃশেষে গ্রহণ করে আত্মবিলুপ্ত প্রাণসম্মানহীন জড় যন্ত্রে সে আজও পরিণত হতে পারে নি। সেই দীপা সব হারাবার চরম মুহূর্তের

মুখোমুখি এসে ভেঙ্গে পড়েছে। তার চোখের সামনে এই সভ্যতার অমানুষিকরূপ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

যে গাড়ী গতিবেগে মানুষকে নোতুনের দিকে নিয়ে যায়—সেই কালের রথচক্রনিষ্পেষণে আজ দলিত পিষ্ট হতে চলেছে দীপা? সাহেব যেন ব্যঙ্গ করে বলে চলেছে।

—আই শ্যাল ট্রাই টু গেট ইউ আউট অব দিস্ টাইট কর্ণার!. ইফ ইউ উইশ্।

কথাটা জানাজানি হলে বিপদ—চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কড়া লোক, তাঁর কানে উঠলে একটা কেলেঙ্কারী ঘটবে। তাই সাবধান হতে চায় চতুর লোকটা। অতিরিক্ত কণ্ঠে মিঃ রমণ অভয় দেন, তাকে এই দুরপনের কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার আশ্বাস তিনি দিচ্ছেন। দীপা টলতে বের হয়ে আসে।

সাহেব অন্য সময় গাড়ীর জন্য হাঁক-ডাক করতেন, আজ আর সেসব হয়ে উঠল না, কি যেন ভাবছেন। দীপা চুপ করে বের হয়ে পথে নামল।

—সেলাম মেমসাব।

বয় বেয়ারা সকলেই ওকে সেলাম দেয়; মাথা উঁচু করে সেই সেলাম গ্রহণ করতে আজ সম্মানে বাধে দীপার; ফানুসের মত আকাশে উঠেছিল সে—কিন্তু অন্তঃসারশূন্য সেই অস্তিত্ব এতদিন তা বোঝেনি; আজ এই সভ্যতার বিকৃত রূপ তার চোখের সামনে বদলে গেছে।

লাল মাটিতে আগুনজ্বালা রোদ কাঁপছে হাজারো বিসর্পিল রেখায়, কুমারী অরণ্যের সবুজ শুচিতাকে এরা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তারগুলোর দুপুরের বাতাস ঝন্‌ঝন্ সুরে আর্তনাদ তুলেছে। দুপাশের বাংলোর কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে অনেক কৌতূহলী দৃষ্টি যেন তার দিকে চেয়ে রয়েছে, আজও হিংসা করে ওরা দীপার সৌভাগ্যকে কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় যদি জানতে পারে ওরা—ঘৃণা অনুকম্পায় ভরে উঠবে ওদের মন।

—এই দুপুরেই ফিরে এলি যে!

মায়ের কথায় দীপা তার দিকে চাইল ক্লান্ত অসহায় চাহনিতে। মা অবাক হয়ে গেছে ক'দিন থেকে দীপার এই আকস্মিক পরিবর্তনে। আপিস থেকেই সোজা বাড়ী এসে নিজের ঘরে ঢোকে—বের হয় না কোথাও। ক্লাব, ইনষ্টিটিউট, এদিক ওদিকে বেড়াতে যাওয়া—আউটিং, অজয় নদের ধারে পিকনিক, সব ছেড়ে দিয়েছে দীপা।

—শরীরটা ভাল নেই মা! দীপার কণ্ঠে বেদনা ফুটে ওঠে। মা ওর গায়ে কপালে হাত দিতে থাকে।

—কই—জ্বরটর হয়নি তো ?

—ক'দিনের জন্য একটু চেঞ্জে যাবো ভাবছি। শরীরটা ভাল নেই।

মা কথা কইল না, মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে ব্যথাকাতর চোখে। জানলার পর্দাগুলো টেনে অন্ধকার করে বলে ওঠে।

—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

ঘুম আসে না দীপার; ঘুরে ফিরে সেই চরম অপমানের কথাই মনে হয়; কি হতে পারতো—কোন্‌খানে নেমেছে সে। যন্ত্রযুগ—বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে; তার তুলনায় এগোতে পারে নি মানুষের মন। সে আজও সাবেকী ধর্ম সংস্কার সম্মান নারীত্বের সম্পদ আঁকড়ে পড়ে আছে। দেহটাকে ঘিরে ধর্মনৈতিকতার বেড়াজাল পরিয়ে রেখেছে নারী। পুরুষও তার মনকে এই চিরন্তন বুভুক্ষা থেকে উঁচুতে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই নারী-পুরুষের মধ্যে সেই খাদ্য-খাদক সম্পর্কটা আজও বড় হয়ে আছে। এই বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনের প্রস্তুতিও কারো মনে আসেনি, তাই দীপা আজ বলি হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যন্ত্রজীবনের।

দিদির এই পরিবর্তনে মনু একটু বিস্মিত হয়েছে। দুর্বার বেগে চলতে চলতে কোথায় যেন নিদারুণ আঘাত খেয়ে থেমে গেছে দীপা; মানবকে সেদিন আসতে দেখেছিল তাদের বাড়ীতে, দীপা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ডেক চেয়ারে; চুলগুলো উস্কোখুস্কো—চোখের চাহনিতে একটা বেদনাতুর ভাব।

পারেখ কয়েকবারই এসেছিল দেখা করতে, এসেছিল এ. ডি ও মিঃ কৃষ্ণাণ, আরও কে কে এসেছিল ওর অসুখের খবর পেয়ে দেখা করতে; সকলকেই নিষ্ঠুর ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিল দীপা।

চাকরটাকে বলে—ওদের বলে দে, দেখা করবার মত সময় আমার নেই। ঘুমচ্ছে।

ওদের পরিচয়—ওদের স্তাবকতা আর ভুয়ো সম্মানের দাম আজ তার কাছে কানাকড়িও নয়। স্টীল টাউনের সেই দীপা ব্যানার্জির অপমৃত্যু ঘটেছে। বাংলোর বাইরে গাড়ীও আসে না আর—ফুল, মাছ আরও কত কি ভেট আসাও কমে গেছে ক'দিনেই। সাহেবের সঙ্গে কি যেন একটা গোলমাল ঘটেছে তার এ খবরটাই জঙ্গল শহরে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—হুঁ হুঁ বাবা; উত্থান-পতন আছে না? খুব উড়েছিল—এখন ধুপ্ করে ডানা ছেঁৎরে পড়েছেন।

ব্যারেজের বিষ্ণুবাবু কোক ওভেনে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে, অনেকদিন এই টংরা মাটিতে বাস করে পাকানো দড়ির মত শক্ত আর শয়তানী চেহারা হয়ে উঠেছে। কার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বিড়িটার উল্টো দিকে জোর ফুঁ দিয়ে

ময়লা সাফ করে ধরিয়ে বেশ আমেজী টান দিয়ে বলে ওঠে,

—জান না—বড়োর পীরিতি বালির বাঁধ।

ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥

এইবার চাকরি নিয়ে টান না পড়ে ছুঁড়ির।

চিতিপাহাড়ীর টিলার নীচে জারুল গাছঢাকা বাংলোটা ছায়াময় স্তব্ধতায় ডুবে আসছে।

নিবারণবাবু হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এই দুর্বার পরিবর্তনের স্রোতের বিরুদ্ধে বুঝবার শক্তিসামর্থ্য তাঁর নেই। জমিদারী চলে গেছে, মাত্র পঁচাত্তর বিঘে করে কয়েকজনের বেনামীতে কিছু জমি সরিয়ে রেখেছিলেন তাই টিকে গেছে। বাজারের দুপাশে মাত্র কয়েকটা পুরানো দোকান টিকে আছে—বাকী গজিয়ে উঠেছে দোতালা-তেতালা বাড়ী, ঝুনঝুনওয়ালা, আগরওয়ালা, কল্যাণদাস ঝাবরদাস ইত্যাদির দল এসে জুটেছে, মধুর গন্ধে ছুটে আসা মৌমাছির মত আজকের কালীপুরকে ঘিরে ধরেছে ওরা।

বর্ষাকালে জঙ্গল ঘেরা ছোট বসতিগুলি খোয়া রাস্তার দুপাশে নুইয়ে পড়ে ভিজতো, মাঝে মাঝে স্টেশনে কাঁপিয়ে যেতো মেল, এক্সপ্রেস ট্রেন; জনহীন স্টেশনে নেমে আসতো বিভীষিকা ঢাকা সন্ধ্যার অন্ধকার; লালমাটির ডাঙ্গা—শালবন—দামোদরের বালিচর আর মানাবনে নামতো তমসা, অবলুপ্ত হয়ে যেতো চড়াইএর কোলে আম কাঁঠাল বাগানের ছায়াঢাকা ভুবনপুর গ্রামসীমা; ঝিম ঝিম বৃষ্টি নেমেছে আকাশে, দূরে কোথায় ফেউ ডাকছে; স্টেশনের আলো নিভিয়ে বাবু খালাসী দু'এক-জনও পালাতো। কালীপুর হারিয়ে যেতো আদিম প্রাগ্‌ঐতিহাসিক অন্ধকারে।

নিবারণবাবু সেইদিনের মানুষ। সেদিনের প্রতিপত্তিশালী লোক; আজ কালীপুরকে চেনা যায় না; আজ সে নগরের পর্যায়ে পড়েছে। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রশস্ত সাদা কালো মার্কা ঘেরা জায়গাতে বাঁকুড়া, স্টীল টাউন, কোল ওভেন—বর্ধমান—আসানসোলগামী ঝকঝকে বাসগুলো; সাইকেল রিক্সা, ভটভটিয়া রিক্সার ভিড় জমে; মেইল,এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো দম নেয়; ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনগুলো থমকে দাঁড়ায়; দেশবিদেশের রকমারী যাত্রী আসে; কালীপুরের স্বৈরিণী মৃত্তিকা পুরোনো আপনজনকে ভুলে আদর করে জড়িয়ে নেয় ওই নবাগত অতিথিদের। দোকানে জ্বলছে নিওন লাইট; বাতাসে ধ্বনিত হয়ে ওঠে রেডিওর সুর, হর্নের শব্দ, লোকের কোলাহল; বিদেশিনীদের ভ্রূ-ভঙ্গী অপরাহ্নের কালীপুরকে জাগিয়ে তোলে। এখনও ওখানে সিনেমার রঙ্গীন পোস্টার—বনের মধ্যে সিনেমা

হাউস গড়ে উঠেছে গোটাকয়েক। মালিয়াড়ার জমিদার কালীপুর মৌজার ছ"আনার মালিক, জলের নীচে হারিয়ে যাওয়া ভুবনপুরের ভূতপূর্ব জমিদার মৃত কন্দর্প আচাই কালীপুরের দশ-আনির সরিকান—তাদের নাম আজ অজানা হয়ে উঠেছে।

অনেকে চেনে মানবকে—মিঃ আচারিয়া, সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার ব্যারেজ ডিভিসন। এই তার পরিচয়।

—কেমন আছেন মামাবাবু?

নিবারণবাবু চোখ মেলে মানবকে দেখবার চেষ্টা করেন। অতীতের অন্ধকার থেকে বর্তমানের আলোর আহ্বান; দীর্ঘ দেহ, যৌবনের দীপ্তি ওর দুচোখে। এ যুগের মানুষ ওরা; জীবনকে সহজ ভাবে ধরাবাঁধা ছকে নিতে পেরেছে। মিথ্যা মোহের স্বপ্ন ঘুচে গেয়ে তাদের; আজ কন্দর্প আচাই ওর জীবনব্যাপী বিক্ষোভের কারণ বুঝতে পেরেছেন নিবারণবাবু। এই প্রাণহীন যান্ত্রিক জীবন, হৃদয়হীন সভ্যতা; আর অপরিচিতের সম্মানকে হিংসা করতো সে।

কথা কইলেন না নিবারণবাবু; মানবের হাতখানা তুলে নেন নিজের হাতে; কর্মক্ষম পেশীবহুল হাত।

কালীপুরের অতীতের ছবি আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর চোখে, অস্তাচলের তীর থেকে জীবনের ক্লান্ত পেরিয়ে আসা পথের ওপারে উদয়াচলের দিকে চান তিনি।

সেই জীবনে হয়তো এতো বিলাস সভ্যতার স্পর্শ ছিল না কিন্তু তবু সুন্দর সার্থক ছিল যেই দিন। সমস্ত অপূর্ণতা বর্বরতা নিয়েও সেই জীবন ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।

যেদিনের মানুষ ছিল কন্দর্প আচাই—নিবারণবাবুও সেই কালের মানুষ; দ্রুত পরিবর্তনের বেগে গাছ থেকে বর্ষশেষের জীর্ণ পাতার মতই তারা ঝরে গেল একে একে সহজ স্বাভাবিক গতিতে!

কালীপুর এগিয়ে চলেছে পূর্ণ গতিতে—নিজের কক্ষপথে।

টিকে আছে টগর। এ যুগের বাঁচবার গোপন মন্ত্রটি তার জানা হয়ে গেছে। বাহ্যিক খোলসটাকে টেনে নিয়ে চলেছে এই যুগ—এগিয়ে চলেছে মানুষ; পোশাক-আশাক রুচি—সব দিক থেকে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। দেহটা এগিয়ে চলেছে, কিন্তু মন সেই সাবেকী মধ্যবিত্ত সংস্কারকে ছাড়তে পারেনি; এখনও সতীত্ব নারীত্ব চরিত্রের মাপকাঠি রয়ে গেছে অতীত কালেরই; অন্তরের সেই জড়তার মাঝে আজও সনাতনী মন মাথা তুলে নীতির নির্দেশ দিতে ওঠে; বর্তমানের স্থূল ভেদ

করে ওঠে অতীতের সংস্কারাচ্ছন্ন মন।

মাধুরী সেই দোটানায় পড়েছে; দীপার মত উগ্র আধুনিকা সেই মনের শাসনে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু মনকে সংস্কারমুক্ত করা এক যুগের সাধনায় সম্ভব নয়, তবে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব।

টগরের মন বলে কোন পদার্থ হয়তো আর নেই। দেহসর্বস্ব নারী। ব্যাভিচার আর মাংসের নেশায় মেতে ওঠা বাঘিনীর মত শিকারের পর শিকার ধরেছে; নিঃশেষে তাদের সবকিছু নিংড়ে নিয়ে পরিত্যাগ করে আবার নোতুন শিকার ধরার ফাঁদ পেতেছে। প্রীতি প্রেম ভালবাসা মন—অন্তরের এই দুর্বলতার স্পর্শ তার কোথাও নেই।

কৃপাল সিং বুড়িয়ে গেছে; ক্লান্ত সে। জীবনে দাঁড়াবার জন্য অনেক কিছুই করেছে। কিন্তু কোনটাই সার্থক হয়নি তার। মদ্যপ লম্পট মানুষটি হয়তো উঠতে পারতো, কালীপুর বাজারে তিনমহলা বাড়ী তুলে সাপ্লাইএর কারবার করে লাল হয়ে উঠতো—মুকুন্দ সাঁপুইএর ভাইপোর মত।

কিন্তু টগরের সর্বনাশা নেশায় ডুবে গেছে সে। ফেল পড়ে গেছে ওর কারবার। টগরের হোটেলের একপাশে বসে থাকে; দাঁড়ি গোঁফের জঙ্গলে সাদা আস্তরণ লেগেছে; চোখ দুটো বুজে আছে সর্বদাই। অত্যধিক নেশার ফলে হাত কাঁপে। টগর খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে দিনরাত, সবকিছু নিংড়ে নিয়ে আজ কৃপাল সিংকে বাতিল বলে নিয়েছে।

—যা না মুখপোড়া, নদীর ধারে তুব ভিটেতে যা না। মড়া এখানে পড়ে আছে দিনরাত!

কৃপাল সিং কথা বলে না, লাল দুটো চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম টগরকেই কত কি শোনাত কৃপাল সিং; শুনত কেবল টগর একা; তার জন্য পরমা ডোমকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। দুহাতে ওর পায়ে ঢেলে দিয়েছে লুঠকরা অর্থ—দৌলত। টগর সেদিন শুনেছে তার নিভৃত প্রেমালাপ।

আজ দিন বদলেছে—টগর শোনাছে তাকে; একা সেই-ই ওই রুদ্র রসালাপ শুনে ক্ষান্ত হয়নি—শুনছে সারা কালীপুরের লোক।

টগর আজ হোটেলের কর্ত্রী; কালীপুর বাজারের বাইরেই টিলার গায়ে বড় দোতলা বাড়ী তুলেছে; অনেকখানি সীমানা জুড়ে পাঁচিল দিয়ে কুয়ো পাম্প গ্যারেজ—সবই গড়েছে, পিছনেই শালবনের সীমানা, কয়েকটা বড় বড় আমগাছ ছায়াঘন মনোরম করে রেখেছে জায়গাটাকে। বৈকালের বাতাসে ভেসে আসে বন থেকে শালফুলের মদির সুবাস।

টগর গোপন ব্যবস্থা করে রেখেছে; বিলেতী দেশী মদের যোগানও দেয়, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু। ঝকঝকে—নিওনজ্বলা বাড়ীটা এ অঞ্চলে আভিজাত্যের পরিচয় পেয়েছে।

এই পরিবেশে কৃপাল সিং-এর মত চেহারার ধ্বসেপড়া মানুষটি বেমানান।

—যখন-তখন এসো না বাপু, সাহেব-সুবো আসেন—থাকেন; তেনারা কি ভাববেন?

—একটু নেশার কিছু দে, চলে যাবে হামি।

কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে কৃপাল সিং। নেশার খরচ যোগাবার মত সামর্থ্যও তার নেই। গাড়ী দুখানার রোড পারমিটও টগরের নামে বেনামী করে রেখেছিল. টগরকে কান-ভাঙ্গানী দেবার লোক জুটেছে।

—ওই ঘরের ভিতর যাও, দেখোগে কিছু আছে কিনা।

বোতলের তলানি নাহয় অবশিষ্ট পেগের সামান্য সঞ্চয়, তাই দিয়েই তেষ্টা নিবারণ করে কৃপাল সিং।

সশব্দে একখানা গাড়ী এসে থামলো, কোন টুরিস্ট হবে বোধহয়, সদলবলে বান্ধবীদের নিয়ে নামছে; কাঁকে বাইনাকুলার ক্যামেরা, এদিকে ঝুলছে দামী ফ্লাস্ক।

ম্যানেজার ছোকরা এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে অভ্যর্থনা করে, ইংরেজী জানা খদ্দেরকে টগর অভ্যর্থনা করে না; শেঠজী, মাড়োয়ারী, বোম্বেওয়ালা ঠিকাদারদের আদর-আপ্যায়ণ করে টগর নিজে।

ওদিকে কাকে হেসে কি যেন বলছে টগর।

কৃপাল সিং রোদপোড়া ডাঙ্গার দিকে এগোল—আর দুপুরের আগুনজ্বালা গরম সহ্য করতে পারে না; কাঁচা পেঁয়াজ কামড়ে তলানি মদ খেয়েছে গা ঘুলুচ্ছে।

অ্যাই! কে যেন গালাগাল দিচ্ছে পিছন থেকে।

ভিজিটাররা চলেছে ব্যারেজের দিকে—দামী গাড়ী নিঃসব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, মদের নেশায় রাস্তার এদিক ওদিক টলতে সে—বেশ বুঝতে পারে কৃপাল সিং।

একদিন এ মুলুকে তাকে শুয়ারকা বাচ্চা বলবার কোন লোক ছিল না, ওরা সেই শের-ই-কালীপুরের কৃপাল সিংকে চেনে না। কন্দর্পবাবু গেছে, নিবারণবাবুও মারা গেছেন; দুই স্তম্ভের উপর পা দিয়ে কালীপুরের সৌভাগ্যের চুড়োয় উঠেছিল কৃপাল সিং; আজ পায়ের নীচের সেই ভিত্তি ধ্বসে পড়েছে, পরস্পর হিংসা

মারামারি করে তিনজনেই ধ্বংস হয়ে গেল ; নইলে কালীপুরের ইতিহাসে তারা স্মরণীয় হতে পারতো।

গা পাক দিচ্ছে। খালিপেটে তীব্র ঝাঁঝালো পানীয় রোদের তাপে গেঁজিয়ে উঠেছে, একটা শিশু গাছের ছায়ায় বসে বমি করলে কৃপাল সিং ঘামে নেয়ে উঠেছে বমির বেগে, ময়লা পাগড়িটার খুঁট দিয়ে মুখ মুছে দম নিচ্ছে।

ব্যারেজ বাংলোগুলো রোদে ঝিমুচ্ছে—জনমানবহীন হয়ে পড়েছে ওগুলো। নোতুন শহর গড়ে উঠছে দূরে—বনের মাঝে।

বনস্পতি থেকে পাতা ঝরছে। একটির পর একটি। বাবা গেছেন, দাদু গেছেন তাঁর আগেই। নিবারণবাবু হারিয়ে গেলেন—কালীপুরের অতীত জীবন মরে গেছে। মালিয়াডার মুখুয্যেদের গৌরব বিগতপ্রায়। দেশের বাড়ীতে আর কেউ রইল না। জমিদারী যাবার পর হতেই ওরা কলকাতায় গিয়ে উঠেছে স্টীলপ্রজেক্ট বাড়ীখানা কিনে নিয়েছে—বাগানের চাঁপাফুল গাছে আজও ফোটে গাঢ় হলুদ গন্ধভরা ফুলগুলো।

একজনকে মনে পড়ে মানবের বার বার।

কলকাতা থেকে ফিরছে কাজ সেরে, ট্রেনে উঠেই অবাক হয়ে যায়। আপার বার্থ—লোয়ার বার্থ রিজার্ভ করে যাচ্ছে স্বামীস্ত্রী আর একটি ছোট ফুলের মত সুন্দর ছেলে। চঞ্চল দামাল দুরন্ত। কামরাময় দৌড়ঝাঁপ করছে।

—মানব না?

—টুনুবৌদি!

চমকে ওঠে মানব। হাতের কাগজখানা ফেলে চেয়ে থাকে ওর দিকে। একটুও বদলায়নি—রূপ যেন ফেটে পড়ছে। কালো কোঁকড়ান একরাশ চুলের মধ্যে ঘন লাল সিঁদুরের আভা। মুখে তেমনি মিষ্টি টোল খাওয়া হাসির আভা। একটি মুহূর্ত। মানবের মনে ঝড় জমে ওঠে। টুনুবৌদি এগিয়ে আসে, এতটুকু বদলায়নি সে।

—রাগ করে কথাই বলবে না?

স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, ছটফটে বাচ্চাটা পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না—কাছে এসে জোটে।

—মামাবাবু হন, মস্ত ইঞ্জিনিয়ার।

খোকা ওর টাইএর ডিজাইন দেখতে থাকে নিবিষ্ট মনে।

একটি মুহূর্ত। সেই বেদনাভরা চাহনি মুছে গেছে টুনুবৌদির মুখ থেকে

—কি এক সার্থকতার অপরূপ রূপে রূপবতী আজ সেই মেঘবরণ কন্যা।

মালিয়াড়ার ধ্বসেপড়া অবস্থাটা মনে পড়ে, আজ টুনুবৌদি সেখানে থাকলে নিঃশেষ হয়ে যেতো ভালই করেছে সরে গিয়ে। মানব ওর দিকে চাইল, নোতুন করে বেঁচেছে টুনুবৌদি। সুখী হয়েছে।

—এখনও রাগ পড়েনি ?

গলা খাটো করে মানবকে শোনায় কথাটা। অধ্যাপক ভদ্রলোক কি একটা বই-এ ডুবে আছেন।

—দীপা কোথায় ? টুনুবৌদির কণ্ঠে পরিহাসের সুর।

মানব বলে ওঠে,—যে যার কাজে ব্যস্ত বৌদি। কে কার দিকে নজর দেয় !

টুনু ওর দিকে চেয়ে থাকে। মানবের মনে কোথায় নিদারুণ দুঃখ সে দিয়েছে। দীপার সঙ্গে আজ তার সম্পর্ক নেই এটা বেশ বুঝতে পারে অতীতের সেই ভুল বোঝাবুঝির পালা আজও থামেনি।

বলে ওঠে বৌদি—দীপা তার ভুল বুঝবেই মানব ; আমার মত নয়—আর নিরুপায় নয়।

মানব অবাক হয়ে টুনুবৌদির থমথমে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বাইরের দিকে চেয়ে কেমন যেন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে সে।

গাড়ীখানা বেগে ছুটে চলেছে। মানব আমন্ত্রণ জানায়,

—চল আমার ওখানে, একটা দিন—অন্ততঃ একটা বেলা থেকে যাবে।

—না। অতীত অতীতই থাক মানব। মিছে দুঃখ বাড়াতে চাই না।

একটি স্বপ্নময় যৌবন বেলা ! কত আশা উৎসাহ দিয়ে গড়ে তুলেছিল সে। মানবকে হারানো কালীপুরের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পথের বাঁকে একটি মধুসন্ধ্যা তাকে ডাক দিয়ে সরে গেল। এর বেশী চাইতে গেলেই মলিন হয়ে উঠবে সেই শ্রী। ওই হারানোর মাঝেই ওরা সুন্দর ! সেইখানেই সার্থক !

—তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বৌদি। তুমি সুখী হয়েছো। ভুল একটুও করোনি। আজ সেই কথাটাই বলে গেলাম।

কালীপুর স্টেশনে কয়েক মিনিট থেমেছে গাড়ীখানা, জানালায় কাছে দাঁড়িয়ে আছে মানব, বৌদির চোখ ছল ছল ; মানবের হাতখানা বৌদির হাতে।

—সংসারী হও মানব। সঙ্গী চাই জীবনে—অনেক দাম দিয়ে এটুকু অনুভব করেছি।

চলছে গাড়ীখানা ; কালীপুরের সবুজ স্মৃতি দূরে—দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল ! মিলিয়ে গেল টুনুবৌদির ডাগর জলভরা চোখের চাহনি।

কর্তৃপক্ষ পরমদয়ালু। অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। দায়িত্ব

স্বীকার করে সৎসাহস দেখানোর রীতি এখানে সেকেলে' এসব তো হামেশাই ঘটছে—এরজন্য দীপাকে মুষড়ে পড়তে দেখে অভয় দেয় পরমদয়ালু কর্তব্যপরায়ণ অনেকেই।

—ইট ইজ নাথিং ম্যাডাম।

ডাঃ মাধুরী চ্যাটার্জি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একজন জুনিয়ার ডাক্তার মাত্র—অদৃশ্য উপরওয়ালাদের চাপে চিফ মেডিক্যাল অফিসার ওকে একটু কড়া করেই বলেন।

—নো কমেণ্ট প্লিজ।

চুপ করে যায় মাধুরী। স্টীল টাউনের সিকিউরিটি অফিসার মিঃ পাণ্ডে ওর দিকে চেয়ে থাকে—নামটা গোপনে চলে যাবে ওদের কানে তাও জানে মাধুরী। ব্যাপারটা কিছু অনুমান করেছিল—অনেকক্ষেত্রে আইন মানা যায় না। জঙ্গল মহলে গজিয়ে ওঠা নব্য সভ্যতার উৎকট রূপ দেখে শিউরে উঠেছিল সে।

মেয়ে হয়ে অন্য একজন মেয়ের জন্য সমবেদনায় মন ভরে ওঠে। আজও ভোগের বস্তু নারী; পুরুষের কাছে খেলনা। এই নির্মম সত্যটাকে বেদনা পেয়েছে মাধুরী।

দীপা একাই বসে আছে। জানলার বাইরে টিলার উপর ছোট্ট বাগানে জন্মেছে কয়েকটা গোলাপ; মাধবী লতা ছেয়ে ফুটেছে লাল সাদা ফুলগুলো—শীতের সাড়া পাওয়া যায় বাতাসে বাতাসে, গেরুয়া জল কালো রং ধরেছে কাকের চোখের মত। নদীর বিস্তীর্ণ চরে জন্মেছে কাশবন—সাদা ফুলের উত্তরী তখনও যাই-যাই করেও রয়ে গেছে। মুক্ত উদার পৃথিবী, কোথাও কিছুমাত্র মালিন্য নেই আকাশে বাতাসে। মানুষ প্রকৃতির এই নিবিড় স্পর্শ হারিয়ে অন্ধের মত আলেয়ার সন্ধানে মত্ত।

কত রূপ গুণ যৌবন থাকা সত্ত্বেও দীপার মনে কোথায় জেগেছে অপরিসীম দৈন্য। একটার পর একটা ভুল সে করে চলেছে। আজ মনে হয় মানবের কাছে অপরাধের সীমা নেই। বার বার নিষ্ঠুরভাবে ফিরিয়েছে তার আহ্বান। উদ্দাম বেগে চলতে গিয়ে এই আঘাত পেয়েছে। সতেজ সরল জীবনবৃক্ষের মূলকাণ্ডে গভীর ক্ষতের দাগ হয়ে যাবে—সামান্য ঝড়েই ভেঙ্গে পড়বার পথে এই দাগটুকুই যথেষ্ট।

আজ উৎকট সভ্যতার গ্লানি তার জীবনপাত্র উপছে তুলেছে বিষাক্ত ফেনায়। বিষিয়ে উঠেছে তার মন।

মাধুরী ঘরে ঢুকলো সাদা অ্যাপ্রনের উপর কাঁধ থেকে ঝুলেছে স্টেথিসকোপটা, সদ্যস্নাতা মাধুরী—কাঁধের কাছে খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে। শান্ত মাধুর্য ও দেহমন

ঘিরে রেখেছে নীরবে শুচিতার। থমকে দাঁড়াল! দীপার দুচোখে জল। বাইরের নীল রৌদ্রছায়া বোলানো আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে—গালে অস্পষ্ট জলের দাগ।

—মিস ব্যানার্জি!

চমকে ওঠে দীপা—ওর দিকে চেয়ে বলে ওটে মাধুরী।

—ভালোই আছেন।

দীপা চুপ করে থেকে বলে ওঠে।

—সভ্যজগতে ভালো না থাকবার কোন কারণ নেই।

কথাটার বিদ্রূপ ঝরে পড়ে। নিজের নির্মম পরাজয় ব্যথতা বঞ্চনার মূল্য দিয়ে এর রূপকে সে আজ চিনেছে নিষ্ঠুরভাবে। হাহাকার করে মন। মাধুরী এগিয়ে আসে, মিষ্টি হাসিতে মুখখানা সুন্দর লাগে। দীপার কথায় জবাব দেয়।

—সভ্যতার এ দোষ নয় মিস ব্যানার্জি। দোষ আমাদের সমাজের পঙ্গু সংস্কার ঢাকা মনের। সমাজের বাহ্যিক রূপ নানা অর্থ নৈতিক চাপে পড়ে বদলে গেছে। আজ আমাকে আপনাকেও চাকরি করতে আসতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের মনের প্রসার অগ্রগতি তার তুলনায় তেমনি ঘটেনি। মনটা সাবেকীই রয়েছে—সেই ঠাকুর্দার কালের সুতই। সেই মাপকাঠিতে আজও পাপপুণ্য দোষগুণ বিচার করি, কিন্তু সমাজের কাঠামো বদলানোর জন্যই যে এই ট্রাজেডি ...তার কোন প্রতিবিধান নেই। বরং শাস্তি দেবার জন্যই চোখে চশমা লাগিয়ে এখনও পণ্ডিতের দল বসে আছে।

দীপা ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। মর্মে মর্মে অনুভব করে ওর কথাগুলো সত্যি। পুরুষ-নারীর সহজ সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি আজও। মিললেই বন্ধুত্বের পরই দাবী আসে তার দেহের উপর। নারী তার কাছে আজও একমাত্র ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। বন্ধুত্ব পরিচয়—সবই সেই একটি চরম মুহূর্তের নীরব প্রস্তুতি মাত্র।

মাধুরী জবাব দেয়—দুজনকেই এরজন্য সতর্ক হতে হবে।

হঠাৎ কি ভাবছে মাধুরী। তার জীবনের ছোট ছোট কয়েকটা ঘটনা। মানবের মুখখানা ভেসে ওঠে। স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে একটা কাঁমাতুর ব্যাকুল দৃষ্টি। মনের দুর্বলতা আর মুখের কথায় একটা পার্থক্য জেগে ওঠে। সেও ভুল করছে—দীপার জীবনে এই নিষ্ঠুর পরিণতি দেখে তার কোথায় যেন ভুল ভেঙ্গেছে। থমকে দাঁড়িয়েছে মাধুরী—পুরুষ জাতের উপরই জমে উঠেছে পুঞ্জীভূত ঘৃণা।

কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল দীপা, কালো দৈত্য ওই আকাশ থেকে তার

দিকে চেয়ে রয়েছে, দুচোখে তার নিবিড় জ্বালাময় বুভুক্ষা। আতঙ্কে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে—ঝড়ো আকাশে বিদ্যুতের ধমক্—ঝর ঝর করে কোন অসহায় নারী কাঁদছে, মুখেচোখে এসে পড়ছে ঘন কালো চুলের রাশ।...

মিস্ ব্যানার্জি।

ওর ডাকে মুখ তুলে চাইল দীপা। ছলছল বেদনাভরা চোখ। বর্ষার কালো মেঘ-থমথমে আকাশের মত—বৃষ্টিভেজা, বৃষ্টিভরা সে চাহনি।

—সব আশা স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে ডাঃ চ্যাটার্জি?

—কেন হবে?

দীপা আমূল বদলে গেছে, সামান্য একটু দয়া সমবেদনা আশ্বাস আজ পেতে চায় সে। নিঃস্ব ব্যর্থ কাঙ্গাল মনের শূন্যপাত্রে আজ প্রীতি ভালবাসার কণামাত্রও তার প্রয়োজন।

—কিন্তু এ অপমানের জ্বালা থেকে সেরে ওঠা যায় না।

দীপার বৃষ্টিধরা চোখে জল নেমেছে।

নদীর বালিযাড়িতে কাঁপছে দিকছোঁয়া সাদা উত্তরী। ধূ ধূ বালুর বুক চিরে চলেছে একফালি ক্ষীণধারা, কখন যেন নিঃশেষ হারিয়ে যাবে। খররৌদ্রে লি লি করছে বালুচর মরীচিকার সন্ধানে।

বহু দুঃখকষ্ট পেয়ে নটেশ্বর আজ জীবনের ধারা বদলেছে। পথ হারিয়ে বিপথে ঘুরেছিল, অতীতের সেই প্রতিভাবান যুবক একটি যেন নেশার ঘোরে এতদিন ডুবে ছিল। আজ পথ পেয়ে আবার দাঁড়িয়েছে।

বিলেতী কোম্পানীর ঘরে পারচেজিং সেকশনে কাজ পেয়েছে। তুখোড় ছেলে, জীবনে দুঃখকে দেখেছে—সহ্য করেছে। আজ তাই সাবধানী হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায়।

ধোপদুরস্ত পোশাক—বাইরে বাইরে মালপত্র কেনার ব্যাপারে ঘুরতে হয়; ছাইচাপা আগুন ঠেলে উঠেছে।

মাধুরী ওর দিকে চেয়ে থাকে—টাকাগুলো এগিয়ে দেয় নটেশ্বর।

—টাকা কেন?

—তোমার কাছে যা নিয়েছি তার তো কোন হিসেব-কিতেব নেই। যা পারি কিছু শোধ দিই, ভবিষ্যতে আবার হাত পাততে হবে কিনা কে জানে!

—না দিলেই কি নয়! রাখো তোমার কাছেই।

নটেশ্বর বলে ওঠে—কোম্পানী বাসা দিতে চাইছে। ভাবছি নিয়েই নিই। তোমার এখানে অসুবিধা করে কতদিন থাকবো?

মাধুরী কথা কইল না; চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে!

অতীতের সেই ব্যবসায়ী নটেশ্বর আবার জেগে উঠেছে। ফাটকা খেলায় সব হারিয়ে মদ আর রেসের পিছনে ছুটেছিল। কোন জঘন্য একটা মেয়ের পিছনেই ওর অর্থ সময় বহু প্রাণশক্তির অপচয় ঘটিয়েছে। ঘৃণা করতো মাধুরী সেদিনের ওই মানুষটিকে।

হঠাৎ দরজায় গাড়ী থামতে দেখে চমকে ওঠে নটেশ্বর। ওপাশের ঘরে সরে যাবার চেষ্টা করতে বাধা দেয় মাধুরী।

—বসো।

—মানে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না নটেশ্বর।

মানব এগিয়ে আসছে। প্যাণ্টে তেল কালির দাগ, হাফশার্টটা ঘামে ভিজে গেছে—সোলা হ্যাটটা নেড়ে বাতাস করবার চেষ্টা করে।

নটেশ্বর ওকে দেখে সরে গেল মাধুরীর কথা না শুনেই।

—বসুন। শুকনো কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায় মাধুরী।

—ওকটু জল আনতে বল। উঃ যা গরম।

বারান্দা থেকে ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে নটেশ্বর। তখনও সেই লোকটির দিকে চেয়ে আছে মানব। একটু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—ও কে?

মাধুরী ছোট্ট জবাব দেয়—আত্মীয়!

বার বার ওর চোখের সামনে দীপার কথা মনে পড়ে—সেই জলঝরা চোখ, কান্নাভেজা অসহায় মুখ! ভুল সে করেছে—ঠকেছে দারুণ ভাবে। মরীচিকার পিছনে বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরে ঘুরে শুকনো বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে শেষনিঃশ্বাস নিতে চলেছে। ভুল! মোহ—শান্তির আশ্বাসভরা মিথ্যা সজল মরীচিকার পিছনে আজ ছুটে আবার সেই ভুল করতে চায় না মাধুরী। অতীত অতীতই থাক! যেটুকু সত্য—যত কঠিনই হোক, তাই নিয়ে শান্তির সন্ধান করবে সে।

পড়ন্ত বেলা। রিজার্ভার থেকে ক্লান্ত পাখায় সাঁই সাঁই শব্দ তুলে ফিরে চলেছে বালিহাঁসের দল কোন আশ্রয়ের সন্ধানে। শূন্য আকাশে একটু সুর তুলে হারিয়ে গেল দিগন্তে।

—চল, একটু ঘুরে আসি।

একটি মুহূর্ত। বাতাস কাঁপছে গাছের পাতায় পাতায়, পথ হারিয়ে গুন্‌গুন্ করছে একটি ভ্রমর ফুলের ব্যর্থ সন্ধানে। নদীর উছল ধারা রুদ্ধ আক্রোশে বাঁধে মাথা খুঁড়ে ফেটে পড়ছে শতধা হয়ে স্টীল গেটের নীচে।

মাধুরী বলে ওঠে—একটু কাজ আছে জরুরী!

চুপ করে গেল মানব, মাধুরীর কালো চোখের তারার গভীরে কি একটা শ্রান্তি—নিবিড় আর্তির চিহ্ন পরিস্ফুট। ওঘরে নটেশ্বরের জুতোর শব্দ শোনা যায়।

মানব ওর দিকে চেয়ে থাকে। দেখছে মাধুরীকে। কি যেন রহস্যময়ী একটি নারী। আজ নিজেকে রাত্রিব ওই আঁধারের মাঝে সরিয়ে রাখতে চায় একটি অজানা রহস্যের অন্তরালে। ও কোন অধরাই রয়ে গেল। বার বার চেষ্টা করেও যার মনের নাগাল পায়নি।

ওরা ওমনি কোনদূরের তারা—টুনুবৌদি, মাধুরী সবাই তার কাছে একটা নীরব প্রশ্ন তুলে সরে গেছে।

উঠে দাঁড়াল মানব; মাধুরী নীরব চাহনি দিয়ে অনুসরণ করছে তাকে। বের হয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠল মানব।

হু হু বাতাস বইছে বনের দিক থেকে। রাতের হিমেল বাতাস।

মানবকে ফিরিয়ে দিল মাধুরী; উঠে মানবকে পিছনে ডাকতে গিয়েও থামলো সে। কি ভেবে ভিতরে চলে যায়।

নটেশ্বর ওঘরে স্নান সেরে এসেছে, ওর সুন্দর ফর্সা মুখে পড়েছে, কোঁকড়ানো ভিজে চুল—মুখখানা আজও তেমনি কচি, তেমনি সুন্দর।

মাধুরী থমকে দাঁড়াল একটি মুহূর্ত।

রাতের আকাশে দু'একটা তারার রোশনী ফুটে ওঠে—আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে জলধারার দুর্বার শব্দে। টারবাইনের একটানা গর্জন শাসাচ্ছে তার মনের ব্যাকুল একটি চিন্তাধারাকে। মানবকে ফেরাতে সে চায়নি—জীবনের একটা অবলম্বনের প্রশ্ন বহুদিন থেকেই ভেবেছে সে। পথ পায়নি আজও ভাবে।

মাধুরী আজ নিজেকে খুঁজে পেতে চায় দীপার অসহায় জীবনের শূন্যতা বেদনা আজ তাকেও ব্যাকুল করে তুলেছে। একা সারা জীবনের বোঝা হওয়া যায় না। সঙ্গী চাই। ভালবাসা চাই—এতবড় সংঘাতময় পৃথিবীতে মানুষ আজ ঘর বাঁধতে চায় সেই তার পরম সাধনা। সামনে আজ একটি কঠিন প্রশ্ন। মাধুরী কি ভাবছে।

নটেশ্বর নোতুন বাসায় উঠে যাচ্ছে—তারই আয়োজন করছে।

মাধুরী যেন দূর থেকে কথাগুলো শুনছে—ফার্ণিশ্‌ড কোয়ার্টার দিচ্ছে কোম্পানী। দু'একটা পার্টিও দিতে হবে। আবার পায়ে তলে মাটি পেয়েছে নটেশ্বর।

অন্য কোন নটেশ্বর স্বপ্ন দেখছে। ফড়েপুকুরের সাবেকী চাটুয্যে বাড়ীর ছেলে—

রেসের পিছনে আর বিলেতী মদের নেশায় দুখানা বাড়ী উড়িয়েছে। বেপরোয়া মানুষটি আবার মাতনে মেতে উঠে হারিয়ে যাবে কোথায়।

রাত্রির অন্ধকার নিবিড় ভাবে ছেয়ে এসেছে। নির্জন পথে বনের ধারে ধারে কোথায় দু'এটকটা আলো জ্বলছে নিঃসঙ্গের মত। তারাগুলো নিভে গেছে আঁধারে!

হঠাৎ যেন দমবন্ধ হয়ে আসে নটেশ্বরের, একটা নরম উষ্ণ স্পর্শ নিবিড় নিঃশেষে তাকে জড়িয়ে ধরে গ্রাস করতে চাইছে। চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে। কানে আসে কান্নার শব্দ! ··ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছে নটেশ্বরকে। অবাক হয়ে যায় সে। অতীতে এমনি ব্যাকুলভাবে একরাত্রে কেঁদেছিল তার বুকে মাথা রেখে।

—আমার সব হারিয়ে যাবে।

···আজও। আজও আবার সেই মাধুরীই ফিরে এসেছে তার স্বামীর কাছে পরম প্রীতি আর ব্যাকুলতা ভরা অন্তর নিয়ে।

—মাধুরী! মাধু!

মাধুরী কাঁদছে—আমাকে ফেলে যেও না। বড্ড একা অসহায় আমি।

শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে—স্রোতমুখর অকূল সমুদ্রে একটু নির্ভর চায় মাধুরী। হারানো সংসার—সেই ফেলে আসা জীবনে আজ শান্তির সন্ধান করে মাধুরী।

অতীতে কবে তাদের বিয়ে হয়েছিল মনে পড়ে না, নটেশ্বর সেই পরিচয় অগ্রাহ্য করে তাকে ফেলে গিয়েছিল, তারপর মাধুরী এসেছে অনেক পথ পার হয়ে আজ একক নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করে নিতে চায় নোতুন করে।

নিঝুম রাত। তারা নেভা রাত। ঝড়ো হাওয়া হাঁকা প্রান্তর। নিঃস্ব নটেশ্বর আজ বাঁচতে চায় মাধুরীর উষর প্রতিবাদমুখর জীবনের কাঠিন্য প্রেমের অমৃতধারায় সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে।

একটু উষ্ণ নিবিড় স্পর্শ। মাধুরী নিজেকে নিঃশেষে ভুলে যেতে চায়।

দীপার কান্না! বাতাসের হাহাকার! বদ্ধ দামোদরের নিষ্ফল প্রতিবাদ ধ্বনি—সব ভুলে গেছে তারা। অতীতের দুটি মানুষ এই পরিবর্তন ভরা সার্থক বর্তমানে।

বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গণনা করছে মানব। প্যারাপেটে দাঁড়িয়ে আলো-আঁধারি মাখা নদীর বিস্তীর্ণ গভীর জলরাশির দিকে চেয়ে আছে। ভুবনপুর নিশ্চিহ্ন—মুছে গেছে তার বাল্যস্মৃতি। সেই কালীপুর, মাধুরী, টুনুবৌদি, দাদু, বাবা—সবাই হারিয়ে গেছে দুর্বার পরিবর্তনের স্রোতে।

দামোদরকে শান্ত করেছে—ও দুর্মদ বেগ ঘূর্ণায়মান টাববাইনের ভেতর জীবন্ত দৈত্যটাকে ঝাঁকানি দিয়ে চলেছে ; দুই তীরে তার ফসলের স্বপ্ন—আঁধার ঘুচোন আলো—জীবনের ইঙ্গিত। মানব এই মহাযজ্ঞে বিসর্জন দিয়েছে তার সবকিছু। অতীত স্মৃতি—কত প্রিয় আপনজন—সমস্ত সংস্কার।

কিন্তু বাস্তব জীবনে তার আঁধার—আঁধারই রয়ে গেছে ; আলো জ্বলেনি। টুনুবৌদি ! যৌবন উপবনে বসন্ত কোকিল ব্যর্থতানে ডাক দিয়ে ফিরে গেছে। মাধুবীকেও হারিয়ে ফেলেছে। দীপার অবজ্ঞা আজও স্পর্শ করে আছে তাকে—ওদের জীবনধারায় কোন অমৃতসন্ধান সে করতে পারেনি, মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাসিদ্ধ কচ অমৃতের সন্তানদিকে বাঁচবার মন্ত্র দিয়েছিল—নিজের ব্যর্থ জীবনের নিঃশেষ বঞ্চনার অভিশাপ বয়ে। দেবযানীরা ফিরে গেছে বার বার।

গুম্ গুম্ গুম্ শব্দ। প্যারাপেট কাঁপছে—এক চিলতে আলো শিউরে উঠছে। জলাধার থেকে দুটো স্লুইস দিয়ে জল আছড়ে পড়ছে নীচে।

সাহেবকে দেখে কে যেন সেলাম করলো।

মানব এগিয়ে চলেছে জেনারেটিং স্টেশনের দিকে নির্জন আলোমাখা পথ দিয়ে। রাত্রির শেষ প্রহর ঘোষণা করছে ওয়াচ টাওয়ার থাকে।

দীপা অবাক হয়ে যায় ক'দিন পর চাকরিতে জয়েন করতে গিয়ে ; তাকে হেড অফিসের ওই গৌরবময় পদ থেকে বদলি করা হয়েছে স্টোর ইনচার্জের অফিসে সাধারণ টাইপিস্ট হিসেবেই। স্বর্গ থেকে বিদায়। চুপ করে অর্ডারটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বেশ বুঝতে পারে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে সে—চারিপাশের কৌতূহলী বাবুর দল বলে বনে খুব খুশী হয়েছে।

ধীরে পায়ে এগিয়ে চলে ম্যানেজারের—আপিসের দিকে। লালডাঙ্গার মধ্যে খসের পর্দা ঢাকা সুদৃশ্য আপিস—সামনের বাগানে রকমারি ফুল ফুটে রয়েছে ; এয়ার কুলারের ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া মাঝে মাঝে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসে।

এগিয়ে গিয়ে পি-এর ঘরে ঢুকলো ; তারই সিটে বসেছে একটি অ্যাংলো মেয়ে ; একরাশ সোনালী চুল কাঁধে পড়েছে ; জামার বালাই যেন নেই, সরু স্ট্রাপ দুটো নিটোল কাঁধে চেপে বসেছে।

—সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ডিকটোফোনে নামটা বলামাত্র সাহেবের কামরার শব্দ ভেসে আসে, ফাইলের পাতা উলটে চলেছেন সাহেব, গম্ভীর কণ্ঠে জবাব আসে—ভেরি বিজি নাউ।

অর্থাৎ দেখা করতে চান না তিনি। মেমসাহেব ওর দিকে চেয়ে হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে জবাব দেয়।

—সো সরি।

যেখানে একদিন প্রবল প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করেছিল, আজ সেখান হতে নির্বাসিত সে। স্টাফ সেকশন থেকে চিরকুট লিখে তার হাতে দেয়। অন্য সেকশনে কাজ করবার হুকুম হয়েছে।

নীরবে বের হয়ে এল সে; পরিষ্কার দেখতে পায় তার ভবিষ্যৎ। হরীতকী গাছের ছায়ায় পড়ে রয়েছে ফলগুলো, গা জ্বালা করা বাতাসও হু হু বইছে; খাড়া চড়াই-এর নীচে পাথর কেটে প্রশস্ত গর্জের ভিতর ঝকঝকে চারটে লাইন দূরে স্টেশনের প্লাটফরম থেকে বের হয়ে এসেছে সরীসৃপের মতন; দুটো পাহাড়ের মাথায় সাঁকোটা থেকে নীচের দিকে চেয়ে রয়েছে দীপা; অনেকখানি উঁচু; সোজা চাইতে পারে না, মাথা ঘুরছে। লজ্জায় অপমানে রোদের তাপে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে সে।

ফুঁদিয়ে প্রদীপ নেভাবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো কোন্ পথে অদৃশ্য হয়ে যায়; দীপার সমস্ত প্রতিপত্তিই কোন্ দিকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ সে একা অসহায়—হাজারো চোখের চাপা কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে খোঁচা মারছে এদিক ওদিকে থেকে।

গাড়ীর স্বপ্ন তার ঘুচে গেছে। অনেকখানি পথ; চড়াই ভেঙ্গে বৈকালের নির্জন বনপথ দিয়ে আসতে ভয় হয়, সাইকেল রিক্সা নিয়ে ফিরছে। ঝকঝকে প্লিমাউথ গাড়ীখানা আজও বৈকালে ছুটে চলেছে রাস্তা দিয়ে সুরেলা হর্ণ বাজিয়ে; পিছনের সিটে বসে আছে মিস কার্ডিথ; দীপা সেখানে অপরিচিত। সাধারণ একজন টাইপিস্ট মাত্র।

দশ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনি—মাথার উপর শাল কাঠ দিয়ে টিন সাঁটা—কোন রকমে খাড়া হয়ে টিকে আছে মাত্র, দমকা হাওয়া দিলে চাল মড়মড় পড়পড় হাঁক ছাড়ে। লাল কপিশ ডাঙ্গা রোদে লি লি করে—হলের ভিতর পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল দীপা। একশো পঁচিশ তিরিশ ডিগ্রী গরম ঝাঁঝ ওঠা আগুনের মালসার ফোঁকরে হাত দিয়েছে যেন!

—এই যে এদ্দন।

একটা চাপা শব্দ ওঠে—বাবুরা যে যার সিট থেকে ড্রিলের মাষ্টারের হুকুম শোনা ছাত্রদের মত একত্রে ঘাড় ফিরিয়েছে।

দীপা মাথা নামিয়ে এগিয়ে যায়; বেশ কয়েকজোড়া চোখ ওর দিকে গোগ্রাসে গিলে ফেলবার চেষ্টা করছে।

সেকশনে প্রথম মেয়ে টাইপিস্ট এসেছে।

কে যেন ফিসফিস করে বলে ওঠে, কথাটা পাশের লোককে উদ্দেশ্য করে,—এখবাব ট্যা ফুঁ চলবে না, কর্তাদের চেনা লোক, কে জানে বাবা স্পাই টাই কিনা।

—হতেও পারে। লোকটা আপাদমস্তক দেখছে তার।

যেন কাঠগড়ার আসামী, মাথা নুইয়ে আসে লজ্জায় অপমানে প্যাকাটির মত পাকানো চেহারা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে একটা নড়বড়ে পুরোনো মেসিনের সামনে বসিয়ে দেয়। একগাদা চিঠি, ড্রাফট রিটার্ণ—আরও কত কি টুকিটাকি সব টাইপ করতে হবে। এতদিন কাজ করেনি দীপা, কাজ কাকে বলে জানতো না। চোখের সামনে স্তূপাকার ফাইল দেখে অবাক হয়ে যায়।

এতো সব?

—হ্যাঁ, হেড অফিসে কি কাজ হয় বলুন। ও ডিপার্টমেণ্ট তো তীর্থক্ষেত্র। গাধার খাটুনি খেটে আমরাই মলাম এই নরকে!

ওপাশ থেকে কে যেন বেশ জোর গলাতেই বলে ওঠে।

—ঘুঘু দেখেছো, এবার ফাঁদ দেখো।

হাত-পা কাঁপছে দীপার। লজ্জায় রাঙ্গা সিঁদুর বরণ হয়ে ওঠে ওর মুখ গাল। মেসিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

সেই দূরাগত কণ্ঠস্বর শোনা যায়—টাইপ জানা আছে তো?

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্যানার্জির মেয়ে—কলকাতার সমাজের মক্ষিরাণী দীপা শালবনের আড়ালে কোন্ গভীর শ্বাপদসঙ্কুল উপত্যকায় এসে পড়েছে।

কাজ সারবার চেষ্টা করেও পারে না।

আপিস থেকে বের হতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শালাবনের মধ্যে আবছা অন্ধকার অন্ধকার নেমে এসেছে, থেমে গেছে পাখীর কাকলি। মাঝে মাঝে আলো জ্বলছে—দু'একখানা গাড়ী হাঁকিয়ে যায় পদস্থ কর্মচারী কর্তারা।

একখানা সাইকেল হঠাৎ যেন ওর গায়ের কাছে এসেই সশব্দে ব্রেক কসল। আঁৎকে ওঠে দীপা।

—একা কেন? চলুন একটু ঘুরেফিরে আসি।

আধচেনা একটি মুখ—কুৎসিত বর্বর লালসা ফুটে ওঠে ওর চোখেমুখে। থমকে দাঁড়াল দীপা, কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে।

—কি বলছেন?

—কিছু না। গতিক দেখে লোকটা আবার সাইকেলে উঠে চলে গেল। দীপা তখনও দাঁড়িয়ে আছে—রাগে ফুলছে মনে মনে।

ক্লান্তি আর পরাজয়ের কালিমায় কালো হয়ে উঠেছে দীপার মুখ। এতদিন

এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়নি। এখানের এই পরিচয় এত নগ্ন রূপে পায়নি।

দশটা বাজবার আগেই বনপথ মুখর হয়ে ওঠে—সাইকেল, বাস আর পথচারীদের আনাগোনায়। এক একটি টিলা। বনভূমিকে কেন্দ্র করে এক একটি আপিস। ভিড় করে লোকজন।

—দশটায় আপনার হাজরি।

পিটপিটে সেই লোকটি কথাটা মনে করিয়ে দেয়—লেট হলে চলবে না।

কৌতূহল দৃষ্টি মেলে সকলে ওর দিকে চেয়ে আছে। গজগজ করছে লোকটা —স্টাফ যত টাইট করবার মত লোক পাঠাবে এইখানে। আরে বাবা আমি কি ট্রেনিং সেন্টার খুলেছি।

দীপা অনুভব করে কর্তৃপক্ষ থেকে তার উপর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। অফিসারের উপর নির্দেশ এসেছে তার কাজগুলো খুঁটিয়ে দেখবার, কোন সামান্য দোষ পেলেই যেন জানান হয়। এবং তার ফল কি জানে দীপা। এখন থেকে ফেলবার জন্য এই আয়োজন।

—কাল জরুরী ফাইলটা টাইপ করেননি।

দীপা কথা কইল না। ওরা আরও কিছু বলবে।

তার অপরাধ কোথায় জানে না দীপা, শক্তিমান কয়েকজনের দুর্বলতম মুহূর্ত-গুলোয় ওদের পৈশাচিক রূপ সে দেখেছে—চিনেছে তাদের। সেই প্রভুরা এড়িয়ে চলতে চায় দীপাকে—রেহাই পেতে চায় তাকে দূরে সরিয়ে।

এমনি দু'একটা সদ্য গজানো শহরে কর্তৃপক্ষের সিকিউরিটি বাহিনী পুলিস ছাড়াও একটি বেসরকারী দল আছে। দোষ দিতে বেশীক্ষণ লাগে না, হুকুম কাগজে কলমে বের হবে না, তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ী গিয়ে হাজির হবে বাড়ীতে—বিনা এত্তেলায়। কয়েকঘণ্টার মধ্যে কালীপুর ছেড়ে যেতে হবে তাকে।

মিস দাসগুপ্তাকে যেতে হয়েছে—লেবার ইউনিয়নের প্রমুখ সমাদ্দারকেও দূর করেছে ওরা—আরও কত লোককে। ওদের ক্ষমতা এবং সম্মানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেই সরিয়ে দেবে ওকে!

গা ছম ছম করে জায়গাটায় এসে। পুরোনো বনস্পতিগুলো রাস্তাটাকে ঘিরে আছে। বট তাল গাছগুলো জটলা পাকিয়েছে শালবনের মাঝখানে। আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। রিক্সায় যাতায়াত করবার সুযোগও নেই—হেঁটেই আসছে। হঠাৎ কালকের সেই মূর্তি সাইকেল থেকে একটা লম্বা পা

রাস্তার ধারে ঠেকিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে নীরব বীভৎস চাহনিতে।

—আমার কথা মনে আছে তো ম্যাডাম ?

দীপার বুক কাঁপছে, অজানা ভয়ে কাঁপছে সারা শরীর। ওরা দীপাকে আজ খেলার বস্তু হিসেবেই জেনেছে। ওর দাম এমনিই কানাকড়ি।

—কাল আসবো।

দাঁড়াল না, পায়জামাপরা মূর্তিটা সিধে উৎবাইএর দিকে বেগে নেমে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দীপা। দু'চোখে গড়িয়ে আসে অসহায় কান্না। আজ প্রতিবাদ করবার, আত্মরক্ষা করবার শেষ সামর্থ্যটুকু মাত্র নেই। একমাত্র উপায় এখানে থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করা—ভীরুর মত পালিয়ে যাওয়া।

রাস্তায় দু'একটা লোক যাতায়াত করছে। ওরা কৌতূহলী চোখে চেয়ে দেখছে তার দিকে, বাঙ্গালী গুজরাটী মদ্রদেশীয় অনেকেই।

মাধুরী বৈকালে হাসপাতাল থেকে ফিরছে হঠাৎ নদীর ধারে টিলার কাছে কাদের জটলা দেখে এগিয়ে যায়।

মেইন রিজার্ভার থেকে নেমে টারবাইনের দিকে পাথরের স্তরের নীচে দিয়ে একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যানেল ব্লাস্ট করা হচ্ছে; নীচু দিয়ে জলস্রোত তীব্রবেগে গিয়ে টারবাইনের মুখে পড়ে জলবিদ্যুৎ তৈরী হবে। ডিনামাইট চার্জ করে সুড়ঙ্গ তৈরী হচ্ছে।

বহু লোকজন জমেছে। কুলিমজুর, কনট্রাক্টারের লোক, মাধুরী থমকে দাঁড়াল, কয়েকখানা গাড়ীও রয়েছে। একটা কোলাহল। অস্ফুট আর্তনাদ শোনা যায়। ব্লাস্ট করবার পর পাথর সাফ করতে গিয়ে একজন কুলি চাপা পড়েছে। দুজন আহত। বাকী ক'জন ওদিকে আটকে গেছে। ওদের মাথার উপর ঝুলছে একখানা বড় চাঁই—যে-কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে ওদের চেপ্টে দেবে। কয়েকটা ডিনামাইট ফিউজ ঠিকমত কাজ করেনি, যে-কোন মুহূর্তে ওই ফিউজগুলো জ্বলে উঠলেই আবার একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটবে। মানব উঁচু প্যারাপেট থেকে নীচের দিকে চলেছে।

—সাব।

ওভারসিয়ার দুজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বাধা দেবার চেষ্টা করে।

—যাবেন না, এক্ষুণি হয়তো ফেটে যাবে ওগুলো।

মানব জবাব দেয়।

—এগুলো সরানো দরকার। ফিউজগুলো যাতে না জ্বলে ওঠে।

রোদ ঝলমল করছে, বাতাসে তখনও উঠছে ধুলো—বারুদের গন্ধ। মানব

দাঁড়িয়ে আছে, ওর চোখেমুখে একটা দৃঢ়তা—কয়েকটা লোক অমনি করে মরবে? তার চোখের সামনে ওরা মরবে?

এগিয়ে যায়। সোলাহ্যাটটা ফেলে দিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ঢুকল।

চমকে ওঠে মাধুরী! হাঁ করে রয়েছে সুড়ঙ্গ; মাথার উপর ঝুলছে কালো কালো পাথরের এবড়ো খেবড়ো চাঁই—তখনও কাঁপছে মাটি; লোকগুলোর কাতর আর্তনাদ শোনা যায় বাতাসে বাতাসে।

মাধুরীকে দেখতে পায়নি মানব। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। দুর্দান্ত বেপরোয়া মানব; নিপুণ হাতে সরু তারগুলো হাতড়ে হাতড়ে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলছে—মাথার উপর কালো আঁধারে ঝুর ঝুর করে ঝরছে বালি পাথরের গুঁড়ো। চোখেমুখে উড়ে এসে পড়ছে।

—সাব। পানি। থোড়া পানি।

লোকটা তখনও মরেনি। ওর সারা দেহটা ঢেকে পাথরের চাঁইএ। মুখ হাতটা বের হয়ে আছে জীবন্ত সমাধির বাইরে। ওপাশে পড়ে আছে অন্যজন, হাঁটুটা ভেঙ্গে গেছে, কাতরাচ্ছে অন্ধকার সুড়ঙ্গের নীচে মাথার উপর ঝুলছে নিশ্চিত মৃত্যুর মত হাঁ করা পাথরখানা।

মানব ওকে টেনে বের করে কাঁধে তোলবার চেষ্টা করে—ওকে বাঁচানো যায়।

এক—দুই—তিন!

সময় বয়ে চলেছে। নিস্তব্ধ মুহূর্ত। রেসকিউ পার্টির লাল গাড়ী ঘণ্টা বাজিয়ে এসে হাজির হয়। মাধুরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জনতার মাঝে। একটা উল্লাসধ্বনি শোনা যায়। মানব ঘাড়ে করে আহত লোকটাকে নিয়ে বের হয়ে আসছে। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সরু সরু তারগুলো। হাঁটু কনুই রক্তাক্ত। দামী লিনেনের শার্টের পিঠখানা ছিড়ে গেছে, ঘামে ধুলোয় মুখ মাথা ভর্তি—চেনা যায় না। লোকটাকে ফাঁকায় নামিয়ে ফাঁফাতে থাকে!

রেসফিউ পার্টির লোকজনকে নির্দেশ দেয় কাজের।

রোদে দাঁড়িয়ে বুলডোজার দিয়ে পথ পরিষ্কার করাতে থাকে।

—তুমি!

মাধুরীকে এগিয়ে আসতে দেখে ফিরে চাইল, মাধুরী জবাব দেয় না। ওই বেপরোয়া লোকটির দিকে চেয়ে থাকে—মরণের ভয় ওর নেই। শেষ লোকটাকে বের করে আনবার সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ে পাথরের স্তূপ—মাটি কাঁপছে।

—থ্যাঙ্ক গড।

মাধুরীর দিকে একবার চেয়ে গাড়ীর কাছে এগিয়ে গেল—দাঁড়াল না। চলে

গেল মানব। মাধুরীর দিকে আর চাইবার দরকার নেই তার।

চুপ করে বাসার দিকে এগিয়ে যায় মাধুরী। মানব সে রাত্রের কথা।. ভুলতে পারেনি। সে ভুলতে চান সবকিছু।

—ফিরে এলে যে!

নটেশ্বরের কথায় মুখ তুলে চাইল মাধুরী; একটু ক্লান্ত স্বরে জবাব দেয়।

—শরীরটা ভাল লাগছে না।

—মাথা ধরেছে? কই দেখি।

নটেশ্বর। ছন্নছাড়া নটেশ্বরের চোখে কি নিবিড় ব্যথা—আকুলতা! কপালে তার হাতের উষ্ণ স্পর্শ। মাধুরী চুপ করে অনুভব করবার চেষ্টা করে সেইটুকু।

ছোট একখানি ঘর বাঁধবে তারা দুজনে। অতীতের যে পরিচয় অস্বীকার করে বের হয়ে এসেছিল মাধুরী সেই পরিচয় আবার ফিরে পেতে চায়। সামান্য নিয়ে তৃপ্ত হবে সে, সব ভুলবে।

ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মিষ্টিস্বরে বলে ওঠে।

—না, না, তেমন কিছু নয়। বসো তুমি।

তবু বার বার চোখের উপর ভেসে আসে দৃশ্যটা। অন্ধকার মৃত্যুর গহ্বর থেকে রক্তাক্ত মুমূর্ষু লোকটাকে তুলে আনছে আলোয় সেই দুর্দান্ত মানব। মুখেচোখে কি আনন্দের আভা! ঘামে ধুলোর জড়িয়ে গেছে চুল—ছিঁড়েছে হাঁটু হাত—সর্বাঙ্গ।

নটেশ্বর ওর দিকে চেয়ে আছে। দশবছর আগে যে মাধুরীকে সিঁথির সিঁদুর পরে তার ঘরে দেখেছে—তার সেই লজ্জাবনত মূর্তির সঙ্গে এর কোথায় একটা পার্থক্য রয়ে গেছে।

—মাধু!

জবাব দিল না মাধুরী। ওর দিকে ফিরে চাইল।

বাসন্তী ছেলের মূর্তির দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে; ধূলিধূসর মূর্তি, গ্যান্ট জামা ছেঁড়া—রক্তের দাগ লেগে রয়েছে সর্বাঙ্গে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

—একি রে! কোথায় গিয়েছিলি!

খবর বিদ্যুদ্‌গতিতে ছড়িয়ে চারিদিকে। বেয়ারা রঘু চারিদিকের খবর রাখে—সেই-ই এসে জানিয়েছে বাসন্তীকে।

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বাসন্তী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে।

—আমার সব গেছে; তুই তবুও থামবি না?

হাসে মানব মাকে জড়িয়ে ধরে—কোন ভয় নেই মা। লোক দুটো বেঁচে গেল তো। ও বেচারারা মরতো নইলে। আমি কর্তা, সেখানে নিজে না গিয়ে অন্যকে যেতে বলি কি করে?

বাসন্তী ছেলের দিকে চেয়ে থাকে—চিরকালই বেপরোয়া থাকবি?

মানব চুপ করে গেল—টুনুবৌদির কথা মনে পড়ে। ভীরু কাপুরুষ তুমি। এইখানে দাঁড়িয়ে ঝড়ের রাতের সেই কথাই বলে গিয়েছে।

টুনুবৌদি!

পুঞ্জীভূত বসন্তমাধুর্য—শীতশেষের রিক্ততাকে পূর্ণ করে তুলেছে। কোথায় রয়ে গেছে। একটা অসীম শূন্যতা তার সব খ্যাতি অর্থ ও মনের দীনতাকে পূর্ণ করতে পারেনি।

বার বার টেলিফোনটা বাজছে। স্থানীয় সংবাদদাতা, ফেলো অফিসাররা, স্বয়ং চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিজে ওর সম্বন্ধে খবরাখবর নিচ্ছে।

—আই অ্যাম অল রাইট স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ সো ম্যাচ্।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করে—কি রে, এত ডাক-হাঁক কেন?

হাসতে হাসতে জবাব দেয় মানব—বেঁচে আছি কিনা তাই খবর নিচ্ছে সবাই।

—বালাই ষাট। বাসন্তী ছেলের মাথায় গায়ে হাত বোলায়।

দীপা ভয় পায়নি। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখবে। দরকার হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতাতেই ফিরে যাবে। একটা মাস্টারি নাহয় অন্য চাকরি জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কুশ্রী এই পরিবেশে থাকতে পারবে না সে।

কালীপুরে আসবার সময় যে প্রতিষ্ঠা আশা উৎসাহ নিয়ে এসেছিল আজ তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আপিসের ঘৃণ্য পরিবেশ মনের উপর চেপে বসেছে। ওদের চাপা ইঙ্গিতগুলো কানে আসে।

—উর্বশীর আবার বয়েস!

কেউ মন্তব্য করে—চাকরির দরকার কি রে বাবা। একজন ছেলের ভাত মারছে কাজ করতে এসে?

কিন্তু দীপার অসহায় অবস্থাটা আজ কেউ দেখে না। চাকরি না করলে তার গতি নেই। কেউ প্রীতিভরা অন্তর দিয়ে সব ভার তুলে নেবার প্রতিশ্রুতিও দেয়নি। নির্দয়ভাবে সেই জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেদিন।

কিন্তু আজ!

আনমনে ফিরছে দীপা কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে বাড়ীর দিকে। ঘাড়টা টনটন করছে। আঙ্গুলের ডগাগুলো জ্বলছে। চোখের কোলে পড়েছে কালি—ক্লান্তি ছেয়ে আসে সারা দেহে।

হঠাৎ সেই ঝাঁকড়া বটতলায় এসে থমকে দাঁড়াল। প্রথমে বিশ্বাস করেনি—সেই লোকটা এগিয়ে আসছে চোখেমুখে কুৎসিত হাসি।

—চলুন ওদিকে গিয়ে একটা রিক্স ধরে নেব।

কোথায় বনের মধ্যে ডাকছে একটা পাখী; সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে শিউরে উঠে দীপা।

—পথ ছাড়ুন।

—ওই তো বেগড়বাঁই করছেন ম্যাডাম।

খপ্ করে ওর হাতটা চেপে ধরে বলিষ্ঠ মুঠিতে। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ওর জ্বালা ধরানো মুঠিটা ছাড়াবার চেষ্টা করে দীপা। কিন্তু পারে না। তার শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ করবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ গাড়ীখানা এসে থামল পাশেই।

কে যেন লাফ দিয়ে নেমে লোকটার নাক লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ঘুঁসি মারতেই সে হাত ছেড়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে—গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। দীপা ছাড়া পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছে—আতঙ্কে লজ্জায় কাঁপছে সে।

—তুমি!

মানব প্রথমে পিছন দিক থেকে লক্ষ্য করেনি। ওদের অস্পষ্ট চীৎকার ধস্তা-ধস্তির শব্দ শুনে ব্যাপারটা অনুমান করে গাড়ী থামিয়েছে।

দীপা অসহায়ের মত বলে।

—আপিস থেকে ফেরবার পথে ক'দিন লোকটা পিছু ধাওয়া করেছে।

মানব লোকটাকে আবছা চেনে। মাঝে মাঝে কর্তাদের ল্যাংবোট শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে পার্টিতে—নাহয় অন্যত্র।

দীপার দুচোখে জল। কাঁপছে থর থর করে। মানব ওর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে—চোখে মুখে অসহায় লজ্জা। লোকটা উঠে পালাতে যাবে—মানব ওর কলার চেপে ধরে হিড় হিড় করে তাকে গাড়ীতে তুললো।

দীপাকে ও ডাকে।

—এসো।

দীপা এগিয়ে আসে। মানব বলে ওঠে।

—জানি এসব এখানে ঘটে ; আমি এর বিহিত করছি দীপা ; এসো।

লোকটা মারখেয়ে একটু ভয় পেয়েছে। হাতজোড় করে বলে ওঠে।

—মাইরী স্যার, কিচ্ছু করিনি স্যার। সিম্‌প্লি জোকিং।

ঠাস্ করে মানব ওর মুখে একটা চড় মেরে কথা বন্ধ করে দেয়। লোকটা বুঝতে পারে একটু কড়া পাল্লায় পড়েছে এবার।

দীপা কাঁদছে। মানব ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। একখানা হাত ওর হাতে।

…কেঁদো না। এভরিথিং উইল বি অল রাইট।

বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর—দীপা ওর সান্নিধ্যে এসে যেন কি এক পরম নির্ভর খুঁজে পায়। গাড়ীখানা এগিয়ে চলেছে—পিছনের সিটে বসে রয়েছে হাতবাঁধা লোকটা —মাঝে মাঝে ওর দিকে চেয়ে দেখছে মানব সন্ধানীদৃষ্টিতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঝলসে উঠেছে হাই পাওয়ার মার্কারী ভেপার আলোয় সবুজ বনসীমা ঝলমল করছে। ক্লাবের আশপাশে যেন ইন্দ্রপুরীতে পরিণত হয়েছে।

—ইয়েস মিঃ আচারিয়া। মিঃ রমণ ভারি গলায় এগিয়ে এসেই থমকে দাড়ালেন। লোকটার নাক ফুলে উঠেছে—বেশ প্রহারের চিহ্ন এদিক ওদিকে ; একটা চেয়ারে বসে আছে তাঁর ভূতপূর্ব পি-এ দীপা ব্যানার্জি। রাগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে মানবের চোখেমুখে—টকটকে ফর্সা রংএ ঘন লাল ছাপ পরিস্ফুট। মানব বেশ কঠিন স্বরেই বলে ওঠে।

—মেয়েদের কাজকর্ম—যাতায়াত করা কি বন্ধ হয়ে যাবে ?

—কেন ?

লোকটার দিকে চেয়ে বলে মানব—জিজ্ঞাসা করুন ওকে।

সিকিউরিটি অফিসার মিঃ পাণ্ডে ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে। তার বিশ্বস্ত অনুচর যে অমনি হাতেনাতে ধরা পড়বে তা কল্পনাও করেনি। মেয়েটিকে কালীপুর থেকে চলে যাবার জন্য বাধ্য করবার পথ নিয়েছিল তারা—কর্তাদের খুশী করবার মানসে। কিন্তু সব যেন ফাঁস হয়ে গেছে ওই তীক্ষ্ণধী ইঞ্জিনিয়ারের সামনে। মানব বলে চলেছে।

—আপনি একে জানেন মিঃ পাণ্ডে। আই নো হি ইজ ইন ইওর সিক্রেট 'পে' রোল। আপনি যদি ব্যবস্থা করেন—আমি চিফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গেই দেখা করবো।

চমকে ওঠেন মিঃ রমণ। ও সব পারে। অবাক হয়ে যায় দীপা, এই সব অপকর্ম করবার জন্য গোপনে কত ষড়যন্ত্রই না চলেছে। মিঃ রমণের চোখমুখ তামাটে হয়ে ওঠে—সিগারেটটা টানতে ভুলে গেছেন। মানবকে একটু সমীহ

করেন তিনি। শেষকালে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না ওঠে। মিঃ পাণ্ডে তখনও তড়পাচ্ছে।

—একা ওর দোষ নয়; উনিও ওকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

হীন মন্তব্যে চমকে ওঠে মানব।

—একজন পদস্থ কর্মচারীর যদি মেয়েদের সম্বন্ধে এমনি ধারণা হয় তাহলে আপনার কৈফিয়ৎ নেওয়া উচিত—ইউ আর অলসো গিল্‌টি। আই শ্যাল টেক দিস কেস টু 'চিফ'।

ভয়ে আঁৎকে ওঠেন মিঃ রমণ। গিল্‌টি। দীপার দিকে চাইলেন তিনি। দীপার দুচোখ অপমানের প্রতিবাদে জ্বলছে।

ধমকে ওঠেন মিঃ রমণ।

—মিঃ পাণ্ডে! আই লাইক টু হ্যাভ ইওর রিপোর্ট। মানবকে বলেন—আই অ্যাম সরি আচারিয়া, আই শ্যাল সি।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এর ফলাফলও জানাবেন আশাকরি।

বের হয়ে এল দীপাকে নিয়ে মানব। রাগে তখনও মনে মনে জ্বলছে—শয়তানের দল।

মিঃ পাণ্ডে এগিয়ে গিয়ে লোকটার গালে একটা চড় কসে। গর্জন করতে থাকে—উল্লুকা বাচ্চা।

লোকটা নীরবে চড় হজম করে।

মিঃ রমণ ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কি ভাবছেন। সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে। একটু সাবধান হওয়া দরকার। ফোন তুলে ষ্টাফকে কি জরুরী নির্দেশ দেন।

গাছে গাছে রাতের বাতাস গুমরে ফেরে। ক্লান্তি-উত্তেজনার আবেশে ভেঙ্গে পড়েছে দীপা। মুখচোখ ওর ফ্যাকাসে বিবর্ণ।

—দীপা!

মানবের ডাকে মুখ তুলে চাইল নিবিড় ব্যথাভরা চাহনিতে। আজ মনের নিঃশেষ কৃতজ্ঞতা—অসহায় ভাব ফুটে ওঠে ওর দৃষ্টিতে। দীপা বলে ওঠে।

—এ তুমি কি করলে? চাকরিটা হারাবো শেষ পর্যন্ত।

—এ পাপ যাওয়াই উচিত।

—তারপর। নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে শিউরে ওঠে দীপা।

—চাকরি ছাড়া আর পথ নেই আমার। সব হারিয়ে বাঁচবার জন্য আজ ভাবতে হবে আমায়।

মানব ওর হাতখানা তুলে নিয়েছে। উষ্ণ স্পর্শ। সব হাহাকার স্তব্ধ করা একটু শান্তির আশ্বাস।

—তোমার সব দায়িত্ব নিতে পারবো দীপা।

চমকে ওঠে দীপা—না না। তা হয় না। হতে পারে না।

—কেন? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে মানব।

সব হারিয়েছে সে। টুনুবৌদি গেছে, মাধুরী আজ ফিরে পেয়েছে তার হারানো জীবন। একা মানব আজও নিঃস্ব মনের দুঃসহ ব্যথা বয়ে চলেছে।

কাঁদে দীপা! কেটে গেল তার বসন্তবেলার ফুলগন্ধবহ বাতাস দূর ক্রন্দসীর অসীমে।

এ 'কেন'-র জবাব দিতে পারে না দীপা। দুঃসহ লজ্জাকর সে পরিচয়। সে অপরাধী—সেই অনুশোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হওয়াই তার শাস্তি, এর থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

অবাক হয়ে মানব ওর কান্নাভেজা মুখের দিকে চেয়ে আছে—কাছে টেনে নেয়। নিবিড় আবেগে এগিয়ে আনে তার হালকা লাল আভা মাখা ঠোঁট দু'টো।

সরিয়ে নিতে চায় দীপা—উচ্ছিষ্ট সে; হাহাকার করে ওঠে সারা মন। জীবনের এত মাধুর্যশ্রী তার জন্য পথের বাঁকে সঞ্চিত ছিল ভাবেনি, অমৃতের স্পর্শ পাবার স্বপ্নও দেখেনি কোনদিন।

দীপাকে বাড়ী আসতে দেখে মা এগিয়ে আসে। ব্যাকুলতা ওর চোখে-মুখে। গাড়ী থেকে মানবকে নামতে দেখে বিস্মিত হয়।

—তুমি!

মানব প্রণাম করলো থানপরা মূর্তিটাকে। স্তব্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মিসেস ব্যানার্জি। আজ শ্রীহীন—সর্বহারা মূর্তি। সেই ঔজ্জ্বল্য হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে; অতীতের একটা ধ্বংসস্তূপ।

—এসো।

মধ্যবিত্ত সংসারে ছবি। মানবের চোখের সামনে আগেকার সেই সমৃদ্ধতার দিনগুলো ভেসে ওঠে।

—আজ সব গেছে বাবা। তবুও মরতে পারিনি।

মানব উঠোনে তুলসীমঞ্চের দিকে চেয়ে আছে—মাটির প্রদীপের বুকজ্বলা ধূমায়িত শিখা আঁধারে জ্বলছে দপ্ দপ্ করে একা।

কি যেন বলতে গিয়েও প্রকাশ করতে পারেন না মিসেস ব্যানার্জি।

বাতাসে একটা মিষ্টি সুবাস—পরিচিত সৌরভস্মৃতি। দীপা আজও চুলে

সেই তেল ব্যবহার করে। মানবের মনে পড়ে অতীতের দিনগুলো—টুনুবৌদিকে এড়িয়ে কলেজের ক্লাস পালিয়ে ওদের দুজনের সিনেমা যাওয়া।

দীপা হাসতো—যদি তোমার বৌদি দেখে ফেলে ?

—দেখুক !

—ইস্। দীপা চোখ পাকাতো।

আজও সেই দিনগুলো হারায়নি মানব। ওর চোখের কালো তারায় সেই দিনের আনাগোনা।

মাধুরী অবাক হয়ে যায়। তাই চাইছিল সে মনে মনে। এখান থেকে সরে যাবার ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়েছে। মানব। ভুল করেছে দীপা ! আরও কতজন, চোখের সামনে দেখেছে ডাক্তার মাধুরী চ্যাটার্জি তাদের অসহায় কান্না আর অনুশোচনা। ভুল করতে সে চায় না। ছোট্ট পাওয়া নিয়েই তৃপ্ত থাকবে সে।

তাকে বদলি করা হয়েছে বিহারের কোন হাসপাতালে। নটেশ্বরও চেষ্টা করছে তার কোম্পানীর কাজে ওই দিকে বদলী হতে। হয়তো হয়ে যাবে।

মাধুরীর কথায় বলে ওঠে—হয়তো যেতে পারবো।

মাধুরী ওর দিকে চেয়ে আছে। ফড়েপুকুরের নটেশ্বর চাটুয্যে। রেসুড়ে মাতাল নটেশ্বর আজ আবার মানুষ হয়েছে—দুর্বার মানুষটাকে নোতুন করে গড়ে তুলেছে মাধুরী।

কালীপুর তাকে ব্যর্থ সঞ্চিত করেনি।

সারাদিন ছুটি। আজ আর আপিসে বের হয়নি দীপা—বিছানায় পড়ে পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। একটা হালকা উপন্যাস পড়তে চেষ্টা করে—মাঝে মাঝে মনে ঝাঁকবন্দী চিন্তার ঢেউ এসে সব ওলটপালট করে দেয়।

মা কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পূজো দিতে গেছেন—মেয়ের মতিগতির অস্থিরতায় বড় ভাবনায় পড়েছেন তিনি। গজ-গজ করেন।

—জ্বলে পুড়ে মল্লাম দীপা। এত জ্বালা মানুষে সয় না।

সেকেলে ধরনের মানুষ—আজকালকার যুগকে মানতে বাধা পদে পদে।

কয়েক বৎসর আগেকার একটা স্মৃতি মনে পড়ে—বিলেত থেকে সবে ফিরেছে মানব। দীপাকে সঙ্গোপনে বলে ওঠে।

—ভেবেছিলাম তোমাকে এসে দেখতে পাবো না।

—কেন ?

—আর কোন সংসারে গিয়ে গিন্নীবান্নি হয়ে বসেছো !

সেদিনের মানবের চোখের ব্যাকুল চাহনি ভোলেনি। ভোলেনি সেই রাত্রের স্মৃতি যেদিন মানবকে সে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আমলকীর পাতাঝরা সাদা ডালে একটা কালো কাক কর্কশস্বরে চেঁচাচ্ছে। অস্তসূর্যের লাল ফিকে আলোয় সব হারিয়ে গেলো দিনের সঞ্চয়।

দরজায় একটা গাড়ী থামার শব্দ শুনে চমকে ওঠে। কয়েক মাস আগেও ওটা ছিল অতি সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কত মহাজন আসতেন ক্লাব গানের জলসা থিয়েটার কালচারাল ফাংশানের বাতিক নিয়ে। এখন সে কালীপুরের কন্‌ডেম্‌ড অফিসিয়াল ; বসএর মুখোমুখি ঝগড়া করে এসেছে কাল—হুমকি দিয়েছে সিকিউরিটি অফিসারকেও তার দরজায় ভুলেও কেউ ছায়া মাড়াবে না। কালো খাতায় নাম উঠবে গোপনে গোপনে।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, একটু জড়তা দ্বিধা নেই। এগিয়ে আসছে শব্দটা। বিছানায় উঠে বসল দীপা। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চল্‌কে মুখে উঠেছে।

কাঁপা গলায় বলে—এসো।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে মানব—দীর্ঘ দশাসই চেহারা, চোখমুখ ঝক্‌ঝকে, হাসির ছোঁয়ায় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

—শরীর খারাপ ?

এগিয়ে এসে বিছানার কাছে বসলো মানব। ওর শিথিল হাতখানা তুলে নেয় নিজের হাতের শক্ত মুঠোয় ;

তৃষ্ণা ! মানব আজ স্তব্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। পাখীডাকা রংলাগা সন্ধ্যা। শালবনে জাগে চেলীপরা দিনের নিঃশেষ আলিঙ্গন রহস্যময়ী রাত্রির দেহলীতে।

তৃষ্ণা ; সন্তাপবিহীন বৈশাখীদিগের তৃষ্ণা ওর চোখে—ওর বুক জুড়ে। সবাই ওকে ব্যর্থ করে গেছে। জমাট পাথরের নীচে চাপা পড়া ভালবাসার উৎস প্রকাশপথ খুঁজে উতরোল। দীপা শিউরে ওঠে,

—কাকে কি সম্মান দিতে এসেছো তুমি জানো না। জীবনের দুটো পাত্রে এতবড় করুণা-প্রীতির সঞ্চয় নেবার সব দাবী আমি হারিয়েছি।

—কেন ? মানব ব্যাকুল কণ্ঠে আহ্বান জানায় তাকে।

—প্রশ্ন করোনা মানব। দুঃখ পাবে ! ভুলে ভরা আমার অতীত।

—অতীতকে ভুলে যাবো আমরা।

—অতীতকে অস্বীকার করেই বর্তমান কাল। সেই আমি আর আজকের আমি একই মানুষ। তোমার অতীত বংশধারাকে সেদিন সহ্য করতে পারিনি,

টুনুদির সম্বন্ধে হীন ধারণা করেই তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

—আমি তাকে স্বীকার করে নিতে পারি দীপা।

—তোমাকে এতবড় অপমান করতে পারবো না মানব। আমি—

কথাটা বলতে গিয়ে থেমে যায় দীপা; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মানব অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে।

চোখের উপর ভেসে ওঠে হাসপাতালের সেই কয়েকটি আবছা স্মরণে আসা মুহূর্ত। কোন রক্তবীজ জড়িয়ে উঠেছিল তার কোষে কোষে। ধিক্কার দিতে থাকে দীপা।

—ছিঃ ছিঃ! ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা মানব। ভাবতাম যারা সেকেলে বোকা, এতবড় বিপদে তারাই আত্মহত্যা করে, কিন্তু আজ দেখছি এই তাদের একমাত্র পথ। এই জ্বালা সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয় না—তারা নিষ্কৃতি পায়।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মানব, দীপা কাঁদছে। মানব চমকে উঠেছে।

—কি করবে?

—এখান থেকে, তোমার সামনে থেকে সরে গিয়ে কোথাও একটা চাকরির চেষ্টা করবো। যেমন করে হোক দিন চলে যাবে। এতদিন নিদারুণ অবহেলা আর অপমানে তোমাকে ফিরে যেতে হয়েছে—আজ ফিরে যাবার পালা আমার। এ পাপের শাস্তি পেতেই হবে।

মানব বলে ওঠে—পাপ! এই জীবন এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞানের যুগে হু হু করে। মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলও রয়েছে জড়ানো। সুস্থ স্বাভাবিক মন এই অকল্যাণ অশুভকেও সহজভাবে মেনে নেয়। কিন্তু একা তোমার কথা নয় দীপা, তোমার মত হাজার হাজার মেয়ে আজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দাবী নিয়ে—কতক বাধ্য হয়ে; কিন্তু মনের অতলে খুঁজে দেখো—আজও সেই জীর্ণ মধ্যবিত্তের পুরোনো সংস্কারগুলো গেঁথে বসে আছে। গায়ে গা ঠেকলে তার সতীত্ব যাবার দাখিল—সামান্য একটা ভুল যদি কোথাও করে বসে তাকে শুধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবায় সামর্থ্য তার থাকে না—জলে পুড়ে মরে মনে মনে দিনরাত। মনের এই জীর্ণতা ছাড়তে হবে দীপা—নইলে এই প্রগতি, এই সভ্যতার চাপেই মারা পড়বে। গরুর গাড়ীর সঙ্গে মোটরএঞ্জিন লাগালে যা হয়—সমাজের, আমাদেরও তাই ঘটবে।

—উচ্ছৃঙ্খলতাকেও স্বীকার করবে তুমি?

—ভুল আর উচ্ছৃলতা এক নয়।

মানব ওর দিকে চেয়ে আছে দীপার চোখে কি যেন আশার আলো মানবকে আজ নোতুন করে চেনে। সামন্ততান্ত্রিক বাবার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—

পুরোনো জীর্ণ অতীতকে নিঃশেষে ধ্বংস করে বর্তমানের প্রতিষ্ঠা করেছে।

অন্যপূর্বা দীপার অতীত ইতিহাস জানে মানব; বাবার বিরুদ্ধে মাথা তুলে নিজের মতকেই বড় দেখেছিল, টুনুবৌদির কথা মনে পড়ে—সেও প্রতিবাদ করেছে চিরাচরিত অন্যায়ের। মহৎ জীবনকে স্পর্শ করেছে নিজের দুঃখ—ক্ষমার আলোয়।

দীপার দুচোখে ম্লান অশ্রু। মানবের বুকে মাথা রেখে কাঁপছে, ফোঁপানীর বেগে কাঁপছে ওর দেহ ঝড়েকাঁপা পাতার মত।

দূরে দু'একটা তারা ফুটে উঠেছে আকাশ-কোলে। পাখীর গানে গানে ভরা সন্ধ্যাবেলা। দীপা আজ নিঃশেষে নিজেকে ভুলে যেতে চায় ওর প্রীতির বাঁধনে।

কুর্চিফুলের সাদা সাদা গুচ্ছ রাতের বাতাসে বেহায়া গন্ধ মেলে ধরেছে। দূরে দূরে আলো জ্বলছে ভীরু চাহনিতে।

বাসন্তী ওদের দুজনকে আসতে দেখে ফিরে চাইল, দীপা আর মানব।

মায়ের ডাকে ফিরে চাইল ওরা। বাসন্তী বলে ওঠে—মাধুরী বদলী হয়ে যাচ্ছে দেখা করতে এসেছে।

দাঁড়াল মানব—দীপা যেন সামনে সাপ দেখেছে, চমকে ওঠে! কি এক দুঃসহ লজ্জার ছায়া ফুটে ওঠে ওর মুখেচোখে।

—চলে যাবার আগে ভাবলাম দেখা করে যাই।

একটি মুহূর্ত। মানব ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। মাধুরীর মুখেচোখে তৃপ্তি, আনন্দের আভা। কোথাও দুঃখের—বিদায়ের বেদনার ছাপ নেই। কালীপুরের স্মৃতি—মানবের সঙ্গে পরিচয়—সব আজ হারিয়েও খুশী হয়েছে। সেই খুশীর আভা ওর কথার হাসিতে।

—দীপা ব্যানার্জি। পরিচয় করিয়ে দেয় মানব।

মাধুরী ওর দিকে চেয়ে থাকে, মনে পড়ে আবছা রাত্রির কথা; ওকে চেনে মাধুরী দুঃসহ বেদনার মধ্য দিয়ে। মানবের কথা শুনে চমকে ওঠে মাধুরী। দূরে কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড শব্দে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল একটা সার্সি ঝন্‌ঝন্ শব্দে; বাতাস ক্ষেপে উঠেছে। মুছে গেছে তার বুক থেকে সব ফুলগন্ধ। মানব বিয়ে করছে ওই দীপাকে! যার অতীত পরিচয় জানলে শিউরে উঠবে মানব।

দীপা কি এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছে! ওর জীবনের মস্ত ভুলের সঙ্গে ওই অপরিচিতা নারীও জড়িত। পায়ে পায়ে সরে এল অন্যদিকে, নীচু গর্জের ভিতর দিয়ে ট্রেনখানা ছুটে গেল হু হু ঝড় তুলে।

এক ভুল বার বার তার জীবনে এমনি অপমানের মুখোমুখি আনবে কল্পনা করেনি।

মাধুরীর চোখে রুদ্ধ বিস্ময়, মানব বেশ ধীর কণ্ঠেই বলে ওঠে—ওর পরিচয় সবই জানি মাধুরী, তুমি অবাক হয়েছো। কিন্তু ক্ষতটাকে লুকিয়ে রাখলে তোমার ডাক্তারী শাস্ত্রে লেখে যে ঘা সেরে ওঠে না। তার জন্য চিকিৎসা করা দরকার। এড়িয়ে গেলে সমস্যার সমাধান কোনদিনই হবে না।

মাধুরীর মনে তবু কোথায় সন্দেহ, বলে ওঠে

—প্রেম বড় স্বার্থপর মানব। কোন পুরুষই চায় না তার প্রিয়া অন্যপূর্বা হোক—স্ত্রীও চায় স্বামী হোক দেবতার মত।

মানব জবাব দেয়—পরস্পর একটা বোঝাপড়া থাকলে এগুলো সহজ হয়ে আসে মাধুরী, প্রেম মনের নীচতাকে দূর করে। স্বার্থপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে না মানুষের মন। নইলে তুমিও নটেশ্বরের মত এক দুর্দান্ত লোককে স্বীকার করে নিতে পারতে না কোনদিনই। নটেশ্বরও বদলে গেছে। আজ পরস্পরের প্রেমে বোঝাপড়ার তোমরা সুখী হয়েছ। সুতরাং অতীত ভুল আর ইতিহাসটাই যে বার বার মানুষের সুখের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে এটা বড় কথা নয়। সমস্ত বাধা দুঃখ অমঙ্গলকেও সহজ ভাবে স্বীকার করে নিয়ে তারই মধ্যে বাঁচবার পথ খুঁজতে হবে মানুষকে।

মাধুরী মানবের দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত জেনেশুনেই সে দীপাকে স্বীকার করে নিতে চলেছে, আবছা আলোয় ওর দৃঢ় মুখখানা দেখা যায়। বলে চলেছে মানব।

—যে ঝড় ঘর উড়িয়ে নিয়ে যায় সেই ঝড়ই জীর্ণ পাতা ঝরিয়ে নোতুন পাতার ঠাঁই করে, সব মালিন্য মুছে দেয়। সর্বনাশা দামোদর ছিল বাংলার পুঞ্জীভূত কান্না। সেই বন্যার উদ্দাম স্রোত আজ মাঠে মাঠে ফসলের স্বপ্ন আনে। যে উদ্দাম জীবন ব্যর্থ হয়ে নিজেকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয় তাকে বাঁচবার পথ করে দাও সেও ফুলে ফলে তার চারিদিক সাজিয়ে তুলবে মাধুরী—আমি এই সত্যে বিশ্বাস করি।

টুনুবৌদিকে মনে পড়ে। তার সাহচর্য প্রীতি এগিয়ে দিয়েছিল মানবকে এই প্রতিষ্ঠার পথে, কঠিন সংগ্রাম করতে উৎসাহ দিয়েছিল। সেই টুনুবৌদির চারিপাশেও আজ ফুলে ভরা সংহার—শান্তির সন্ধান।

গাড়ীতে দেখা সেই রূপবতীকে আজও ভুলতে পারে না মানব। বিন্দুমাত্র অন্যায় টুনুবৌদি করেনি। মাধুরী আজ পথ পেয়েছে—ওর যাবাবর জীবনে বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছে আবার।

মাধুরীর মনে সব যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে। রাত্রির হু হু বাতাস তখনও ফুলের সৌরভ নিয়ে পথ খুঁজে মরে। হরীতকী গাছের ঘন পাতার আড়ালে বাতজাগা পাখী ডানা ঝাপটিয়ে ডাক পাড়ে।

—তোমায় ঠিক চিনিনি মানব। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী—তোমার মতকে সম্পূর্ণ স্বীকার করতে না পারলেও তোমায় শ্রদ্ধা করি।

ট্রেনের দেরী নেই। বেরুবার আয়োজন করে মাধুরী।

মানব স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাধুরীর দিকে। কালীপুরের অতীতে আলোরাঙ্গা জীবনের ক'টা দিন—সেই শান্ত মধুর নির্জন বন্য পবিবেশ—প্রেমের প্রথম অনুভূতি—একটি স্মৃতি আজ বিদায় চায় তার কাছে। সে দিন—সেই জীবন গেছে। চলে গেছেন কন্দর্প আচাই—নিবারণ বাবু; সেই দুর্মদ জীবনের প্রহরী অভা ডোম, পরমা আরও কত কে। তাদের সঙ্গে হারিয়ে গেছে ভুবনপুরের ডাঙ্গার নিঝুম নীল আকাশ—কালীপুরের কুমারী অরণ্য। সেই দিনের নর্মসাথী—আজ চলে গেল।

পায়ের শব্দে ফিরে চাইল মানব, দীপা ঢুকছে।

—কি ভাবছো?

জবাব দিল না মানব, চেয়ে থাকে ওব দিকে। অতীতের পরে এসেছে বর্তমান। মানব এগিয়ে আসে--মনে তার সুরের রেশ। দীপাকে কাছে টেনে নিয়ে দেখছে তাকে—একরাশ কোঁকড়ান চুল; ঘাড়ের কাছে দু' একগাছি লতিয়ে রয়েছে। চোখের তারায় কি এক গভীর টলটলে মাদকতা।

নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় মানব ওর গভীরে।

দীপা ভুলে গেছে তার সব জ্বালা, আবেশে দুচোখ বুজে আসে তার। ওর গালে লাগে কার উষ্ণ নিঃশ্বাস।

—নাইবা ফিরলে আজ। মানব আবেগভরে বলে ওঠে।

—বারে! ওর দৃষ্টিতে কৌতুকভরা ঔজ্জ্বল্য।

কি তিথি জানে না, জানলার বাইয়ে হরীতকী গাছের সবুজ পাতায় উছলে পড়েছে চাঁদের আলো। পাখীগুলো ডেকে ওঠে কাক জ্যোৎস্নায়। বনভূমির প্রশান্তি ফিরে এসেছে রাত্রির গভীরে। সব ক্লান্তি হাহাকার মুছে গেছে আকাশ বাতাস অরণ্য মৃত্তিকার বুক থেকে।

মানব—দীপা ওই অখণ্ড প্রশান্তির গহনে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বন্দী দেবতা। মৃত্যুমুখর নদী আজ বন্দী হয়ে নোতুন জীবন গড়ে তোলার কাজে লেগেছে। বিস্তীর্ণ নদীর বুকে সাদা রং করা ব্যারেজ। লকগেটের

মধ্য দিয়ে দামোদরের ক্ষীরধারা লাফিয়ে পড়ছে ক্যানেলে। এগিয়ে চললো অমৃতসঞ্চয় নিয়ে বন্ধুর গৈরিক রুক্ষমাটির দেশে—বুকে ওর ফসল ফলানোর সুর—নোতুন জীবনের ছন্দ। উছলে পড়ছে নদীর বুকে জলরেখা—জমছে ফেনার ছিটে; সূর্যকিরণে সাত রং-এর রামধনু আঁকা ওর সারা গায়ে। স্তরে স্তরে উঠে গেছে সাদা বাড়ীগুলো; মামড়া-কালীপুরের নির্মুলপ্রার সবুজের সীমায় বড় বড় চিমনী থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে—জলসীমা কাঁপিয়ে বাজছে বিকট সুরে 'ভোঁ'-'ভোঁ'।

ব্যারেজের উপরে ছুটে চলেছে ঝকঝকে গাড়ী, যাত্রীবাহী বাস।

কত পথিক আসে যায়—কত অচেনা অজানা মুখ।

এদের ভিড়ে মিশে একদিন নিতাই ঘোষের মেয়ে ভাসানী আর ব্রজও এসেছে। ভুবনপুর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জলের অতলে; মুছে গেছে, ডুবে গেছে কন্দর্প আচাইএর নাম, ভাসানীর সেই ক্লেদাক্ত পরিচয়।

—এ কোথায় এলাম রে। ব্রজ খুঁজে পায় না সেই মানাচর, শালবনের বাইরে কাঁকুরে ডাঙ্গা।

মেঘঢাকা নির্জন বৈকালের আকাশে শেষ হাঁসের পাখার সাঁই সাঁই উধাও ডাক দিগন্তে হারিয়ে গেছে। চারিদিকে আজ কারখানা কল—আর অচেনা মানুষ। হঠাৎ ওদিকে নজর যেতে থমকে দাঁড়াল। সেইদিনের ঘন সবুজ বাঁকড়া কদমগাছটা মাত্র দাঁড়িয়ে আছে; বর্ষার ছোঁয়া সে ভোলেনি আজও।

ওর সবুজ পাতা ছেয়ে ফুটেছে গাঢ় হলুদ রং রোমাঞ্চলাগা ফুলগুলো। ভুবনপুরের বাঁধের শেষ সাক্ষী হয়ে টিকে আছে ওই ফুলভরা কদমগাছ আর গাঢ় হলুদ ফুলগুলো। বছর বছর ওরা আসে—বর্ষার কালোমেঘের দিকে চেয়ে থাকে হলুদ চাহনি মেলে। আবার ঝরে যায়।